অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম-সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৯

তৃতীয় সংস্করণ—কার্তিক, ১৩৬৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

ব্লক—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

কলিকাতা—১২

বাঁধাই - বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সারাদিন আদালতে বসে হয় সাক্ষীর জবানবন্দি লেখেন নয়তো উকিলের কূট-কুটিল বক্তৃতার নোট নেন। তারপর বাড়ি বয়ে আনেন নথি আর নজিরের পাহাড়। তারপর আবার বসেন রায় লিখতে—সূক্ষ্ম তর্কজালের গ্রন্থি খুলে-খুলে—সকালে, সন্ধ্যায়, কখনো-কখনো বা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। কেবল লেখা আর লেখা। তবু এত লিখেও ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। তারই মাঝে কখন আবার এক ফাঁকে আরেক রকম লিখতে বসেন—এক কলম রেখে আরেক কলমে, এক ভাষা ছেড়ে আরেক ভাষায়, আপন ভাষায়। গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ—কত কি। এক আলো নিবিয়ে জ্বালেন আরেক আলো। মঞ্চ ছেড়ে বসেন এসে মাটির উপর, রসস্বরূপের মুখোমুখি। সমস্ত জীবনে সেইটুকুই উপাসনা। সেইটুকুই নীল আকাশ। সেইটুকুই আত্মদর্শন। বহু কল্লোল পার হয়ে এসেছেন—কখনো তরঙ্গ-উত্তাল কখনো-বা গভীর-শান্ত—ঘুরেছেন জীবনের বহুতর বন্দর, কিন্তু কম্পাসের কাঁটা ধ্রুবতারার দিকে নিশ্চল-নিবদ্ধ হয়ে আছে। সব ঘর না ঘুরলে ঘুঁটি চিকে উঠবে কি করে। জল তো হেললে-দুললেও জল, স্থির থাকলেও জল। যা নিত্য তাই আবার লীলা। তবু, কে না জানে, একদিন সব বচনের শেষ হয় কিন্তু অনির্বচনীয়ের শেষ কই?

ভূমিকা

১

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোলে'র দান। আর 'কল্লোলে'ই সাহিত্যে আধুনিকতার যাত্রারম্ভ। শুধু যাত্রারম্ভই নয়, সাহিত্যসৃষ্টির সে এক মহালগ্ন! বস্তুত, বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের নোবল-পুরস্কারপ্রাপ্তির পর এই দশটি বৎসরের মধ্যে সাহিত্য ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে যেন দশগুণ হয়ে উঠল। কবি স্বয়ং তো পুনর্যৌবন লাভ করলেনই, উপরন্তু তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন শরৎচন্দ্র। চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁর নব-নব দানে কথাসাহিত্য নতুন ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওদিকে 'সবুজপত্রে'র পৃষ্ঠায় বীরবলীয় বুদ্ধিবাদ মোহমুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করছে। জীবনের রঙ্গমঞ্চেও চলছে দ্রুত পটপরিবতন। সাগরপারের মহাকুরুক্ষেত্রের তাণ্ডব শান্ত হতে-না-হতেই ভারতের বুকে আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে অচলায়তনের ভিত্তি নড়ে উঠেছে। আশা ও নৈরাশ্যে, সাফল্যে ও ব্যর্থতায় প্রতিটি মুহূর্ত প্রাণচঞ্চল। একদিকে দুঃখে দারিদ্র্যে লাঞ্ছনায় অপমানে জীবন পর্যুদস্ত, অন্যদিকে সর্বদুঃখবিজয়ের অপরাজেয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে নবজীবনের অভিসার। ভাঙন-গড়নের বিপুল উত্তেজনায় অশান্ত দিনগুলি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে বাঙালীর আত্মীয়তা গড়ে দিলেন। মহাযুদ্ধ আমাদের যুক্ত করল বিশ্বজীবনের সঙ্গে। এই মহাজীবনের মোহনায় দাঁড়িয়ে তৃতীয় দশকের শেষবৈশাখে 'কল্লোলে'র কলধ্বনি শোনা গেল বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়। শুধু কলধ্বনিই নয়, 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন' এল সাহিত্যে।

বেপরোয়া বিপ্লবী যৌবন নবজীবনের সন্ধানে নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। দুঃসাহসী পথিকৃতের দল স্পর্ধাভরে বললেন,—

'না-মানা যুগের মোরা মানুষ,
বেসাতি মোদের কালি-কলুষ,
চোখে জ্বলিতেছে তাজা জলুস—
কিছু-না-পাওয়ার নেশা।'

স্বভাবতই এই 'কালি-কলুযে'র বেসাতি অভিনন্দনের মাল্যচন্দন বহন করে আনল না। দুর্নীতিপরায়ণতার তীব্র অভিযোগ উঠল এর বিরুদ্ধে। এমন কি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে এ যুগের অপটু রচনার বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ উত্থাপন করলেন। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে 'দারিদ্র্যের আস্ফালন', আরেকটা 'লালসার অসংযম'। এ অভিযোগ নিতান্তই অমূলক ছিল, এ কথা বললে সত্যেরই অপলাপ হবে। যে জলস্রোত দুকূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে কল্লোলিত হয়ে ওঠে তার মধ্যে পঙ্কিল আবিলতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর তা যে-পলিমাটির আস্তরণ বিছিয়ে দেয় তাই যে নতুন ফসল-সৃষ্টির উর্বরতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 'কল্লোল'-যুগের সব রচনাই অপটু হাতের ছিল না। এঁদের মধ্যে শক্তিধরও অনেকেই ছিলেন। তা ছাড়া এঁরা শুধু প্রলয়ের উল্লাসেই উন্মত্ত ছিলেন না, প্রতিসৃষ্টির প্রাণদ স্বপ্নও এঁদের মনকে অধিকার করে ছিল। ভাঙনের গানই শুধু এঁরা গান নি, নতুন আদর্শবাদের সন্ধানও এঁরা করেছেন। বেদরদী বিমুখতা দিয়ে নয়, সশ্রদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে এযুগের শিল্পিমনকে বুঝতে হলে অচিন্ত্যকুমারের ভাষাতেই বলতে হয়ঃ—"কল্লোল যুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল: এক, প্রবল বিরুদ্ধবাদ; দুই, বিহ্বল ভাববিলাস। একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যাপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নির্বারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সে যুগের যন্ত্রণা। শুধু বন্ধ দরজায় মাথা খুঁড়ছে, কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না, কিংবা যে

জায়গা পাচ্ছে তা তার আত্মার আনুপাতিক নয়—এই অসন্তোষে এই অপূর্ণতায় সে ছিন্নভিন্ন। বাইরে যেখানে বা বাধা নেই, সেখানে বাধা তার মনে, তার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অবনিবনায়। তাই একদিকে যেমন তার বিপ্লবের অস্থিরতা অন্যদিকে তেমনি বিফলতার অবসাদ।" আর বিফলতাই যে সাফল্যের স্তম্ভ, 'কল্লোলে'র উত্তরকালেই আছে তার পূর্ণ স্বীকৃতি।

২

অচিন্ত্যকুমার কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিভাবান লেখকদের অন্যতম। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে' যখন রচিত হয় তখনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরস্নাতক। কিন্তু এই উপন্যাসখানি তার বক্তব্য ও বাচনিকতার অভিনবত্বে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও পত্রপ্রবন্ধে লেখকের 'কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য' দেখে তাঁর প্রতিভা, তাঁর শক্তির বিশিষ্টতা প্রশংসাস্নিগ্ধ কণ্ঠেই স্বীকার করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য লেখকের রচনায় 'মিথুন প্রবৃত্তি'র অত্যন্ত পৌনঃপুন্য দেখে কবিগুরু ক্ষুণ্ণও না হয়ে পারেন নি। কিন্তু এ পৌনঃপুন্য একলা অচিন্ত্যকুমারেরই নয়, সে যুগেরই বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। আগুন-নিয়ে-খেলার দুঃসাহসিকতা ছিল সে যুগের রক্তে। তা ছাড়া বর্তমান শতাব্দীর হাতে মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের এও যে এক নতুন অভিজ্ঞান। অবশ্য 'বেদে' রচনার পর পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে লেখক কবিতা-গল্প-উপন্যাসে অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছেন। 'কল্লোলে'র স্বপ্ন নবসৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছে নতুন যুগ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন জীবনবোধ। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর অনেকের লেখনীই স্তব্ধ হয়েছে। কিন্তু চলিষ্ণুমনা অচিন্ত্যকুমারের সৃষ্টিতে এখনো আছে অকৃপণ অজস্রতা। পৌনঃপুনিকতা নয়, নিজেকে অতিক্রম করে যাবার শক্তিতে তাঁর

সাহিত্যের ঋতুবদল হয়েছে যুগে যুগে। আর ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে রীতিবদলও হয়েছে বার বার। শিল্পী হিসেবে অচিন্ত্যকুমার যেমন দূরযানী, তেমনি বিচিত্রসম্ভব। কবিত্বময় ভাবুকতা নিয়ে তাঁর জীবনবোধের আরম্ভ। নিজের এবং সহযাত্রীদের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো ছিলই, উপরন্তু বিদেশী সাহিত্যের প্রেরণাও নগণ্য ছিল না। বিশেষত হামসুনের প্রভাব তাঁর প্রথম দিককার রচনায় বিশেষ ভাবেই লক্ষিতব্য। কিন্তু মনের বন্ধন থেকে অচিন্ত্যকুমারের সত্যকার মুক্তি ঘটল মফস্বল শহরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সরকারী চাকুরি-জীবনের নির্দেশে তাঁকে বাংলার শহরে-শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কত বিচিত্র পরিবেশে কত বিচিত্র নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর। মফস্বলের বড়-পুতুল ছোট-পুতুল, তাঁদের অন্তঃসারহীন আত্মাভিমান, তাঁদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উন্নাসিকতা তটস্থ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। দেখেছেন উকিল-মোক্তার-মুহুরি-মামলাবাজ-মতলব-বাজদের বিড়ম্বিত দিনযাত্রাকে। ব্যঙ্গে ও রসিকতায়, সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় তাদের জীবনকে নতুন সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু সমাজের উচ্চতলার স্বরূপ উদ্ঘাটনেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকেনি, শহরের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন সুদূর-পল্লীর অতি-সাধারণ মানুষের নগণ্য সুখদুঃখের মধ্যে। 'কাঠ-খড়-কেরাসিন', 'হাড়ি-মুচি-ডোম', 'চাষা-ভূষা' নিয়েই তাঁর সাম্প্রতিক রচনা সাহিত্যকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছে। বিশেষত, এতদিন যারা আমাদের সাহিত্যে প্রায় উপেক্ষিত ছিল, বঙ্গপল্লীর সেই দরিদ্র মুসলমান জনসাধারণের অন্তরঙ্গ জীবনের সুখদুঃখের কথায় অচিন্ত্যকুমারের লেখনী এযুগে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে।

আর এই দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় লেখকের যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেটি হচ্ছে এই যে, তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকার নন, তিনি জীবনের রূপকার। সমস্যাস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কোনো বিশেষ সূত্রে জীবনের ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ তাঁর ধর্ম নয়, অন্তর্ভেদী কবিদৃষ্টি দিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করে শিল্পীর সাধনায় তাকে রূপায়িত করে তোলাই

তাঁর প্রকৃতি। এমন কি দারিদ্র্যও তাঁর সাহিত্যে সমস্যা হয়ে আসে নি। এসেছে জীবনের অভিজ্ঞান হয়ে। চোখের উপর দিয়ে বিচিত্র সংসার কালস্রোতে নিয়ত প্রবহমান। তারই মধ্যে কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র-রহস্য কবিদৃষ্টিকে উচ্চকিত ও নন্দিত করে তোলে। অচিন্ত্যকুমার সেই চিত্তবিস্ফারী জীবন-রহস্য-সন্ধানের আনন্দকেই তাঁর ছোটগল্পে ধরে রেখেছেন।

৩

উপন্যাসে যেমন 'বেদে', ছোটগল্পে তেমনি 'দুইবার রাজা' অচিন্ত্যকুমারের শক্তিমত্তার প্রথম নিঃসংশয় প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ যাকে সে যুগের অপটু হাতের রচনায়, 'লালসার অসংযম' আর 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলেছিলেন, আমরা যাকে বর্তমান শতাব্দীর মানুষের হাতে জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের দুটি নতুন অভিজ্ঞান বলে পরিচিহ্নিত করেছি, এই দুটি রচনায় সে যুগের এ দুধারারই প্রকাশ। 'বেদে'র বোহেমীয় জীবনায়ন এককালে 'বিবাহের চেয়ে বড়' বলে প্রতিভাত হলেও লেখকের দৃষ্টিতে আজ 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'র মধ্যেও অভিঘাত-সহিষ্ণু মানসত্বঘাতেই প্রেম পরিশুদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনে মানুষের যে পরিচয়, অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিতে তাঁর জীবনবোধের প্রসারতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা আরো স্পষ্ট আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আর-যাই-হোক, 'দুইবার রাজা'কে দারিদ্র্যের আস্ফালন কিছুতেই বলা যাবে না। গল্পটির মধ্যে একটা বিষণ্ণ মাধুরী, হতভাগ্য মানুষের পরাজয়ে একটা স্নিগ্ধ কারুণ্যই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবহমান। কবিপ্রাণ কল্পনাপ্রবণ যুবক। দারিদ্র্য আর হাঁপানি-রোগের সঙ্গে তার আজীবন সংগ্রাম। ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরে মাকে নিয়ে থাকে, আর মা'র শেষ গয়না বন্ধক দিয়ে বি-এ পড়ার খরচ চালায়। মা যখন ঠাকুরের কাছে ছেলের কল্যাণ কামনা করেন, তখন সে বলে, 'তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতই বাজে রাঁধুনে, মা।

হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্যন্ত ভাল শেখে নি।’ রসিকতা উচ্চগ্রামের হোক আর নাই হোক্, ওর মধ্যেই ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ আর অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তবু তো বুকে আশার শেষ নেই! কবি যে বলেছেন, ‘জানি গো দিন যাবে, এ দিন যাবে।’ তা ছাড়া কতটুকুই বা দাবি! একমুঠো ভাত, একখানি কুঁড়ে ঘর, আর একটি কল্যাণী নারী। কিন্তু তাও তো ভাবীকালের স্বপ্ন, আপাতত যে বি-এ পডার খরচই কুলোয় না! ছেলে-পড়াতে গিয়ে কবিকিশোরের স্বপ্নদেখার প্রশ্রয়-দানের অপরাধে চাকরিটি গেল। কিন্তু বাকি স্বপ্নসাধই বা অপূর্ণ থাকে কেন! দু বছরের পড়ার খরচ আর মা’র হাতে এক হাজার টাকার নোট তুলে দেওয়ার বিনিময়ে ধনিগৃহের অরক্ষণীয়া ‘যমের অরুচি’ পাত্রীর সঙ্গে হল বিয়ে। হোক কালো কুৎসিত মেয়ে, তবু তো জীবনের অন্তত একটা দিন রাজার মত সম্মান পাওয়া গেল। অন্তত একটা দিন তাকেই উপলক্ষ করে, তারই জন্যে সমস্ত-কিছু আয়োজন! কিন্তু শুধু একবারই নয়, আরো একবার সে রাজসম্মান পেল। পথ চলতে গিয়ে মোটর চাপা পড়ে যেদিন সবারই কাঁধে চড়ে সে মহাযাত্রায় বেরোল। ওর জন্যেই তো সেদিনের সূর্য অস্ত যাচ্ছে! ওর জন্যেই তো লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু! গল্পের নায়কের নাম অমর। দারিদ্র্য-ব্যাধি-মৃত্যু-কবলিত জীবনের অমর কাহিনীই বটে! সমস্ত প্রতিকূলতা অস্বীকার করে বেঁচে থাকার কী আকাঙ্ক্ষা, পদে-পদে ব্যর্থতা-হতাশা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি কী গভীর আসক্তি এ গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে! রুপার্ট ব্রুক একদিন মহাযুদ্ধে নিহত অখ্যাত সৈনিকের উদ্দেশে তাঁর সনেটের অর্ঘ্য সাজিয়ে বলেছিলেন, ‘These hearts were woven of human joys and cares!’ জীবনযুদ্ধে পরাজিত একটি আদর্শবাদী বাঙালী তরুণের বিষাদময় কাহিনীর শেষে গল্পের ফলশ্রুতিতে যেন এই একই করুণাকোমল কণ্ঠের অশ্রুবাষ্পরুদ্ধ স্বর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে: এরাও জীবনকে ভালবেসেছে, এরাও বাঁচতে চেয়েছে। বিশ্বাস করেছে—‘জানি গো দিন যাবে, এ দিন যাবে।’ ‘শেলিও একথা বিশ্বাস করে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর একশ’

বছর এক এক করে খসেছে। দিন আর এল না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারী নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভরে রৌদ্রের রোদন!'

তরুণ বয়সের রচনায় ভাবাতিশয্য 'দুইবার রাজা'র মধ্যে পরিস্ফুট; কিন্তু 'সাহেবের মা' গল্পে জীবনবোধ আরো সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণাগ্র হয়েছে, আরো শানিত ও সরল হয়েছে লেখনী। সাহেবের মা আধ-পাগলা বুড়ি। তিন ছেলে ছিল আর ছিল আল্লা। মন্বন্তরে ঘাস-পাতা ছাতা-মাথা অখাদ্য খেয়ে ছেলে তিনটি মারা গেছে, আর আল্লা গেছে বড়-লোকের পকেটে, কোঠাবাড়িতে। নিরাশ্রয় বৃদ্ধা ভিক্ষা করে খেত; দেশকর্মী অমূল্য নিয়ে গেল পাশের গ্রাম ডুমুরতলায়, যেখানে পল্লীর পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। শ্মশানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গঞ্জগোলায়। পাণ্ডুরকে শ্যামলে। বৃদ্ধার নাম সাহেবের মা। কিন্তু আশ্চর্য, তার একটি ছেলের নামও সাহেব ছিল না। বাপ যখন তার নাম রেখেছিল তখন সরলপ্রাণ চাষা হয়তো আশা করেছিল, সাহেব নামে সৌভাগ্য আসবে তার মেয়ের সংসারে। নাতি তার লাটসাহেব হবে। হল না কিছুই, কেবল নামটিই অদৃষ্টের পরিহাস হয়ে রইল। আর এই পরিহাস-প্রহসিত জীবননাট্যের চূড়ান্ত দৃশ্যে বৃদ্ধা তার সাহেব-ছেলের পেল সাক্ষাৎ। ডুমুরতলার গ্রামোন্নয়ন-সত্র পরিদর্শনে এসেছে মহকুমার ছোকরা-মুনিব জীবেশ। চারদিকে রব উঠল, সাহেব এসেছে, সাহেব। কাগজের ঠোঙা বানাচ্ছিল বৃদ্ধা। কে তাকে পরিহাস করে বললে, 'তোর ছেলে এসেছে, সাহেবের মা।' কিন্তু কী পরিচয় তার? কোন্ অভিজ্ঞানে মা চিনবে তার ছেলেকে? ছোকরা-সাহেব সারাদিন অফিসের কাজ করে সরাসরি চলে এসেছে এখানে। বাড়ি ফেরে নি। স্বভাবতই সে ক্লান্ত। এদিকে অমূল্যর উৎসাহের শেষ নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাচ্ছে সব কাজ কর্ম। অবশেষে জীবেশ মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হল, 'এবার যাই অমূল্যবাবু। অফিস থেকে এখনো বাড়ি যাই নি। খিদে পেয়ে গেছে।' কথাটি লাগল গিয়ে ঠিক সাহেবের মার হৃৎপিণ্ডে। সন্দেহ কি, এ তারই ছেলে। বলছে, খিদে পেয়েছে। বলছে, খেতে দাও কিছু। সন্তান-বৎসলা জননী কাগজের ঠোঙায় চিনির

বাতাসা নিয়ে ছুটে গেল তার ছেলের কাছে। পাগলীর কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। কিন্তু সাহেব মাতৃত্বের এই অদ্ভুত 'কিউরিও' মাকে দেখবার জন্যে নিয়ে গেল তাকে গাড়িতে তুলে। কত সুন্দর বাড়ি, কেমন সুন্দর বাগান। বাড়িতে পা দিয়েই ছেলে আনন্দে ডেকে উঠল মাকে। ডাকটা একটা দগ্ধ শেলের মত লাগল এসে সাহেবের মার বুকে। এ অহংকারের ডাক তো তার ছেলের কিছুতেই হতে পারে না। সাহেবের মা বুঝতে পারল, বালির উপরে রোদ্দুরে তার জলভ্রম হয়েছে। উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় গল্পটি অবিস্মরণীয়! কিন্তু বুভুক্ষার যে অভিজ্ঞানে দরিদ্র-জননী তার সন্তানকে চেনে শিল্পী অচিন্ত্যকুমারও সেই অভিজ্ঞানেই এ যুগের নবজীবনের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। আর শিল্পিহৃদয়ের উৎকণ্ঠাবশেই তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা রসপিপাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৪

কালানুক্রমিক বিচারে বর্তমান সংকলনে গ্রথিত প্রথম ও শেষ রচনার মধ্যে প্রায় পঁচিশ বৎসরের যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে, স্বভাবতই তার মধ্যে শিল্পিমানসের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টিকর্মেও এসেছে পরিবর্তন। রীতি ও শৈলীতে, রূপনির্মাণ ও রসপরিবেশনে, এমন কি দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধে সে ক্রমবিবর্তনের ধারাকে মোটামুটি তিনটি স্থূলভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম, কল্লোলের ভাব-ভাবনা ও সৃষ্টিনিরীক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবের যুগ; দ্বিতীয়, মফস্বলের শহুরে জীবনের অভিজ্ঞতার যুগ; তৃতীয়, নগরবিকেন্দ্রিত পল্লীজন-জীবন-চেতনার যুগ। প্রথম যুগের রচনার বৈশিষ্ট্য কল্পনাসমৃদ্ধি ও কাব্যসুরভিতে। 'দুইবার রাজা'র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এযুগের লক্ষণাক্রান্ত অন্যান্য রচনা 'অরণ্য', 'ধন্বন্তরি', 'রুদ্রের আবির্ভাব' ও 'অমর কবিতা'।

'অরণ্য' গল্পটি একটি একান্নবর্তী বিরাট পরিবারের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় নরনারীর মানস-বিশ্লেষণ। বিত্তবান তিন ভাই-এর তিনতলা বাড়িতে

প্রতিবেলায় পাত পড়ে একান্নটি। ওরা সবাই যখন একসঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় ওদের ঘিরে স্ফূর্তির ফোয়ারা চলছে,—বিলাসের প্রাচুর্য আর আড়ম্বরের কৃত্রিমতার মধ্যে ওদের দুঃখকে ছোঁয়াই যায় না। কিন্তু যখন ওরা একা থাকে তখন চেনা যায় যে ওরা প্রত্যেকেই আপনাকে নিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অরণ্যের বৃক্ষরাজির মতই একই ছায়াতলে বাস করেও কারোর সঙ্গে কারোর আত্মিক কোনো যোগ নেই। পরিবারের বিবাহিতা কন্যা ভ্রমর মশগুল হয়ে আছে তার প্রাগ্‌বিবাহ যুগের পূর্বপ্রণয়ীর স্বপ্ন নিয়ে, হেনা দুই চোখে কবিতার বাতি জ্বালিয়ে কঠিন মাটিতে বসে কল্পনালোকে প্রেমের ফানুস ওড়াচ্ছে। বড় ভাই-এর ছেলে সুধাংশু ল-সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে পাড়ে থেকে বৃথাই কেবলি লগি ঠেলছে ; ঐশ্বর্য তার কাছে দুবিষহ বোঝা। ছোট সংসারে ছোট গণ্ডির মধ্যে সে হতে চায় একান্ত স্বার্থপর, একান্ত একলা। কেউ-বা বাংলা কাব্যমন্দিরের কালাপাহাড়, কেউ সুরাসক্তির ওমর-খৈয়াম। আর সব-চেয়ে টিপিক্যাল কল্লোলীয় তরুণ হচ্ছে সুবল। এডিলেডের ক্রিকেটখেলার মাঠ থেকে শিশিরকুমারের অভিনয় আর পাভ্‌লোভার নাচের আসর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে যার সমান ঔৎসুক্য। অটোগ্রাফের খাতায় উড়ে মালি, ঝাড়ুদার আর দারোয়ানের সই নিয়ে সে ভাবে, জীবনে যারা পতিত, পরাজিত—এই আখরের আঁচড়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস জমা করে রাখছে।

এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নরনারীর জীবনে একটিমাত্র যোগসূত্র, একটিমাত্র স্নেহের বন্ধন ছিল পাঁচ বছরের ছেলে রুশ। তেতলার ছাদে উড়ন্ত ঘুড়ি ধরতে গিয়ে রুশ ছিটকে পড়ল একেবারে বাড়ির উঠোনে। আর সেই আকস্মিক শোকের আঘাতে একই উপলব্ধির সমতলে এসে মিলিত হল সবাই।—মনে হল, মানুষের স্নেহবন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের আশা কত ক্ষীণায়ু, মানুষের প্রতীক্ষা কি বিশ্বাসঘাতক! গল্পটির উপসংহার জীবনের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যবোধের মধ্যে, এবং তাও কল্লোলেরই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে, বিভিন্নমুখী চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যে, এবং পরিসমাপ্তির অপ্রত্যাশিত

আকস্মিকতায় 'অরণ্য' ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শুধু অচিন্ত্যকুমারেরই নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই সম্পদ।

'ধন্বন্তরি' গল্পে বিত্ত ও স্বাস্থ্যবান ডাক্তার আর সম্বলহীন দুরারোগ্য-ব্যাধিগ্রস্ত রোগী। ডাক্তার তরুণ, শ্বশুরের পয়সাতেই ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি, আর গাড়ি-বাড়ি সবকিছু। স্বচ্ছকান্তি অভিনবযৌবনা অভিমানিনী স্ত্রী। মদকলকূজনে নিরাবেগ দিনরাত্রিগুলি অতিবাহিত হয়। রোগী নিম্নবিত্ত কেরানি। সংসারে তিনটি প্রাণী, স্বামী স্ত্রী আর তাদের প্রেম-কামনা-ব্যর্থতার প্রতিনিধি একটি শিশু। বাসর-রাত্রির স্বপ্নমদিরতায় স্ত্রীর নাম দিয়েছিল শিপ্রা। অসুস্থ শিশুর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে অপারগ বলে সেই স্ত্রী অনুযোগ করছে, 'ছেলেকে পথ্য দিতে পারবে না তবে বিয়ে করেছিলে কেন?' নিজের চিকিৎসার টাকা ছেলের অসুখে নিঃশেষ করেও তাকে বাঁচানো গেল না। রিক্তহস্তে রোগী হাজির হল ডাক্তারের কাছে। শেষ ভিক্ষা তার। বেঁচে থাকার জন্যে নয়, মরবার জন্যে এমন একটা ওষুধ চাই, যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না। কত দুঃখে এই মৃত্যুকামনা! কিন্তু কতটুকুই বা তারা চায়? শুধু টিকে থাকার, শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকু। মমতাহীন ডাক্তারের অকস্মাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন হল। বিচলিত চিত্তে ল্যাবরেটরিতে বসে তার কেবলই মনে হতে লাগল, দুখানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত তার দিকে কে প্রসারিত করে দিয়েছে, ঘোলাটে দুই চোখে কি বিবর্ণ বেদনা; তাকে বলছে: আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি—আপনি বিধাতার চেয়েও বড়! রইল পড়ে ডাক্তারের সম্ভোগবিলাসের বিহ্বলতা। সর্ব-শক্তি প্রয়োগ করে সে ব্যাধিতকে প্রাণবন্ত করে তোলার সাধনা গ্রহণ করল। কিন্তু বৃথাই তার চেষ্টা। রোগীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। এ গল্পে স্বাস্থ্য আর বিত্তের অজস্রতার বৈপরীত্যে ব্যাধি আর দারিদ্র্যের নগ্ন ও বীভৎস চিত্রটি লিপিকুশলতায় উজ্জ্বলতা পেয়েছে; কিন্তু ডাক্তারের মানস-পরিবর্তন এবং তার অন্তিম ব্যর্থতাবোধই গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

'কল্লোল-যুগে'র ইতিকথা রচনায় অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, 'আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নির্বারিত হচ্ছে—এই যন্ত্রণাটা সে যুগের যন্ত্রণা।' এই অনুভবের ওপর ভিত্তি করেই 'রুদ্রের আবির্ভাব' গল্পটিও রচিত। কূলগ্রাসী নদীর ভাঙনই 'রুদ্রের আবির্ভাবে'র আলম্বন। স্বভাবতই নদীর বর্ণনায় কবিত্বের গভীর স্পর্শ লেগেছে :

দূরে চাহিলে মনে হয়, একটা ফিনফিনে সাদা সিল্কের আঁচল ফাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগ্‌বসনা রাক্ষসীমূর্তি !

এই নদীরই তীরে পল্লীর কোলে নীড় রচনা করতে চেয়েছিল এক আদর্শবাদী তরুণ দম্পতি। নারী তার প্রাণপণ শক্তিতে সৃষ্টির কাজে মগ্ন ; আর নদী তার সর্বনাশা মূর্তিতে ধ্বংসের তাণ্ডবে উন্মত্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংসের কাছে সৃষ্টির ঘটল পরাজয়। নদীর কাছে নারী হল পরাজিত। তার বহুসাধের বহুস্বপ্নের আশ্রয় নদীগর্ভে হল নিমজ্জিত। সেই নিমজ্জন-দৃশ্যের বর্ণনা অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত—

বড় বড় ছবি, কৌচ-টেবিল চেয়ার-আলমারি, বাসন-কোসন, খেলনা-পত্র, বিম-বরগা, ইটকাঠ, জানালা-দরজা—সব যেন এক সঙ্গে কানের কাছে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মত কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমত সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গে বস্তুর সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

বেগের সঙ্গে বস্তুর যুদ্ধ আর দুর্নিবার কালস্রোতের সঙ্গে মানুষের বেঁচে-থাকার সংগ্রাম তো একই। তাই নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা পেলেও কালের গ্রাস থেকে নিস্তার নেই,—এই অনুভূতির মধ্যেই গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞান-বিধৃত এ যুগের যে জীবনোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে গতিবাদের সৃষ্টি করেছে, তারই সার্থক গল্পরূপ অচিন্ত্যকুমারের 'রুদ্রের আবির্ভাব'। এ গল্পে কাব্য ও কথাশিল্পের রাখিবন্ধনে জীবনরহস্য বাণীবিগ্রহ লাভ করেছে।

'অমর কবিতা' গল্পে কবিত্ব আর মনস্তত্ত্বের মণিকাঞ্চনযোগ। প্রথম ও একমাত্র শিশুকন্যার মৃত্যুতে শোকাভিভূত জননীর আবেগাতিশয্য,

তার পরিণাম ও তার স্বরূপসন্ধান এ গল্পের উপজীব্য। সন্তানের মৃত্যুতে জননী অকস্মাৎ কবি হয়ে উঠল। নিজের নাম বানান করতে পর্যন্ত সে হোঁচট খেত, সে তার কন্যার মৃত্যুর ওপর এক প্রকাণ্ড শোক-গাথা রচনা করলে। স্নেহের দুলালীকে সে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবে না, ভালবাসার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে, অমর করে রাখবে শিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু তার কবিতার মূল্য কেউ বুঝল না; তবু তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। দেয়ালে দেয়ালে সে খুকির ছবি এঁকে রাখল, একতাল কাদা দিয়ে তার মূর্তি রচনার আয়োজন করল। সজ্ঞানে সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে, তার খুকি নেই। একটা পুতুলকেই খুকির স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ঘুমের মধ্যে বার বার উঠে সে পুতুলের কাঁথা বদলায়, সময়মত রোজ স্নান করায় লুকিয়ে, নিজের খাবার সময় তাকে কোলে নিয়ে বসে। কিন্তু তার সন্তানশোকের এই আত্যন্তিকতা ক্রমশই আত্মীয়-পরিজনের উপহাসের বিষয় হয়ে উঠল। শাশুড়ী তাকে ব্যঙ্গে ও ভৎর্সনায় জর্জরিত করে তুললেন, স্বামী পর্যন্ত শেষটায় শ্লেষে, কটূক্তিতে নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। অবশেষে এই উৎকেন্দ্রিকতার যা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাই হল। সে পাগল হয়ে গেল! শোকের সমস্ত সাজসজ্জা সে বিসর্জন দিলে। ছিঁড়ে ফেললে দেয়ালের সব ছবি। পুড়িয়ে দিলে কবিতাটা। পুতুলটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললে। একতাল কাদা দিয়ে একদিন সে খুকির মূর্তি গড়বার কল্পনা করেছিল, দেখা গেল, তাতে সে নিজেরই মূর্তি তৈরি করে বসেছে।

ফ্রয়েডীয় অবচেতনবাদের ভিত্তিতে এই কুয়াসাচ্ছন্ন জীবনরহস্যের জটিল গ্রন্থিমোচন করলে দেখা যাবে যে, কন্যা সম্পর্কে জননীর কোনো অপরাধবোধ বা পাপচেতনা তার অবচেতনলোকে ছিল বলেই সন্তানের মৃত্যুকে অস্বীকার করবার জন্যে তার সজ্ঞান মনে এত উৎকণ্ঠা। হয়ত সে অবচেতন মনে কন্যার মৃত্যুই কামনা করেছে, অথবা এও হতে পারে, কন্যা সম্পর্কে সে ঈর্ষাপরায়ণা ছিল। যাই হোক, শিল্পের মাধ্যমে বাসনার পরিশুদ্ধকরণের দ্বারা সে মুক্তির সন্ধান করেছে। কিন্তু সার্বভৌম প্রতিকূলতা এই মুক্তির পথরোধ করে দাঁড়াবার ফলে ঘটল তার চেতন

মনের পরাজয়। তখন অবচেতন মনের স্বরূপপ্রকাশের আর কোনো অন্তরায় নেই। দেখা গেল খুকির মূর্তিরচনার সচেতন বাসনা আসলে নিজেরই মূর্তিরচনার ছদ্মবেশমাত্র। সন্তান-বাৎসল্য আত্মরতিরই নামান্তর। যে মাতৃত্ব চিরকাল অমর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে, মনঃসমীক্ষণের দৌলতে তার এই নিরাবরণ নগ্নরূপের আবিষ্কার এযুগের জীবনবোধে ট্রাজেডির নতুন উপাদান রচনা করেছে। মানুষ তার নিজেরই অবচেতন মনের কাছে কত অসহায়; তার আচার-আচরণ, তার ভাবনা-কল্পনা তার অজ্ঞাত বাসনার কাছে কত অকিঞ্চিৎকর—এই উপলব্ধির মধ্যে গল্পের ট্রাজিক-পরিণাম সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উঠেছে।

৫

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যসৃষ্টির আমরা যাকে দ্বিতীয় যুগ বলেছি তার মধ্যে বাস্তবতার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়েছে। কাল্পনিকতার চেয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গল্পকে আমাদের পরিচিত জগতের আরো কাছে এনে পৌঁছে দিয়েছে। কবিকর্মের চেয়ে সৃষ্টিধর্মই বড় হয়ে উঠেছে এখানে। 'অমর কবিতা'র সঙ্গে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' গল্পটির তুলনা করলে এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখানেও মাতৃত্বেরই কথা। কিন্তু এ মাতৃত্ব দৈনন্দিন জীবনের অতি-পরিচিত পরিবেশের মধ্যে তার সহজ রূপেই উদ্ভাসিত। দরিদ্র সংসারের বি-এ পাস বেকার ছেলে। যা-হোক-একটা চাকরি সংগ্রহের জন্যে প্রায় স্বর্গ-মর্ত্য ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। অকস্মাৎ এল প্রত্যাশিত শুভমুহূর্ত। টেলিগ্রামে খবর এল, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কেরানির চাকরিতে সে নিযুক্ত হয়েছে। পঞ্চাশ টাকায় শুরু, বছরে দু টাকা করে বেড়ে চুয়াত্তর টাকায় শেষ। কিন্তু অর্থের পরিমাণটা এখানে নিতান্তই তুচ্ছ। বেকারত্বের শাপমুক্তি হল, এই তো সবচেয়ে বড় কথা! বেকার-সমস্যা-নিষ্পেষিত দরিদ্রঘরে একটি চাকরি-পাওয়ার সংবাদ যে কি আলোড়ন সৃষ্টি করতে

পারে গল্পটি তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। খোকার চাকরি হয়েছে, মার আহ্লাদে আটখানা হবার কথা। এত বড় গৌরবের সংবাদটা দশজনকে দশখানা করে না বলতে পারলে তৃপ্তি কোথায়! যে-যাই ঠাট্টা করুক, পাকা বাড়ি হবে বৈ কি! রাজলক্ষ্মী বৌ ঘরে আসবে। দেখতে-দেখতে পায়ের তলায় কাঁচা-মাটি সোনা হয়ে উঠবে। কিন্তু চাকরিতে যে সঙ্গে-সঙ্গেই যোগদান করা চাই! টেলিগ্রাম এসেছে সকালের দিকে, রাতের ট্রেনেই রওনা হতে হবে। খোকা চলে যাবে দূরে—নির্বান্ধব অপরিচিত জায়গায়। মার মনে দুর্ভাবনারও শেষ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেদিন আর খোকার যাওয়াই হল না। ট্রেনের সময় দিয়েছে এগিয়ে। স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ফেল করে বাড়ি ফিরতে হল তাকে। মা আর্তনাদ করে উঠলেন, চাকরিটা তা হলে গেল!—যাবে কেন, পরের দিন রওনা হলেই হবে। কিন্তু মার মনে তাতে স্বস্তি নেই। ওদিকে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে বৃষ্টিতে ছেলের জামা-কাপড় ভিজে গেছে, সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও নেই। ছেলেকেই মুখ ফুটে বলতে হল, 'তুমি এখন আমাকে একখানা শুকনো কাপড় দাও দিকি। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।' সে কথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই মা বললেন, 'আর কোনো ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে আজই যাওয়া যায় না?' মাতৃ-মনস্তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন এতক্ষণে সম্পূর্ণ হল। মার কাছেও পুত্রের জন্যেই পুত্র প্রিয় নয়, বিত্তের জন্যেই পুত্র প্রিয়। চাকরির মূল্যেই সন্তানের মূল্য! প্রচলিত ভাবাদর্শের ভিত্তিমূলে বাস্তবতার রূঢ় আঘাত যতই নিষ্ঠুর হোক, সত্যকে অনাবৃত করে দেখার যুগচেতনাই এ গল্পে ভাষা পেয়েছে।

বাস্তবতার আঘাতে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডির আরেকটি সার্থক উদাহরণ 'তিরশ্চী' গল্পটি। কালো কুৎসিত মেয়ে সুমিতা। কালো বলেই বিয়ের আলাপ কনে-দেখা পর্বে এসে বার-বার ভেঙে যায়। আর সে সুযোগে সুমিতা তার কুমারী-হৃদয়ের নিভৃতচারী প্রেমকে বাঁচিয়ে রেখে প্রিয়মিলনের শুভদিনের প্রতীক্ষা করে। কিন্তু অঘটন ঘটাল মোটা-মাইনের উচ্চশিক্ষিত এক যুবক। সে

তাকে পছন্দ করে বসল। বাধ্য হয়েই সুমিতা পাকা-দেখার আগে তাকে এক চিঠি লিখলে, এ বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করে। 'আমার এ অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।' আদর্শনিষ্ঠ যুবকের কাছে শ্রদ্ধা পেল সে। মুক্তিও পেল। কিন্তু বাস্তবের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কি মুক্তি আছে মানুষের! তিন বৎসর পরে সেই যুবকের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হল সুমিতার। যুবকটি তখন হাকিম। আর তারই সেরেস্তাদারের অধীন কেরানি পশুপতির স্ত্রী হয়েছে সুমিতা। পশুপতি চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে। সুমিতা এসেছে হাকিমের কাছে স্বামীর হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে। নিয়তির এই নির্মম পরিহাসে চমকে যাবারই কথা। প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষা সুমিতার ব্যর্থ হয়েছে। স্বার্থপর পশুপতি অর্থের লোভে তাকে পছন্দ করেছিল। চিঠি লিখেও তাকে নিবারিত করা যায় নি। কিন্তু সুমিতার এই চরম পরাজয়েও আজ হাকিমের মনে কোনোই করুণার উদ্রেক হল না। তার অব্যক্ত বেদনাকে বুকের মধ্যে নিরুদ্ধ রেখেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হল সুমিতাকে। হাকিমের এই ক্ষমালেশহীন নির্মম আচরণ সুমিতার পরাজিত জীবনের অসহায়তাকে আরো করুণ করে তুলেছে।

'তিরশ্চী' গল্পে সুমিতার জীবনের বিফলতাসৃষ্টির মূলে সমাজশক্তির ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন। তার ভীরুপ্রেম সমাজের সামনে দাঁড়াতেই সাহস পায় নি। কিন্তু 'হরেন্দ্র' গল্পে ব্যক্তিজীবনের দুঃখরচনায় সামাজিকতার প্রভাব প্রত্যক্ষ। হরেন্দ্র আটত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহকে উপবাসী রেখে শিরঃপীড়ায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে। সন্ন্যাসী বাওয়ালির মেয়ে বেগুনিকে বিয়ে করে সে শিরঃপীড়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে; কিন্তু তার জন্যে ছকুড়ি টাকা কন্যাপণ চাই। হরেন্দ্রর সাধ্য নেই সে টাকা সংগ্রহ করে; সুতরাং তার বিয়েরও কোনো সম্ভাবনা নেই। বেগুনির বাপের কাছে কোনো ওকালতিই খাটল না। বিনাপণে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে জাতজন্ম খুইয়ে সমাজের বার হয়ে যেতে

পারবে না। তার চেয়ে মেয়ের বিয়ে না হয় না-ই হবে। হলও তাই। পিতৃগৃহ থেকে বেগুনি অপহৃতা হল। নারীহরণ-মামলার নিষ্পত্তির পরে বাপ তাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিলে না। সে আশ্রয় পেল এক সন্ন্যাসীর অবলা-আশ্রমে। হরেন্দ্রর কিন্তু আপত্তি নেই, সে বেগুনিকে বিয়ে করতে সানন্দে প্রস্তুত। কিন্তু এবারও তাদের মিলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াল সমাজ। হরেন্দ্রর বাপ-ভাই সবাই এর বিরুদ্ধে। পাড়াপ্রতিবেশী, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বজাতি-বিজাতি সবাই। জমিদারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা—বলে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দেবে। সন্ন্যাসী বাওয়ালি শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—বেগুনি যদি ফের গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচি-কুচি করে শেয়ালের মুখে ধরে দিয়ে আসবে। কাজেই হরেন্দ্রর বুভুক্ষু উপবাসী জীবনের নিরুপায় যন্ত্রণার অবসান আর কিছুতেই হল না। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ-রচনায় সমাজশক্তি বরাবরই নেপথ্যচারী। 'হরেন্দ্র' গল্পটি তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

'ছুরি' গল্পের বিষয়বস্তু দেবতারও অজ্ঞাত স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। নায়ক মফস্বল শহরের সরকারী চাকুরে। অবিবাহিত। তার স্বৈরাচারী স্বপ্নে মনে হয়, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তপোশ হয়ে উঠল, আর প্রকাণ্ড আকাশটা হয়ে দাঁড়াল একটা মশারি। যে-কোনো কুমারীকে যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি, এই যে একটা দিগন্ত-বিস্তৃত সুখ এটা তার কাছে পুরাকালের বহুপত্নীত্বের চেয়েও রোমাঞ্চকর। চাকরিটি শহর থেকে শহরান্তরে ঘন-ঘন বদলি হবার। বহুস্থানে মেয়ে-দেখে-বেড়ানোর সুযোগও তাই অবারিত। এমন কি, প্রশস্ত রাস্তাটি যদি তার মনঃপুত না হয় সেই জন্যে অনেক মেয়ে অন্ধকার সংকীর্ণ পথে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবিশ্যি তাদের মায়েদের মত নিয়ে। অবশেষে বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় সে বদলি হল যেখানে দিনে-রাতে ঘুণাক্ষরে একটি তরুণীর দেহরেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। চাকরি-জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। এমনি দিনে সে সাক্ষাৎ পেল গৌরীয়ার। হিন্দুস্থানি মেয়ে। বয়স আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, শাদার উপরে

কালোর ছাপ-তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা শাড়ি পরনে। তার তনুদেহের উপমায় রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড কিংবা রৌদ্রঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের উপমানও হার মানে। কটাক্ষ-কুটিল কালো দুটি আয়ত চোখ তুলে সে নায়কের চিত্তবিভ্রম ঘটালে। ছোট-শহরের বড়-সাহেবের মনে হল, গৌরীয়া সহজপ্রাপণীয়া। ইচ্ছে হল নির্জন রাতে অন্ধকার বাঙলোয় তাকে অভিসারিণী করে আনেন। অগত্যা নিজেই অভিসারী হলেন। কিন্তু গৌরীয়ার চারদিকে তার ব্যক্তিত্বের দুর্ভেদ্য প্রাচীর উঁচু হয়ে আছে। সেখানে প্রবেশের ক্ষমতা বড়সাহেবেরও নেই। সে আকর্ষণ করে, কিন্তু ধরা দেয় না। গৌরীয়া নিজের সম্পর্কে এবং আকর্ষণের বস্তু সম্পর্কেও সচেতন। তাই বালিশের তলায় প্রকাণ্ড একটা ছুরি তার শয্যার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এই ছুরির প্রয়োজনীয়তাই তো তার আত্মদৌর্বল্যের প্রমাণ! গৌরীয়ার কাছে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থকাম বড়সাহেবকে অপমানে শহর ছেড়ে পালাতে হল। বিদায়-মুহূর্তে ছুরির প্রয়োজন আর গৌরীয়ার নেই। পথের পাশে দাঁড়িয়ে সে প্রথম এবং শেষবারের মত অল্প একটুখানি হাসি দিয়ে প্রত্যাখ্যাত নায়ককে সম্ভাষণ জানাল। সে হাসি ভোরবেলাটির মতই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে, এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া উত্তীর্ণ হয়েছে। কথাসাহিত্য-জগতের অসংখ্য নরনারীর ভিড়ের মধ্যেও এই রহস্যময়ী নারীটিকে ভোলবার উপায় নেই।

'তিরশ্চী' 'হরেন্দ্র' ও 'ছুরি' গল্পে মফস্বলের বড়সাহেব ছোটসাহেবদের পরিচয় আভাসে-ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'অকারণ' গল্পে। শুধু সাহেবরাই নন, তাঁদের মেমেরাও আছেন। ঈর্ষা দলাদলি আর পারস্পরিক স্তরপর্যায়ে আপেক্ষিক আভিজাত্যবোধের কম্‌প্লেক্‌স নিয়ে এঁদের বিচিত্র জীবন। মফস্বলের অভিজাতপাড়ায় চলনে-বলনে ভব্যতার মুখোসপরা এক অদ্ভুত সমাজের জীব এঁরা। আধুনিক কথাসাহিত্যে এঁদের চরিত্রচিত্রণে অচিন্ত্যকুমার অদ্বিতীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। 'অকারণ' গল্পে

দাস-সাহেবের সঙ্গে রায়-গৃহিণী সর্বাণীর মেলামেশাই কুৎসামুখর কল-গুঞ্জনের সৃষ্টি করেছে। এঁদের উন্নাসিকতার মুখোস খুলে ধরতে লেখকের বক্রোক্তি ক্ষুরধার। কিন্তু শুধু উপহাস-রসিকতাই নয়, মনস্তত্ত্বের গভীরতায়ও শিল্পীর দৃষ্টি ডুব দিয়েছে। দাসসাহেব আর সর্বাণীর মেলামেশা নিয়ে কুৎসা-রটনা কি নিতান্তই অকারণ? সর্বাণীর অভিযোগের ফলে দাস-সাহেবের চক্রান্তে যে ভোজবাজি হয়ে গেল, তারই অন্তিম দৃশ্যে সর্বাণীদের বিদায়লগ্নে মনের লুকোচুরি খেলার স্বরূপ ধরা পড়েছে। সর্বাণীরা উচ্চতর পদে অন্যত্র বদলি হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এখন দাস-সাহেবের অন্তরঙ্গতা তার অনভিপ্রেত। তাই দুপুরে দাস-সাহেব যখন সর্বাণীদের গৃহে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন সে স্পষ্ট ভাষায়ই জানিয়ে দিলে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো স্ত্রীবন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা সে শিষ্টাচার মনে করে না। দাস যেন দুচোখে ধাঁধা দেখলেন। তাঁর এতদিনের আচার-আচরণ একমুহূর্তে সম্পূর্ণ অনাবৃত হতে দেখে তিনি রুদ্ধ আক্রোশে পশ্চাদপসরণ করলেন। দাস-সাহেবের চরিত্র-চিত্রণে লেখকের পরিমিতিবোধ সূক্ষ্ম কারুকার্যে সফলতা পেয়েছে।

মফস্বলের আদালতের বর্ণাঢ্য চিত্রটি 'সাক্ষী' গল্পে সুপরিস্ফুট। মামলাবাজ ষষ্ঠী ভট্টাচার্যের মিথ্যা মামলার সাক্ষ্য দিতে এসেছে দুর্লভ প্রামাণিক। সে ভাল করেই জানে তার সাক্ষ্যের উপরই ভট্টাচার্যের মামলার ভবিষ্যৎ। সুতরাং এই সুযোগে ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সে যা-পারে আদায় করে নিচ্ছে। কিন্তু দুর্লভ প্রামাণিককেও বোকা বানাবার মত উকিলের অভাব নেই আদালতে। কাজেই ভটচাজ মশাই যখন দুর্লভের মনস্তুষ্টির জন্যে রঙিন চাদর সংগ্রহে ব্যস্ত তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষের ধূর্ত উকিলের জেরায় দুর্লভ মামলার দফা শেষ করে দিয়েছে। দুর্লভ-চরিত্রটি সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু আদালত-জীবনে এঁরা নিত্যলীলারসিক। অচিন্ত্যকুমার আদালতের প্রতিদিনের কাহিনীকে চিরদিনের ভাষায় গ্রথিত করে রাখলেন। আদালতের সাক্ষ্য নিয়ে কমলাকান্তের জবানবন্দী বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। দুর্লভের সাক্ষ্যও এদিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের নতুন সম্পদ হয়ে রইল।

'বৃত্তশেষ' গল্পে মফস্বল-জীবনের মাৎস্যন্যায় পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। ক্ষেত্র দুয়ারী আর মনোরথ এককালে শরিক ছিল। কিন্তু মনোরথ যেদিন আদালতের পেয়াদা-বাবু হয়ে ক্ষেত্রর নামে ডিক্রি জারিতে এল সেদিন সে যেন নবাব-নাজিম। ক্ষেত্রর কাকুতি-মিনতি সে কানেই তোলে না। কিন্তু এই মনোরথই আবার নাজিরবাবুর কাছে একেবারে কেঁচো! তেমনি নাজিরবাবুরও আছেন ক্ষীরোদ হাকিম। হাকিমেরও হাকিম দস্তিদার সাহেব। এককালে সহপাঠী হলে কি হবে, এখন দস্তিদার সাহেব অধস্তন হাকিমকে চিনতেই চান না। কিন্তু দস্তিদার সাহেবকেও উজির সাহেবের নিকট দস্তবরদারের মত হাত কচলাতে হয়! উজির ভূতনাথ দেবনাথ এককালে উকিল ছিলেন, দস্তিদার একবার তাঁকে তাঁর কোর্ট থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তারই প্রতিশোধ নিচ্ছেন ভূতনাথ দস্তিদারকে চোখ রাঙিয়ে। কিন্তু চক্রপরিক্রমা এখানেই সমাপ্ত হয় নি। যেখানে শুরু সেখানেই বৃত্ত শেষ হল। ক্ষেত্র দুয়ারীর দ্বারে গিয়ে ভূতনাথ দেবনাথকে ধন্না দিতে হল। ভোট চাই এবং তারই জন্যে রাজা-উজির সবাই অবশেষে ক্ষেত্র দুয়ারীর করুণার ভিখারী। ভূতনাথের প্রতীক হচ্ছে কাস্তে, সেই সুবাদে তিনি ক্ষেত্রর আত্মীয়তা দাবি করছেন। ক্ষেত্র মাথা নাড়ে, মুখ টিপে টিপে হাসে; আর বেড়ার গায়ে গোঁজা কাস্তের দিকে তাকায়। এ গল্পের পরিণতি অচিন্ত্যকুমারের শিল্পজীবনেও তাৎপর্যবান। যে গভীর ব্যর্থতাবোধের মধ্যে তিনি সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন এখানে এসে তা যেন নতুন ভরসায় সন্দীপিত হয়ে উঠেছে।

৬

অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যসাধনা তাই তৃতীয় পর্বে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে এসে বৃহত্তর জীবনোপলব্ধির আনন্দে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। কারণ জনজীবনের মধ্যেই এযুগের শিল্পিমানসের সবচেয়ে বড় ভরসা।

অবশ্য সমষ্টিবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবন নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা তাঁর নয়। ব্যক্তিজীবনের মনের গহনেই তাঁর শিল্পের সীমাহীন সাম্রাজ্য। এবং সেখানেও অবচেতনবাদী ফ্রয়েডের সূত্র ধরে মানুষের মধ্যে কেবল পশুকেই খুঁজে বেড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁর সাম্প্রতিক রচনা দরিদ্র মানুষের চরম দুঃখের কথা বলতে গিয়েও প্রাণপ্রাচুর্যে চিরসঞ্জীবিত।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী বাংলার জনমানবের দুঃখ-দুর্গতির ছবিই বিশেষভাবে রূপ পেয়েছে এযুগের রচনায়। 'কালনাগ', 'বস্ত্র', 'বাঁশবাজি'তে মন্বন্তরের পটভূমি ও প্রভাব প্রত্যক্ষ। 'কালনাগ' গল্পে মন্বন্তরে অনশনক্লিষ্ট নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের সর্বহারা দীনতার চিত্র। ইস্কুলমাস্টার ভবতোষ, তার স্ত্রী আর তিনটি অসহায় ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। আত্মহত্যা ছাড়া পরাজয়-মোচনের আর কোনো উপায়ই চোখে পড়ে না। আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েই ঘুমিয়েছিল ভবতোষ। ভোরে ঘুম ভেঙে দেখে স্ত্রী সুধা ঘরে নেই। তবে সুধাই কি আগে তাকে ফাঁকি দিয়ে আত্মহত্যা করে বাঁচল? ভবতোষ পাগলের মত চারদিক খোঁজে। শেষটায় গঙ্গার ঘাটেই গেল সুধার মৃতদেহের সন্ধানে। এমনি ভাবে ছটফট করে উৎকণ্ঠায় সারাদিন কাটাবার পর প্রায় সন্ধ্যার সময় সুধা ফিরল অপরূপ বেশে। বস্তির ঝিএর মত তার বেশভূষা, হাতে দুসের চাল। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কণ্ট্রোলের দোকানে গিয়েছিল চাল সংগ্রহে। আর ঝি না সাজলে কি দাঁড়ানো যায় কণ্ট্রোলের লাইনে? কিন্তু সুধার প্রায় পিছনে-পিছনেই এসে উপস্থিত চিনে-সিল্কের ছেঁড়া-পাঞ্জাবি-পরা এক আধবয়সী ভদ্রলোক। সুধার সন্ধানে সে এসেছে। তাকে দেখেই ভবতোষের মনে আদিম সন্দেহ কুটিল কালনাগের মত উদ্যতফণায় হিংস্র হয়ে উঠল। আরো বিস্মিত হল তার প্রতি সুধার মমত্ববোধের পরিচয় পেয়ে। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেনে সুধাকে আক্ষেপ করতে দেখে ভবতোষের কণ্ঠে কালনাগের তীব্র বিষ উচ্ছলিত হয়ে উঠল কুৎসিত কটাক্ষে,—'না, তাকে আমার খাট ছেড়ে দিতে হবে!' কিন্তু সুধা যখন কণ্ট্রোলের লাইনে চারদিনের

উপোসের পর চাল সংগ্রহ করতে এসে ভদ্রলোকের ব্যর্থতা ও ভেঙে-পড়ার কথা বর্ণনা করে বললে যে, সে-ই তাকে দয়াপরবশ হয়ে চারটি ভাত খেতে দেবার জন্যে ডেকে এনেছে, তখন ভবতোষ তার বিষের জ্বালায় নিজেই জর্জরিত না হয়ে পারল না। অকারণ-সন্দেহ-বিষের পরিমোক্ষণ-বর্ণনাটি ব্যঞ্জনাময়: 'আস্তে আস্তে একটা তীব্র ঘন উগ্র গন্ধ ভবতোষকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এখুনি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।' বাস্তবানুগ জীবন ও মনের বিচিত্রলীলা-বর্ণনায় অচিন্ত্যকুমার সূক্ষ্মকর্মে কত পারংগম, 'কালনাগ' তার সার্থক নিদর্শন।

'বস্ত্র' গল্পটিও মন্বন্তরের আরেকটি শ্মশান-চিত্র। বুড়ো ছাদেম ফকির। অনুদয়ে গেয়ে-গরুর দুধ দুয়ে লোকের বাড়ি যোগান দিত। সংসারে ছাদেমের পরিবার আর তার বিধবা পুত্রবধূ। বস্ত্রাভাবে সভ্যসমাজের সম্মুখীন হওয়া যায় না বলেই ছাদেমের জীবিকা বন্ধ হল। কোমরের নিচে একহাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। তারপর একেবারে তন্তুহীন। ছাদেম ফকির অন্ধকারে ভূতের মত শ্মশানে-শ্মশানে কাপড় খুঁজে ফেরে; যদি পায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, বালিশের খোল। অবশেষে একেবারে দিগম্বর অবস্থায় একদিন শ্মশানপথের অন্ধকারে ধরা পড়ে তার ভাগ্যে জুটল একখানি নতুন কাপড। কিন্তু একখানি মাত্র কাপড়ে কার লজ্জা নিবারিত হবে? নিজের, বৌ-এর, না ছেলের বৌ-এর? ছাদেম ফকির তাই লজ্জার হাত এডাবার জন্যে নতুন কাপড়খানি গলায় জড়িয়ে আমের ডালে ঝুলে আত্মহত্যা করল। নতুন কাপড় দেনেওয়ালা বাবু যখন ছাদেম ফকিরের সন্ধানে এলেন তখন সে লাজলজ্জার বাইরে নগ্নদেহে গাছের ডালে ঝুলছে। নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু মৃদু। কিন্তু ছাদেমের এই আত্মহত্যায় শোকে বিলাপ করবার মতও কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। না তার স্ত্রী, না তার পুত্রবধূ। পাওয়া যাবেই বা কি করে? মানুষের সমাজে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ নিয়ে বেরোবার

উপায় কোথায় তাদের ? কাঁদবার উপায়ও তাই নেই। ছাদেমকে লাশখানায় নিয়ে যাবার পর অবশ্য তারা কাঁদবার সুযোগ পেল! তার গলা থেকে কাপড়খানি খুলে শাশুড়ি-বৌএ দুভাগ করে পরবার পর শোক প্রকাশের সুযোগ হল তাদের। এ গল্পে মানুষের হাতে মনুষ্যত্ব বেআব্রু হয়ে লজ্জায় রুদ্ধকণ্ঠ।

এরা তবু শেষ পর্যন্ত কেঁদে দুঃখ লাঘবের সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু 'বাঁশবাজি' গল্পে পুত্রের মৃত্যুতেও বুড়ো বাপ মস্তাজের চোখের জল ফেলবার উপায় নেই। বাঁশবাজি দেখিয়েই সে অর্থোপার্জন করে, ওই তার একমাত্র জীবিকা। কিন্তু অনাহারজীর্ণ বৃদ্ধদেহে সব সময় সে টাল সামলে চলতে পারে না। তাই বাঁশের ডগায় উঠে বাজি দেখাতে গিয়ে ছেলে তার ছিটকে পড়ে মাটিতে। দুটি ছেলে তার সম্বল। বড়টি মারা যাবার পর ছোট ছেলেটি বোঝে এবার তার পালা। তাই তার নিঃসহায় শিশুকণ্ঠে ভীত আর্তনাদ: 'আমি নিঘ্‌ঘাত পড়ে যাব। মরে যাব আমি।' কোন্ অদৃশ্য আল্লার কাছে নিরুপায় শিশুর করুণ অথচ প্রতিকারহীন কাকুতি! মস্তাজ কিন্তু একেবারেই নির্বাক। তার পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো! দারিদ্র্য জীবিকান্বেষী মানুষকে হৃদয়হীন অমানুষিকতার ক্ষেত্রে কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে, এ গল্প তারই নির্মমতম উদাহরণ। দারিদ্র্যপীড়নে পাষাণীভূত পিতৃহৃদয়ের রূপায়ণে লেখক ভাষাশিল্পেও ভাস্কর্য-কাঠিন্য সৃষ্টি করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বক্ষেত্রে 'বাঁশবাজি' গল্পটি অচিন্ত্যকুমারের শিল্পসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'জনমত', 'দাঙ্গা' আর 'নুরবানু' গল্পের সুর আলাদা। জীবনের নাটকীয় মুহূর্তে মনের আকস্মিক দিক্‌পরিবর্তনের লীলারহস্যই এ তিনটি গল্পকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। 'জনমত' গল্পটি অধিকতর নাট্যধর্মী। কাবুলিওলা মামুদ খাঁ। তার লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশের ক্ষেত্রে এসে মামুদ খাঁর বিস্ময়ের শেষ নেই। বছর পাঁচেক জেলে ছিল সে, এরই মধ্যে যে দিন-কাল-পাত্র একেবারে হুবহু বদলে যেতে পারে তা তার

ধারণাই ছিল না। কিন্তু মামুদ খাঁ বুঝল, জনসমর্থন সে একেবারেই হারিয়েছে। কাজেই ভোজালি আর লাঠির দাপট তার মিথ্যা হয়ে গেছে। জনবলের প্রহারে জর্জরিত হয়ে মামুদ খাঁ পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মহেন্দ্র সাপুইএর কীর্তি দেখে তার চক্ষুরুন্মীলন হল। বারবধূ নিত্যগোপীর ঘরে মহেন্দ্র দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল থেকে একশখানি লাল মোটা কম্বল সরিয়ে রেখেছে। জনশোষণে তাহলে মহেন্দ্র তার চেয়েও হীন অনাচারে লিপ্ত! কিন্তু নির্বোধ জনমতকে কৌশলে সে আয়ত্ত করেছে বলেই শোষণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। মামুদ খাঁর মনে হল, মহেন্দ্রদেরও কপাল একদিন ফাটবে। সেদিনের প্রত্যাশায় আজকের অপমানিত পরাজয়ের দুঃখ সে অনায়াসেই ভুলতে পারল। এ গল্পে শুধু মামুদ খাঁর মানস-পরিবর্তনই মুখ্য হয়ে ওঠে নি, অপ্রবুদ্ধ জনমতের স্বরূপ-নির্ণয়েও লেখকের বক্রোক্তি শানিত হয়েছে।

'দাঙ্গা'য় মনস্তত্ত্বই মুখ্য। আদমপুর আর ধুলেশ্বর দুই গ্রাম। মাঝখানে শিশেখালের ওপরে বাঁশের সাঁকো দিয়ে দুই গ্রামের যোগসূত্র। এই সাঁকোর ওপরে দুই গ্রামের ছেলে আর মেয়ের সাক্ষাৎ। গফুরালির ছেলে জিন্নাত আর মকবুলের মেয়ে মমিনা। দুই গ্রামের বিরোধে এরাই মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারত, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। দুই গ্রামে বাঁধল দাঙ্গা। মকবুলের দলের কাছে গফুরালির দল গেল হেরে। জিন্নাত হল বন্দী। হাতে-পায়ে-কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লকড়ি-ঘরে। শুকনো হোগলার ওপর। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি গেল মমিনা তার কাছে। পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলে সে। দুজনেই পালিয়ে গিয়ে ভিন গাঁয়ে কাজির দরবারে কাবিননামা রেজেষ্ট্রি করে আসবে। তাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে দুপক্ষের। সম্মত হল জিন্নাত। বন্ধন মুক্ত হল তার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আদিম কামনাকে ছাপিয়ে উঠল তার গোষ্ঠী-চেতনা। সে না মরদের বাচ্চা? বিপক্ষের একটা মেয়ের প্রলোভনে সে তার দলগত সম্ভ্রমকে কিছুতেই পরাজিত হতে দেবে না। পালিয়ে গেল জিন্নাত। জীবনের নাট্যশিখরে

মনের আকস্মিক দিক্‌পরিবর্তনেই এখানে গল্পের চিত্তচমৎকার পরিণাম রচিত হয়েছে।

'নুরবানু' গল্পের আলম্বন মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা। বর্গাচাষী কুরমান আর তার স্ত্রী নুরবানু। সংসার চলে না বলে নুরবানুকে খাটতে হয় মুনিব-বাড়িতে। সেখানে মুনিব উকিলদ্দি দফাদারের কুনজরে পড়ে সে। এই নিয়ে স্বামীর মনে সন্দেহ আর ভুল-বোঝাবুঝি। এবং তারই পরিণতিতে এক উত্তেজিত মুহূর্তে সে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসল। পরমুহূর্তেই এল অনুশোচনা। কিন্তু সামাজিক প্রথায় তালাক-দেওয়া স্ত্রীকে নিয়ে আর ঘর করা চলে না। একটি মাত্র উপায় আছে। কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবে ফের কুরমান তাকে নিকে করতে পারে। উকিলদ্দি সে সুযোগ গ্রহণ করল এবং তালাক দেবার পুর্বে একরাত্রি সহবাসের সামাজিক দাবি জানাল। নিরুপায় নুরবানুর আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া-উপায় নেই। কুরমান কিন্তু বুঝল না যে, কার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি-বশেই পর-পুরুষের কাছে নুরবানুর এই বাধ্যতামূলক দেহদান। তার কাছে পাতিব্রত্যের চেয়ে দৈহিক সতীত্বই হল বড়। আর সেখানেই এল দাম্পত্য-জীবনের চরম ট্রাজেডি।

কিন্তু 'মাটি' ও 'জমি' গল্পে চেতনার শিকড় তলিয়ে গেছে একেবারে আসক্তির গভীরতায়। কৃষাণ আর কৃষাণবধূ। মাটির মানুষ তারা। মাটির দৌলতেই তাদের সুখদুঃখ। মাটির প্রতি আকর্ষণ তাই তাদের সর্বজয়ী। সম্পন্ন চাষী আমানতের সত্তর বিঘে জমি ছিল। কিন্তু উচ্চশিক্ষাভিলাষী একমাত্র পুত্র আজিজের পড়ার খরচ যোগাতে সে হল সর্বস্বান্ত। তা হোক্, তবু পুত্রের কাছে তার একমাত্র আশা, বিয়ে করে তাকে ছেলে এনে দেবে একপাল। নাতিতে ঠাকুরদাতে মিলে আবার গড়ে তুলবে তার বাড়বাড়ন্ত ক্ষেতখামার। কিন্তু শিক্ষিত পুত্রের কাছে সে-আশা আর তার মিটল না। সদরে চাকরি পেয়ে ছেলে বাপকে নিয়ে গেল শহরে। বুড়ি বৌ এখনো আঁকড়ে আছে আমানতকে। কিন্তু নারীর চেয়েও মাটি অনেক বড়। স্ত্রী একপাল

ছেলে এনে দেয়, আর সেই ছেলের দলের সাহায্যে মাটির বুকে সোনা ফলে বলেই না স্ত্রীর মূল্য! তাই সন্তান-সৃজনে অসমর্থা বৃদ্ধা স্ত্রীর পাতিব্রত্য আমানতের কাছে অর্থহীন। ছেলে বাপকে সেলাইর কল কিনে দিলে। এখন আমানত আর চাষা নয়, খলিফা। কিন্তু 'যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের ওপর বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়—বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ; আর সেই সঙ্গে ভেসে আসে তার মাটির ডাক।'

তবু 'মাটি' গল্পে আমানতের জীবনে আসক্তির কান্নাটাই বড়, কিন্তু 'জমি' গল্পে কৃষাণবধূ আমিরন আত্মবিক্রয় করেও সেই আসক্তিকেই জয়যুক্ত করেছে। সোনামদ্দি জমি কিনেছিল হুকুমালির কাছ থেকে; কিন্তু সে জমির ওপর লোভ পড়ল জলিল মুন্সির। হুকুমালিকে কিছু টাকা দিয়ে নকল কাবালা করিয়ে জমির স্বত্ব নিয়ে মামলা বাধাল। কিন্তু জলিল মুন্সির তঞ্চকী মামলা বেফাঁস হয়ে গেল আদালতে। জোর করে জমি দখলের চেষ্টাও ব্যর্থ হল সোনামদ্দির স্ত্রী আমিরনের কঠোর প্রতিরোধে। তবু ধূর্ত জলিল মুন্সির কাছে হল তাদের পরাজয়। ভিটে-মাটি সব গেল, শিশুপুত্রের হাত ধরে গিয়ে দাঁড়াতে হল একেবারে পথের ওপর। শুধু তাই নয়, শেষটায় কি না আশ্রয় নিতে হল জলিল মুন্সিরই কাছে! জমিতে সোনামদ্দি হালিয়া খাটবে আর বাড়িতে আমিরন দাসী-বাঁদি হবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এখানেই শেষ হল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, জলিল মুন্সি আমিরনকে নিকা করেছে। আমিরনের কিন্তু আফশোস নেই। সোনামদ্দিকে তার জমি ফিরিয়ে দেবার শর্তে সে নিজেই জলিল মুন্সিকে নিকা করতে প্রস্তুত হয়েছে। হতবুদ্ধি সোনামদ্দিকে সে বলছে, 'আমার জন্যে মন খারাপ করোনা। আমার চেয়ে তোমার জমির দাম অনেক বেশি। আমি গেলে কি হয়? কিন্তু জমি তো তোমার ফিরে এল। তোমার জমির গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারল না। কৃষাণ-জীবনের আশা-আসক্তির এ এক নতুন দিক্, নতুন উপলব্ধি। অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ধ্যানাবিষ্ট স্বকীয়তা আছে, একেবারে মাটির স্তরে পৌছেও তার নিঃসংশয়

প্রমাণ পাওয়া গেল। তাঁর শিল্পদৃষ্টি জনজীবনের নিম্নতম স্তরকে শুধু স্পর্শই করে নি, তাকে নতুন আলোয় আলোকিতও করেছে।

আর শুধু দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, সৃষ্টিকর্মেও অচিন্ত্যকুমার অনন্যপরতন্ত্র। তাঁর শিল্পসাধনার আদিতেই কল্লোল-যুগের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল 'শুধু ভাবের দেউলে নয়; ভাষারও নাটমন্দিরে।' সে বিদ্রোহ 'শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়। রীতি ও পদ্ধতির প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও ভাবকে দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমন কি, বানানের সংস্করণ।' আর এ বিদ্রোহে অচিন্ত্যকুমার ছিলেন একেবারে পুরোভাগে। তাঁর 'বেদে' শুধু বিষয়-বস্তুতেই নয়, ভঙ্গি ও আঙ্গিকেও ছিল একেবারে অভিনব। নিত্যবর্তমান কালের প্রয়োগে রচনাশৈলীকে বেগবান করে তোলার কাজে 'বেদে' সে যুগের পথপ্রদর্শক। বাংলা গদ্যকে অলংকৃত করার শিল্পকর্মেও তাঁর কবিত্বশক্তি নিত্যজাগ্রৎ ছিল। অবশ্য তাঁর প্রথম যুগের রচনায় অলংকরণ-বাহুল্য সর্বদাই প্রশংসার্হ ছিল না, মধ্যে মধ্যে এদিক দিয়ে তাঁর অতিসচেতনতা চক্ষু-কর্ণের পীড়াদায়কও ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক রচনায় অচিন্ত্যকুমার বাংলা গদ্যের এমন একটি সহজ ও সরল রূপ আবিষ্কার করেছেন যে তা বাংলার নিরক্ষর চাষীর মুখেও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। পল্লীবাসীর কণ্ঠে ভাষা দিতে গিয়ে আঞ্চলিকতা বা তৎস্থানিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে গ্রাম্য উপভাষা-প্রয়োগ শিল্পীরা প্রায় অপরিহার্য বলেই মনে করেন। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার ভাষার একটি সর্ব-সাধারণ রূপ আবিষ্কার করে তাকে জনসাধারণের কণ্ঠে বসিয়েছেন। হয়ত তাতে ভাগীরথী-তীরবর্তী বাগ্‌ভঙ্গির বিশুদ্ধতা সর্বদা রক্ষিত হয়নি, কিন্তু তা যে বাংলা সাহিত্যকথার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বঙ্গবাসী কলেজ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

জগদীশ ভট্টাচার্য

দুইবার রাজা

বাজে-পোড়া ঠুঁটো তালগাছটা উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে, যেন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশকে ঠাট্টা করছে। অথচ ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ।

বুকের মধ্যে যেন একটা হাপর আছে, উঁচু তাকিয়াটায় ঘাড় গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে অমর হাঁপানির টান টানছে। ডাক্তার খানিকটা ন্যাকড়ায় কি একটা ঝাঁঝালো ওষুধ ঢেলে দিয়ে বলে গিয়েছিল শুঁকতে। তাতে টান কমা দূরে থাক, রগ দুটো বাগ না মেনে একসঙ্গে টনটন করে উঠেছে। বন্ধু সরোজ কতগুলি দড়ি পাকিয়ে মাথার চারপাশটা সজোরে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। এখন ভীষণ লাগছে তাতে। কিন্তু দড়িগুলি খুলে ফেলতে পর্যন্ত জোরে কুলোয় না।

বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা ঝিমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে ইচ্ছে করছে না—পরিক্লান্ত ঘুমন্ত করুণ মুখখানি!

প্যাঁকাটির মতো লিকলিকে দেহ,—একটা টিকটিকি যেন। এই একটুখানি টিঁকে থাকার বিরুদ্ধে সমস্তটা দেহ ষড়যন্ত্র করছে! তার কী আর্তনাদ! যেন একটা ভূমিকম্প বা বন্যা!

মার বিষাদস্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে অমরের মনে পড়ল, হঠাৎ কবে কার মুখে গান শুনেছিল—'জানি গো দিন যাবে, এদিন যাবে'; শেলিও এ কথা বিশ্বাস করে সমুদ্রে ডুব দিয়েছিল—তারপর একশ বছর এক এক করে খসেছে। দিন আর এল না। বসন্ত যদি এলই,—মহামারী নিয়ে এল, নিয়ে এল চৈত্রের চোখ ভরে রৌদ্রের রোদন।

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'—। সেদিনো পল্লবমর্মরে কোটি কোটি ক্রন্দন অনুরণিত হবে। প্লেটোও তো কত আগে স্বপ্ন দেখেছিল, বার্নাড শ'ও দেখেছে। 'সে কবে গো কবে ?'

অমরের হঠাৎ ইচ্ছে করল একটা কবিতা লিখতে—সমস্ত বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে। ভুয়ো ভগবান আর ভুয়ো ভালবাসা। যেমন ভুয়ো ভূত !—মনে পড়ে বায়রন, মনে পড়ে শোপেনহাওয়ার।

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অমর বেরিয়ে এল, উঠোনে। সেই ঠুঁটো তালগাছটার গুঁড়ি ধরে হাঁপাতে লাগল। দুজনে যেন মিতা ; একসঙ্গে আকাশের তারাকে মুখ ভেঙচে ভয় দেখাচ্ছে।

সমস্ত আকাশে কিন্তু নিস্তরঙ্গ ঔদাসীন্য।

ঝড়ের পর যেমন অরণ্য।—টানটা পড়েছে।

মা বললেন—নাই বা গেলি কলেজে আজ। একটা ছাতাও তো নেই। যে রোদ—

অমর বললে—হাজিরা থাকবে না। তা ছাড়া মাইনে না দেওয়ার দরুন কি দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা দেখে আসি।

অবস্থা আর এর বেশি কি সঙীন হবে ? দুমাসের মাইনে দেবার শেষ তারিখ উতরে গেছে দেখে নাম লাল কালিতে কেটে দিয়েছে।

সরোজ বললে—তুমি ফ্রি না ?

দু হাত দিয়ে বুকের ঘাম মুছে অমর বললে—তা হলে সুপারিশ লাগে,—ঐ যে মোড়ের তেতলা বাড়ির বারান্দায় বসে যিনি মোটা চুরুট টানেন তাঁর। তিনি আর প্রিন্সিপ্যাল তো আমার মার এই ছেঁড়া কাপড়, বন্ধক দেওয়া দু-খানি সোনার বালা, এই ঝুল-ঝোলা নোংরা দাঁত-বের-করা খোলার ঘরটা দেখতে আসেন নি। আরজি একটা করেছিলাম বটে, সুপারিশ ছিল না বলে বাতিল হয়ে গেল। সোজা হয়ে আজো যেন দারিদ্র্য তার সত্য পরিচয় দিতে শেখে নি। আর মহীন্‌কে চেন তো ?—বাইকে যে আসে—ফ্রি। বাড়ি থেকে মাইনে

বাবদ যা টাকা আসে, তা দিয়ে ‘পিকাডিলি’ টিন কেনে, সেলুনে বসে দাড়ি কামায়।

মা হতাশ হয়ে বললে—উপায় কি হবে তবে ?

যেন হঠাৎ একটা বাড়ির ভিত খসে গেল ; কাদায় বসে গেল চলন্ত গাড়ির চাকা !

অমর বললে—ভিজিট পাবে না জেনে ডাক্তার যখন ন্যাকড়ায় ভোঁটকা-গন্ধওলা খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো কি ফেলে বলে গিয়েছিল এ রোগে কেউ মরে না, তখন আশ্বস্ত হয়ে আমাকে তোমার বুকে নিয়ে কি বলেছিলে ? বলেছিলে—ঠাকুর তোকে বাঁচিয়ে রাখুন, এইটুকুই শুধু চাই। বেশ তো আবার কি ! কাল যদি ফের টান ওঠে, তোমার এ ভূতুড়ে হাতুড়ে ডাক্তার না ডাকলেও বেঁচে উঠব।

পরে ঢোঁক গিলে ফের বললে—তোমার সেই ঠাকুর উড়ে ঠাকুরদের মতোই বাজে রাঁধুনে, মা। হয় খালি ঝাল, নয় খালি নুন। পরিবেশন করতে পর্যন্ত ভালো শেখে নি।

জামাটা খুলে ফেললে। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুক, কঞ্চির মতো হাত-পা, পিঠটা কুঁজো, মাথার চুলে চিরুনি পড়ে না,—তবু মনে হয় যেন একটা উদ্ধত তর্জনী।

মা পাখা করে ঘামটা মেরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যেমন করে পুরুত তার নারায়ণ-শিলা গঙ্গাজলে ধোয় ;—ততখানি যত্নে।

সরোজ বললে—তা কি হয় ? সামান্য কটা টাকার জন্য কেরিয়ার মাটি করার কোন মানে নেই। আমি দেব টাকা, মাইনে দিয়ে দিয়ো ফাইনসুদ্ধু।

মার বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে অমর বললে—কিছু লাভ নেই তাতে। তা ছাড়া পার্সেণ্টেজও নেই। হপ্তায় দু বার করে টান ওঠে। বানান ভুল নিয়ে ঘোষমাস্টারের সঙ্গে তর্ক করা অবধি প্রক্সিও চলে না আর, খালি আমাকে জব্দ করার চেষ্টা। ‘গোস্ট’কে যদি অনবরত ‘ঘোস্ট’ বলে চলে একঘণ্টা ধরে,—তা আর যার সহ্য হোক, আমার হয় না, ভাই। বিনয়সহকারে প্রতিবাদ করলাম, মাস্টার তো রেগেই লাল !,

প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে নালিশ—আমি নাকি অপমান করেছি। আমি বললাম—'উনি 'গোস্ট'কে বলেন 'ঘোস্ট', 'পিয়ার্স'কে বলেন 'পায়ার্স' —তাই শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উচ্চারণগুলি কি ঠিক?

সরোজ বললে—প্রিন্সিপ্যাল কি বললেন?

—বললেন, প্রোফেসার তোমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। তাঁকে করেক্ট করবার তোমার রাইট নেই। ফের এমন বেয়াদবি কর তো ফাইন করব। অদ্ভুত! তা ছাড়া, আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, সরোজ।

একটু থেমে বললে—আমি কী বিরক্ত হয়ে যে গেছি, তুমি তা ভাবতেও পারবে না। আমাদের যিনি পয়েট্রি পড়ান, তিনি আবার উকিল। চাপকান পরে ছুটতে ছুটতে হাজির, এক গাদা পানে মুখটা ঠাসা,—কীটসের 'নাইটিঙ্গ্‌ল্‌' পড়াবেন। ডাক্তার যেমন ছুরি দিয়ে মড়া কাটে ভাই, তেমনি করে কবিতাটা দলে পিষে দুমড়ে চটকে একেবারে কাদাচিংড়ি করে ছাড়লেন। ওঁর ব্যাখ্যা শুনে এত ব্যথা লাগল যে, মনে হল বেচারা কীটস যদি ছাত্র হয়ে শুনত ওঁর পড়া, তো বেঞ্চিতে কপাল ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করত। কী সে চেঁচানি, পানের ছিবড়ে ছিটকে পড়ছে,—ভয়ে নাইটিঙ্গেলের প্রাণ থ হয়ে গেছে। 'রুথ' এর কথা যেখানে আছে, সেখানটায় এসে ওঁর কী বিপুল হাত ছোঁড়া— ও জায়গাটা মুখস্থ করে এসেছিল নিশ্চয়ই। 'রুথ'-এর গল্প কি, বাইবেলের সঙ্গে কোথায় তার অমিল এই নিয়ে তুমুল তর্ক, তুমুল আস্ফালন। 'খুব সোজা' বলে বই মুড়ে কৌটোর থেকে গোটা চার পান মুখে পুরে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন আলপাকার পাল তুলে। বোধ হয় অনেক দিন বাদে একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলেন।—তখনো ভালো ছাত্রেরা বইয়ের ধারে মাস্টারের শব্দার্থ টুকে রাখছে ও পরস্পরে রুথের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পরামর্শ করছে। ভাই সরোজ, আর জ্যোৎস্না-রাতে কীটস্‌ পড়া চলবে না কোনোদিন।

পরে মাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে—তুমি ভাবছ মা যে তোমার ছেলে বি-এ পাশ করতে পারল না বলেই বয়ে গেল? নয় মা নয়। জান?—যারা খুব বড় হয়েছে তাদের শব্দের অর্থ জানতে মাত্র

গয়না বন্ধক দিয়ে কলেজে পড়তে আসতে হয়-নি। এ দিন যাবে, এ কথা তো তুমিই বেশি বিশ্বাস কর। দিন যাবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি তার পর কালো ঝড়ো রাত্রিই আসে, তাতেও ভড়কাবার কিছু নেই। আমাকে জন্ম থেকে এমন পঙ্গু পক্ষাহত করে বানিয়েছেন বলে জবাবদিহি দিতে হবে বিধাতাকেই।

মা মিছরির জল ছেঁকে দুই কাঁচের গ্লাসে করে দুই বন্ধুকে ভাগ করে দিলেন। বললেন—আর একটা গয়নাও তো নেই—

—খবরদার, মা। আমার কলেজে পড়া এইখেনে খতম। আমি এই ফাটা ফুসফুস নিয়েই লড়ব। তুমি আমার মা, আর ঐ তালগাছটা আমার ছেলেবেলার বন্ধু—কতকালের চেনা।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কি করবে তা হলে এখন?

—কবিতা লিখব। তুমি হেসো না, সরোজ। কথাটা ভারি বেতালা শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু আমি সত্যিই লিখব এবার। আমার সমস্ত প্রাণ চেঁচিয়ে উঠতে চাইছে।

সরোজ হেসে বললে—তা হলে আর কবিতা হবে না।

—না হোক। সোজা সত্য কথা বুক ঠুকে আমি খুলে বলে দিতে চাই। সৌন্দর্যের আবরণ দিয়ে কুৎসিত নগ্নতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই না তোমরা ভগবান বানিয়েছ। যে কথা বায়রন, সুইন্‌বার্ন বা হুইটম্যান পর্যন্ত ভাবতে পারে নি—

—তেমন আবার কি কথা আছে?

—দেখো। যে কথা ভেবেছিল খালি চ্যাটার্‌টন।

সরোজ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সহসা পাংশু হয়ে বললে—খবরদার, অমর! ও রকম মারাত্মক ঠাট্টা কোরো না।

অমর উদাসীনের মতো বললে—মারাত্মক ঠাট্টাই বটে। জান, বিধাতা যদি তোমাদের প্রকাণ্ড কবি হন, তো এই পৃথিবীটা তাঁর প্রকাণ্ড ছন্দপতন।

কিন্তু না, সত্যি সত্যিই সে রাতে অমর কালি কলম আর কাগজ নিয়ে বসল কবিতা লিখতে। মেটে মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে

মা ঘুমিয়ে পড়েছে, ম্লান বাতির আলোয় সেই মুখখানির যেন তুলনা নেই। ঐ মার মুখখানি নিয়েই একটা কবিতা লেখা যায় হয়তো!

সলতে ধীরে ধীরে পুড়ে যাচ্ছে,—কিন্তু একটা লাইনো কলমের মুখে উঁকি মারছে না। 'বিট'-এর পুলিশ খানিক আগে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে' জুতোর ভারী শব্দ করে চলে গেছে। আবার সেই নিঃশব্দতা,—প্রকাশ করতে না পারার ব্যথার মতোই অপরিমেয়।

অমরের মনে হল, ভাষা ভারি দুর্ব্বল, খালি ভেঙে পড়ে। লিখতে চাইছিল—এই জীর্ণ পৃথিবী, এই দানবী সভ্যতা,—সব কিছুই প্রকাণ্ড ভুল বিধাতার,—এঁচড়েপাকা ছেলের ছ্যাবলামি। এঞ্জিন-ড্রাইভার যেমন ভুল পথে গাড়ি চালিয়ে হায় হায় করে ওঠে,—তেমনি অকারণে ভুল করে খেলাচ্ছলে এই পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলে ভগবান তারায় তারায় চীৎকার করে উঠেছেন,—অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

এত বড় যে ব্যবসাদার,—সেও দেউলে হল বলে। কবে লালবাতি জ্বলবে,—প্রলয়ের! তারই কবিতা।

লেখা যায় না। খালি সলতেটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হলে দীপ নিবে যায়।

বিকেলের দিকে অমর সরোজের বাড়ি গেল। পাশেই বাড়ি,—লাগাও টিনের ঘরে একটা গাড়ি পর্যন্ত আছে।

শ্বেতপাথরের মেঝে,—দুটো দেয়াল প্রায় বইয়ে ভরা,—ছবি খান তিন চার, শেক্সপীয়র, শেলি আর বার্নাড শ'র। একটা চেয়ারের ওপর বই গাদা করা,—মেঝেতে কাত হয়ে শুয়ে সরোজ এক্‌জামিনের পড়া পড়ছে। আর ঘরের এক কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে তার বোন চায়ের জল গরম করছে আর দাদাকে বকছে সিগারেট খায় বলে।

অমরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মেয়েটি আরো খানিকটা জল কেটলিতে ঢেলে দিয়ে বললে—যাই বল দাদা, বোহিমিয়াটা আর যাই হোক, আমাদের বহরমপুরের মতোই খানিকটা। নইলে—

সরোজ উঠে পড়ে বললে—এস অমর, বসো। তুই লক্ষ্মী দিদি, পরোটা ভেজে দিবি আমাদের? দেখ না চট করে—

বোন চলে গেলে সরোজ তাড়াতাড়ি দরজার পরদাটা টেনে দিয়ে শুধোল—এমনিই কি এসেছ, না কোনো কাজ আছে ?

অমর সোজা হয়ে বললে—আমাকে কয়েকটা টাকা দাও,—এই গোটা কুড়ি।

সরোজ হাতের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—লুসাই, লুসাই, ও লুসী।

বোন দুহাতে ময়দার ড্যালাটা নিয়ে এসে পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে বল্লে—কি হুকুম মশাইয়ের ?

সরোজ বললে—চাবিটা দিয়ে দেরাজ থেকে কুড়িটে টাকা বার করে দে তো শিগগির।

ঘরে ঢুকে ময়দা চটকাতে-চটকাতে লুসী বল্লে—কিসের জন্যে শুনি ?

—উড়োতে। তুই দে খুলে। ফফড়দালালি করিস নে।

দেরাজ খুলতে খুলতে লুসী বললে—দাঁড়াও না। দিচ্ছি এবার। ঠিক মতো হিসাব দিতে না পারলে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কে চা করে দেয়, দেখব।

বলে চলে গেল। পর্দাটা খানিক দুলে স্থির হল।

টাকা দিয়ে সরোজ বললে—যদি আবার বিপদে পড় বলতে সঙ্কোচ কোরো না।—

চা খেতে-খেতে অমর ভাবছিল সংসারে এ একটা কি চমৎকার ব্যাপার! উজ্জ্বল স্বাস্থ্য,—স্বচ্ছল অবস্থা,—কল্যাণী বোন! নাম তার লুসী!

পেছন থেকে কে অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলছিল—একটা নতুন কাগজ বেরিয়েছে, যদি নেন—

সরোজ মুখ ফিরিয়ে দেখলে—অমর। খালি পা, যে ন্যাকড়া দিয়ে কালি-পড়া লণ্ঠন মোছে তেমনি কাপড় পরনে,—হাঁপানির টানে ঝরঝরে পাঁজর দুটো ঝেঁকে উঠছে,—কথা কইতে পারছে না।

সরোজ তক্ষুনিই কাগজটা নিয়ে দাম দিল, কথা কইল না কোনো। বরঞ্চ ভারি লজ্জা করতে লাগল ওরই।

ট্রাম চলল। চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে অমর পা পিছলে পড়ে যেতেই সবাই রোল করে উঠল। হাঁটুটা চেপে ধরে 'কিছু-না' বলে অমর কাগজের বাণ্ডিলটা নিয়ে কাশতে লাগল। পরে ভিড়ের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। সরোজ নেমে আর খোঁজ পেলে না তার।

ফুসফুসটা যেন কে চুষে শুষে ফেলেছে।

অমর একটা গাছতলায় দুটো হাত মাটিতে চেপে টান হয়ে বসে আকাশের বাতাস নেবার জন্যে গলাটা উঁচু করে ধরেছে। কে যেন ওর টুঁটিটা টিপছে, ভিজা গামছার মতো ফুস্‌ফুসটা চিপে ফেলছে।

কাগজের বাণ্ডিলটার ওপর মাথা রেখে শুতে যেতে দেখে— পাশাপাশি দুটো বিজ্ঞাপন। একটা এক ছাত্র পড়াবার জন্যে, আরেকটা কোন্ অরক্ষণীয়া পাত্রীর জন্যে পাত্র চাই—যেমন-কে-তেমন হলেই চলে—ঠিক এই কথা লেখা আছে।

টানটা যদি একটু পড়ে বিকেলের দিকে,—অমর ভাবছিল,—তবে কোথায় গিয়ে আগে আরজি পেশ করবে? টিউশানির খোঁজে, না পাত্রীর?

আগে ভাবত—একমুঠো ভাত, একখানি কুঁড়ে ঘর, আর একটি নারী। এখন মনে পড়ছে আরো কত কথা। হাঁপানিতে ভুগবে না, ঝড়ে কুঁড়ের চাল উড়ে যাবে না, ভাতে রোগের বীজ থাকবে না, নারীর ঠোঁটে কালকূট থাকবে না। এত! তবে।—

ক্লান্ত কাক ককায়, আর ককায় ও কাশে মাটির ওপর মায়ের ছেলে।

পাঁজরা দুটো খানিক জিরোলে তারপর কষ্টে পথ চলে। চলতে চলতে প্রথম ঠিকানাটাতেই ঠিক করে এল—যেখানে মাস্টার চায়।

বাড়ির কর্তা ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে শুধোলেন— কদ্দুর পড়া হয়েছে?

অমর বললে—বি-এ পড়ছি।

—কালকে আই-এর সার্টিফিকেটটা নিয়ে এস দেখা যাবে।

একদিন খুব জোরে হাঁপানি উঠলে মা রাগ করে অমরের গলার সবগুলি মাদুলি ছিঁড়ে ফেলেছিল, আর অমর রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিল—ম্যাট্রিক আর আই-এর সার্টিফিকেট দুটো।

মাদুলিগুলির মধ্যে একটা সোনার ছিল বলে মা তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে বাক্সে রেখে দিয়েছিল, অমরও ভালো হয়ে এক সময়ে সার্টিফিকেট দুটোর ছেঁড়া খণ্ডগুলি কুড়িয়ে রেখে দিয়েছিল একটা চৌকো লেফাফায়। আঠা দিয়ে সেই সার্টিফিকেট আজ জোড়া দিতে বসল।

কর্তা বহুক্ষণ সার্টিফিকেটটা নেড়ে চেড়ে দেখে জাল নয় প্রতিপন্ন করে বললেন—কিসে ছিঁড়ল?

—একটা ছোট্ট দুষ্টু বোন আছে,—নাম লুসাই—দুষ্টুমি করে ছিঁড়ে ফেলেছে।

কর্তা ঘাড়টা বার চারেক দুলিয়ে বললেন—আচ্ছা বাপু, বানান কর তো থাইসিস্।

পরে বললেন—বেশ। বল তো ডেনমার্কের রাজধানীর নাম কি? আকবর কত সালে জন্মেছিল? এখান থেকে কি করে ডিব্রুগড় যেতে হয়?

অমর বললে—আমি তো পড়াব ইংরিজি আর অঙ্ক। আমাকে এ সব প্রশ্ন কেন করছেন?

কর্তা খাপ্পা হয়ে বললেন—আজকালকার ছেলেগুলো দু-পাতা মুখস্থ করেই পাশ মারে। আমাদের সময় আমরা কত বেশি জানতাম।

কর্তার ছেলে পাশেই ছিল। একটু বেয়াড়া রকমের। বললে—যা যা জানতে তাই বুঝি জিজ্ঞেস করছ, বাবা? মাস্টারদের যে প্রশ্নটা ভালো করে জানা থাকে, সেইটেই পরীক্ষায় দেয়, আমি বরাবর দেখছি! যেন কাগজ দেখবার সময় অসুবিধায় পড়তে না হয়।

বাপ একটু দমে গিয়ে বললেন—আচ্ছা, একটা ইংরিজি রচনা লেখ তো,—দেখি তোমার ইংরিজির কত দৌড়। একটা কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আয় তো, টুনু।

অমর বললে—কি লিখব? ক পাতা?

কর্তা বললেন—লেখ, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তি। এক শ শব্দের বেশি নয়। এ রকমই আসে পরীক্ষায়।

টুনু একটু হেসে বললে—বাবা, ষোলো 'থিয়োরেম' থেকে একটা 'এক্সট্রা' দাও না কষতে।

বাপ চটে বললেন—যা, ও সব কি দেব? দেব মানসাঙ্ক।

টুনু জোরে হেসে বললে—ওটা বুঝি তুমি জান। না?

কর্তা রচনার কি বুঝলেন, তিনিই জানেন,—তবে দেখলেন হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। বললেন—বেশ তবে কি জান, ইতিমধ্যে একজন বহাল হয়ে গেছে। নইলে তোমাকে নিতুম।

টুনু অস্ফুটস্বরে বললে,—কিন্তু বাবা, ইনি ভালো, এঁকে আমার—

অমর শুধু বলতে পারলে—এ সব কেন লেখালেন তবে?

কর্তা বললেন—লেখা তো তোমাদের অভ্যেস হয়েইই আছে। কালে তো জীবনের পেশাই হবে। বরঞ্চ সাবেক কালের এণ্ট্রান্স পাশ করা বুড়োর কাছে একটা রচনা দেখিয়ে নিয়ে তোমার লাভই হল। একটু প্র্যাকটিস হল লেখার। তা ছাড়া রচনার 'সাবজেক্ট'টা তো খুবই ভাল, —কি বল? জান হে বাপু, সে-কালের এণ্ট্রান্স তোমাদের এ-কালের পাঁচটা এম-এর সমান,—সেটি মনে রেখো।

অমর বললে এবার—উনি কততে পড়াবেন?

—পনেরো টাকা।

—আমাকে দশটা টাকা দেবেন না হয়। দরকার হয় দু বেলা এসেই পড়াব দু ঘণ্টা করে।

টুনু বললে—হ্যাঁ বাবা, এঁকেই—

কর্তা বললেন—বেশ, আসবে কাল। আর শোন, এ ফোর্থ ক্লাশে পড়লে কি হবে, এদের ইংরিজিটা বেশ একটু দাঁত-কামড়ানো। বাড়ি

থেকে একটু পড়ে আসবে রোজ। আর আমি কাল সকালবেলাই একটা রুটিন করে রাখব,—কবে আর কখন কি পড়াতে হবে। বুঝলে ? একটু ঝিমিয়ো কম।

রোজ শেষ রাত্রেই টানটা ঠেলে আসে। তাই নিয়েই অমর বেরিয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি, পাছে আগের ঠিক করা মাস্টার চেয়ার বেদখল করে নেয়,—দশ টাকা থেকে ন টাকা বারো আনায় নেমে।

কেওড়া-কাঠের একটা থুথুরো তক্তপোশ,—ওপরে একটা চাটাই পর্যন্ত নেই। ফাঁকে ফাঁকে ছারপোকাদের বৈঠকখানা বসেছে।

কর্তা একটা জল-চৌকি টেনে নিয়ে কাছে বসে বললেন—এই রুটিন করে দিয়েছি, দেখে নাও। ঐ চারঘণ্টা করেই রইল, —সকালে দুই, বিকেলে দুই। নইলে তো সেই মাস্টারকেই রাখতাম,—দিব্যি চেহারা, দেখলেই মনে হয় ছেলে মানুষ করতে পারবে। এম্-এ পাশ।

পরে বিড়বিড় করে বললেন—এখুনিই এসে পড়বে হয়তো। একটা ভাঁওতা মেরে দিতে হবে।

দরজা ঠেলে ভেতরে যে এল,—অমর তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল,—মহীন্। বোধ হয় বেচারা অনেকদিন আউটরাম ঘাটে গিয়ে চা খেতে পারে নি, তাই বুঝি এ চাকরিটা বাগাতে চেয়েছিল।

অমর প্রশ্ন করলে—তুই কবে এম-এ পাশ করলি, মহীন ?

মহীন্ সিল্কের রুমাল বার করে ঘাড়ের ঘাম মুছে বললে—তুই পাশ করিস নি নিশ্চয়। পনেরো তা হলে আর জোটে নি। 'থাইসিস্' বানান পেরেছিলি তো ?

বলেই বাইক করে ছুট দিলে।

কর্তা বললেন—দেখলে কাণ্ডটা। ভাঁড়িয়ে জোচ্চুরি করে ঠকাতে এসেছিল,—ভাগ্যিস রাখিনি। পরে চৌকিটা আরো একটু কাছে টেনে বললেন—পড়াও তো বাপু শুনি।

ছেলে বললে—তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে নাকি, বাবা ?

কর্তা বললেন—দেখি না কেমন পড়ায়,—মানেগুলো সব ঠিক বলতে পারে কি না। হ্যাঁ, আরম্ভ করে দাও,—

অমর বললে—কি ভাবে আরম্ভ করব, তাও যদি বলে দেন।

কর্তা ঘাড় চুলকে বললেন—তা হলে আর তোমাকে মাস্টার রেখেছি কেন।

—কি হলে আপনার মনোমত হবে, তাও তো একান্ত জানা দরকার দেখছি। নইলে—

ছেলে রেগে বললে—আজ কিছুতেই পড়ব না বাবা, তুমি এরকম করলে। তুমি যাও চলে।

তৃতীয় পক্ষের ছেলে। বাপ জলচৌকিটা নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়া মাত্রই ছেলে উঠে দরজায় খিল এঁটে একটা বালি-কাগজের ছেঁড়া খাতা বার করে বললে—একটা কবিতা লিখেছি, মাস্টার মশাই। শুনবেন? একটা হাঁস দুই সাদা ডানা মেলে জলে ভাসছিল,—কতগুলি পাজি ছেলে তাকে ধরে কেটেকুটে কাটলেট বানাচ্ছে—

সুকুমার ছেলে—দুটি কালো চোখে সুগভীর সুদূর কৌতূহল, যেন দুটি মণির প্রদীপ জেলে অন্ধকারে কি অনুসন্ধান করছে।

অমর শুধু বললে—এখন ও সব থাক। এবার পড়ি এসো।

ছেলে অবাক হয়ে বললে—কেন বলুন তো,—বাবা কবিতার নাম শুনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খড়ম নিয়ে তেড়ে আসেন, মা পড়ে পড়ে কাঁদেন,—আর আপনিও কবিতা ভালোবাসেন না? তবে আমাদের বইয়ে এত কবিতা লেখা কেন? শুনেছি, আমাদের দেশে এক প্রকাণ্ড কবি আছেন, তিনি নাকি ছেলেবেলায় আমার মতো ইস্কুল পালাতেন। আমার ইস্কুল একটুও ভালো লাগে না,—যেন খানিকটা কুইনিন।

গায়ে খাকি রঙের শার্ট, পরনে ফিনফিনে কাপড়, কুচকুচে কালো পাড়,—খালি পা,—চোখের পাতার ওপরে বড় একটা তিল।

অমর জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি, ভাই?

—কিশলয়। বড়দি রেখেছিল। বড়দিই তো আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছিল। ওর মরার পর আমি একটা লিখেও

ছিলাম,—দেখবেন সেটা? উনি দেখে গেলে কত সুখী হতেন যে, অন্ত নেই।

—তুমি কি আজ পড়বে না?

—রোজই তো পড়ি।—দেখুন, ছেলেবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম,—তারার বিষয়, ইংরিজিতে, আমার ভালো লাগে নি। তারাকে আমার কি মনে হয়, জানেন? যেন কারা অনেকগুলি বাতি জ্বালিয়ে নীচের মানুষদের খুঁজছে, যারা বড়দির মতো কেঁদে কেঁদে মরে গেল। আমার এক এক সময় মনে হয় ঐ বড় তারাটা যেন বড়দি। এখান থেকে একজন যায়, আর আকাশে একটি করে বাড়ে। আমি ঐ তারাটাকে নিয়ে কতদিন একটা কবিতা লিখব ভাবছি, পারি না। হয় না।

অমর অঙ্কের খাতাটা মুড়ে রেখে বললে—নিয়ে এসো তো ভাই তোমার কবিতার খাতাটি।

পুরো মাস গুজরানো হয় নি,—দিন বারো পড়ানো হয়েছে মাত্র। পয়লা তারিখ অমর হাত পাতলে মাইনের জন্য।

কর্তা বললেন—সাত তারিখের আগে হবে না।

হতে হতে সতেরো তারিখে এসে ঠেকল।

অমর অবাক হয়ে বললে—বারো দিনের মাইনে এই তিন টাকা সাড়ে তিন আনা?

কর্তা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কেন হিসেবের এক চুলও ভুল বার করতে পারবে না। নিয়ে এসো তো কাগজ, একটা রুল অফ থ্রি কষে ফেল। দুদিন আস নি,—তা ছাড়া এক দিন সাত মিনিট আর দুদিন সাড়ে চার মিনিট লেট করে এসেছিলে—

অমরের ইচ্ছা হল মারে ছুঁড়ে টাকা তিনটা। কিন্তু মার পরনের কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—পুরোনো বইয়ের দোকানে সস্তায় একটা খুব ভালো বই দেখেছিল, যাবার সময় সেটাও কিনে নিয়ে যেতে পারে।

সকাল বেলাতেই হাঁপানি উঠেছিল সেদিন। তবুও কুঁজো হয়ে ঢিকোতে ঢিকোতে পড়াতে চলল। কিশলয় বললে—আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে? বুকে হাত বুলিয়ে দেব?

—দাও।

কতগুলি বই গাদা করে তার ওপর মাথাটা রেখে অমর শোয় আর কিশলয় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গল্প শোনে—

শেলিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বায়রনকে দেশ থেকে। ন্যুট হামসুন ট্রাম-কণ্ডাক্টারি করত। ডস্টয়ভস্কিকে ফাঁসিকাঠে তুলে নামিয়ে দিয়েছিল,—গোর্কি থাকত উপোস করে—মুসোলিনি ভিক্ষা করত পোলের তলায় বসে—

কিশলয় উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে বুকের আরো অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

অমর ঐ সুকোমল সুচারু বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির পানে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা ভাবে,—হয়তো এর মধ্যে ভবিষ্যতের ঋষি-কবি তন্ময় হয়ে আছেন।

হঠাৎ দুজনে শিউরে আঁতকে উঠল—জানালায় কার পাকানো ঝাঁঝালো দুই চক্ষু দেখে।

কর্তা বন্ধ দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা মেরে বললেন—খোল্ দরজা শিগগির—

কিশলয় ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলে।

কর্তা এক ঝাঁকানিতে অমরের হাতটা টেনে শোয়া থেকে তুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন,—না পড়িয়ে শুয়ে শুয়ে উনি কবিতা শোনাচ্ছেন! গরচা পয়সা দেওয়া হয় কিসের জন্য শুনি? নবাবজাদার মতো তক্তপোশে গা ছড়িয়ে জিরোবার জন্য, নয়? যাও বেরিয়ে এক্ষুনি—

অমর বললে—তবে বাকি মাইনেটা দিয়ে দিন—

—মাইনে দেবে না আরো কিছু। যা বাকি ছিল, সমস্ত এই বেয়াদবির জন্য ফাইন,—কিচ্ছু পাবে না, যাও চলে।

দেনা টাকাটা দিয়ে নিশ্চয় আরেকবার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে।

পশলা বৃষ্টির পর ঘোলা আকাশে চাঁদ উঠেছে,—মরা, মিউনো—পথের পাঁককে ঠাট্টা করতে।

হাঁপানির টানে কাঁকড়ার মতো কুঁকড়ে অমর নিঃশ্বাসের জন্য ফুসফুসের কসরত করছিল।

চোখ বুজে খালি একটি ছবি আজও দেখছে—বিষণ্ণ অথচ একটি সুকোমল ছবি।

বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। অমর দেখতে গিয়েছিল। শেফালির মতো শাদা ধবধবে বিছানা,—তার ওপর এলিয়ে আছে ক্লান্ত তনুর কমনীয় কান্তি,—ভাটায় জলস্রোত যেন জিরোচ্ছে। চারপাশে রাশি রাশি ফুল স্তূপীকৃত হয়ে আছে,—বাতাস মন্থর হয়ে গেছে তাই। কারো মুখে একটি রা নেই, সবাইর মুখে নম্র বেদনা-শীতল একটি ছায়া,—সমস্ত গৃহে বিষাদপূর্ণ একটি মহাশান্তি। শিয়রের ধারে খান কয়েক বই,—আত্মীয়ের মতো শুব্ধ বেদনায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, আর কয়েকখানি পুরোনো চিঠি। নিষ্ঠুর ডাক্তার পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে আছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে।

শুধু পায়ের ওপর দুটি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো বসে আছে—যেন বিসর্জনের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।—মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

অমরের সেদিন মনে হয়েছিল,—মৃত্যুও একটা বিলাসিতা। মেয়েটির বুকের ব্যথাটি যেন এক অমূল্য বিত্ত। এ তো মরা নয়, মিশে যাওয়া। যেমন মিশে যায় ফলের গন্ধ বাতাসে,—যেমন গলে যায় সূর্যাস্তলালিমা অন্ধকারে।

সন্ধ্যায় টানটা ফের পড়লে অমর বালিশের তলা থেকে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি বার করে ঠিকানা ঠাহর করতে চলল।

মা প্রশ্ন করলেন—কোথায় যাচ্ছিস?

—পাত্রীর খোঁজে। তোমার কত দিনের ইচ্ছা। অপূর্ণ রাখা অনুচিত মনে হচ্ছে।

এক কালে অবস্থা ভালো ছিল ; বাড়ির চেহারা দেখলে বুঝা যায়। এখন একেবারে গঙ্গাযাত্রী বুড়ি।

এখনো পাত্র জোটে নি। অমরের যেন একটু আসান হল।

বহু কথা-বার্তার পর শ্যামাপদবাবু বললেন—ছেলেটি কি করেন ? কত চাহিদা ?

—বি-এ পড়ে। এত দিন যার গয়না বাঁধা দিয়ে চলছিল—আর চলে না। চাহিদা,—পড়া-খরচ দু বছর,—আর নগদ হাজার খানেক টাকা।

শ্যামাপদবাবু তাতেই স্বীকৃত ছিলেন। তার কারণ আছে,—দরাদরি করতে গিয়ে কেবলই দাঁও ফসকেছে। তা ছাড়া মেয়ের ইতিহাসও বড় ভালো নয় ; দেখতে তো নিতান্ত কুরূপাই,—এত কুৎসিত, যে, ঘাটের মড়ার পর্যন্ত নাকি দাঁতকপাটি লাগে।

অমর বললে—ছেলেটির কিন্তু এক ব্যারাম আছে,—হাঁপানি। প্রায়ই ভোগে।

শ্যামাপদবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লেন—এমন আর কি শক্ত ব্যায়রাম। ওতে তো আর কেউ মরে না। বয়েস কালে সেরেও যেতে পারে। তা, আপনি কি ছেলের বন্ধু, মেয়ে দেখে যাবেন একেবারে ?

অমর বললে—আজ্ঞে না, আমিই পাণিপ্রার্থী,—ওটা একেবারে বিয়ের রাতে সেরে ফেললেই চলবে। দিন ঠিক করে খবর দেবেন আমাদের, ঠিকানা রইল।

শ্যামাপদবাবুর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুলিয়ে উঠলেও কোনোটাই আমোল দিলেন না। খালি মেয়ে পার করতে পারবেন,—তাও অবিশ্যি বাষট্টি বছরের বুড়োর কাছে নয়,—এই খবর গিন্নীর কানে দিতেই গিন্নি উলু দিয়ে উঠলেন। বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল। বাড়ির এক কোণে একটি কুৎসিত কালো মেয়ে দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল খানিক।

মা বললেন—জানা শোনা নেই, কেমন না কেমন মেয়ে,—একেবারে কথা দিয়ে এলি ?

অমর রাগ করে বললে—আর তোমার ছেলেই বা কি গুণধর মা, যে একেবারে পরী তার ডানা দুটো সগ্‌গে ফেলে রেখে ফার্স্ট ক্লাশ ফিটনে চড়ে তোমার পদ্মবনে এসে দাঁড়াবেন! শাঁখ বাজাও মা। গুনে গুনে হাজারটি নগদ টাকা,—আর দু বচ্ছর পড়া-খরচ।

মা অপর্যাপ্ত খুশী হয়ে গেলেন। বিয়ে হয়ে গেলে কাশী যাবেন, সঙ্কল্পও সম্ভব হল।

অমর বললে—তোমার ছেলের এই তো চেহারা,—একটা আরস্থলার চেয়েও অধম। তার ওপর বুকের পাঁজরায় ঘুণ ধরেছে। যা পাও, তাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ো।

মা বললেন—মেয়ে যদি খোঁড়া হয়?

—কি যায় আসে তাতে? তোমার ছেলে যে কুঁজো। টাকাগুলি তো চকচকে হবে।

সরোজ বললে—কবে প্রেমে পড়লে হঠাৎ? ফরদা হাওয়ায় পর্দা বেফাঁস হয়ে গেল বুঝি?

লুসী সে ঘরে বসেই সেলাইর কল চালাচ্ছিল, বললে—কবে পড়েছেন উনি পাঁজি দেখে তারিখ লিখে রেখেছেন কি না! আর জন্মে পড়েছিলেন, এ জন্মে পেলেন।

সরোজ বললে—পড়তে মন যাচ্ছিল না মোটেই, ঘুম পাচ্ছিল। লুসীকে বললাম,—কল চালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে, দিদি। এবার থামাতে পারিস, আমি অমরের সঙ্গে বেরোচ্ছি। দে তো চাবিটা।

দুই বন্ধু বেরিয়ে গেল।

পিঠের ওপর চুল মেলা, মান্দ্রাজি মেয়েরা যেমন করে শাড়ি পরে তেমনি ধরন শাড়ি পরার, দুটি হাতে সোনার কঙ্কণ, ছুঁচে সুতো পরাবার সময় চোখের কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ললাটে আভা!

ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসই সওদা করলে দুজন,—বাক্স বোঝাই করে। টোপর পর্যন্ত। তিনটে মুটে।

ফেরবার মুখে আরেক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বয়সে কিছু বড়।

অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—কি করছ আজকাল ?

—বিয়ে করছি। চূড়ান্ত। আর তুমি ? টিউশানি পেলে ?

—পেয়েছি একটা। যৎসামান্য। ঐ গলির বাঁকের লাল বাড়িটা।

—ও! কত দেয় ?

—কিঞ্চিৎ। ল-কলেজের মাইনে সাড়ে সাত টাকা।

সরোজ চোখ বড করে বললে—সাডে সাত টাকা ?

লজ্জিত না হয়েই বললে বন্ধু—হ্যাঁ, তাই সই। মাইনেটা তো চলে যায়। আর কি বেয়াড়া এঁচড়ে-পাকা ছেলেই পড়াতে হয়, ভাই। এইটুকুন্ বয়েস থেকেই পদ্য মেলাতে শিখেছে। ভাগ্যিস বাপ মার 'নাই' নেই এতে, নইলে উচ্ছন্নে যাবার সুড়ঙ খোঁড়া হচ্ছিল আর কি। মা বলে দিয়েছেন, ফের পদ্য মেলালে বেত মারতে। তিনটে খাতা প্রায় ভরতি করে ফেলেছে, ভাই। সবগুলি পুড়িয়ে ফেলেছি কাল।

অমর বললে—খুব কাঁদ্‌লে ?

—বাপের চড়-চাপডও তো কম খায় নি। মা তার হাতের নোড়া নিয়ে পর্যন্ত তেড়ে এসেছিল। কবিতা লিখতে গিয়েই না ছেলেটা এবার অঙ্কে একেবারে গোল্লা পেলে।

অমরের মনে পড়ছিল, সেই খাকি রঙের শার্ট, কোমরে কাপড়ের সেই ছোট আলগা বাঁধুনিটি,—সেই তরল জ্যোৎস্নার মতো দুটি চোখ, সেই বালি-কাগজের ছেঁডা-খোঁড়া খাতাটা, পেন্সিল দিয়ে লেখা কবিতা, নাম—"বড়দি বা বড় তারা",—এক দিন ছোট্ট কচি হাতখানি দিয়ে বুকটা আস্তে একটু ডলে দিয়েছিল—

অমর ডাক্তারের কাছে গিয়ে বললে—রোজ শেষ রাত্রেই হাঁপানিটা চেগে আসে। একটা ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে দিন, যাতে অন্তত আজ রাতটা রেহাই পাই। আমার বিয়ে কি না।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন বটে। যাবার সময় অমর টেবিলের ওপর একটা নিমন্ত্রণপত্রও রেখে গেল।

বউ-ভাতে তো কাউকে খাওয়াতে পারবে না, তাই যার সঙ্গে একটি দিনের জন্যেও প্রীতি-বিনিময় হয়েছিল তাকে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করলে। টাইম-অনুসারে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে কি সুখ!

রাজা।

কেন নয়? সবাইর চেয়ে উঁচু জায়গায় আসন, সামিয়ানা খাটানো, তাতে তিনটে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে, ফুলদানিতে বিস্তর ফুল, গলায় প্রকাণ্ড মালা, গায়ে সিল্কের দামী জামা, জীবনে এই প্রথম পরেছে, পায়ে চৌদ্দ টাকা দামের জুতো,—দু-মাস টিউশানি করে যা জোটে নি।

ছেলেরা চেঁচামেচি করছে, মেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ছে ও বর্ষার জলধারার মতো কলরব করছে! বন্ধুরা এসে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে যাচ্ছে। চিকের পেছনে বর্ষীয়সী মেয়েদের ভিড় লেগে গেছে,—উলু দিয়ে দিয়ে গলা ভেঙে ফেলছে। উলু দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হয়ে গেল, দেখে একটি মেয়ের স্রোতের মতো কি স্বচ্ছ হাসি!

এ বাড়িতে আজ যেখানে যা হচ্ছে সবই তো অমরের জন্য। খাবার নিয়ে আঁস্তাকুড়েতে কুকুরগুলি যে লড়াই বাধিয়েছে, তাও। যা কিছু বাজনা, যা কিছু হাসি, যা কিছু কোলাহল!

ঐ যে নিভৃতে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরী দুটি হাত তুলে চুলের খোঁপাটা ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছে, চুলের কাঁটাগুলি ফের ভালো করে গুঁজে দিচ্ছে—সেও তো তারই জন্য! --অমর ভাবছিল। নইলে আজ মেয়েটি কখনো এই নীল শাড়ীটি পরত না, মাথায় কখনো গুঁজত না ঐ শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললে বটে, কিন্তু অমর ঘাড় গুঁজে রইল, মুখ তুলে চাইল না। পাছে ভুল ভেঙে যায়। খালি একটি কথাই মনে পড়ছিল তখন।

লুসী জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম আপনার বউয়ের?

অমর বলেছিল—মনোরমা।

লুসী খপ করে বলে ফেলেছিল—ওমা! আমারো ভালো নাম যে তাই। বলেই রাঙা হয়ে উঠে মুচকে হেসেছিল একটু।

পাছে তেমনি রাঙা হয়ে উঠতে না পারে। পাছে—

মনোরমা নিজে কুৎসিত হলেও আশা করেছিল ছবির পাতায় রাজপুত্রের যে ছবি দেখেছিল, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া না হলেও তেমনিই সুকান্ত হবে তার প্রিয়তম! ভাবলে—কড়ে আঙুল দিয়ে কপালে এক টোকা মারলেই ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে বুঝি।

তবুও তো স্বামী। ডাক্তার এসে আর দড়ি দিয়ে কপাল বেঁধে দেয় না, সারারাত্রি মনোরমাই কপাল টিপে দেয়। কখনো অনাবশ্যক বল প্রয়োগ করে বসে। রাগ করেই হয়তো।

অমর সবচেয়ে ঘৃণা করত নিজের এই কদর্য ব্যাধিটাকে। আর ঘৃণা করে, যে মুখটা তার সত্যিই বত্রিশটা দাঁত আছে কি না অন্যকে গুনে দেখাবার জন্য সর্বদাই মেলে রয়েছে,—সেই মুখটাকে। মনোরমা নাম বদলে নাম রেখেছে তিলোত্তমা!

মা কেঁদেছিলেন বটে একটু, এক ফাঁকে এক এক করে নোটগুলি গুনেও নিয়েছিলেন বার চারেক।

হঠাৎ একদিন কয়েকখানি আঁচলের খুঁটে বেঁধে কাশী চলে গেলেন। বলে গেলেন—বউ তো হয়েছে। রেঁধেও দেবে, বুকে মালিশও করবে। আমি দিন কতক ধর্ম করে আসি, জিরিয়েও আসি।

শ্যামাপদবাবু এসে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। অমর আপত্তি করলে না। বললে—এ কদিন না হয় কোনো একটা মেসেই থাকব। কারো হাত বুলিয়ে না দিলেও চলবে। তবে শিগগিরই যেন আসে।

বাড়ি ফিরে এসে শ্যামাপদবাবু মনে মনে বলছিলেন—বাবা কাঁটাটা তো খসেছে গলা থেকে! বন্ধুদের বললেন—ভূমণ বস্তাও পিঠে করে

বওয়া যায়—কিন্তু এই কুৎসিত মেয়েটা কি হায়রানি করেই মেরেছিল।
তবু যদি—

তারপরের ব্যাপারটা একটু আকস্মিক বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তাতেই খুব ঝাঁক করে হাঁপানি উঠে গেল। একটা গাড়ি ঠিক করতে রাস্তার মধ্যে আসতেই বেহুঁশের মতো একটা মোটর অতি আচমকা একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল কাঁধের ওপর। তার পর ঘষড়াতে ঘষড়াতে—

শ্যামাপদবাবুর কাছে খবর গেল। মনোরমা একবার যেতেও চাইল কেঁদে। বাপ বুঝিয়ে বললেন—এখন গিয়ে কি আর এগোবে বল? গঙ্গায় না হোক কলতলাতেই শাঁখা ভাঙলে চলবে। পানটা আর চিবোস নি, মা।

মার কাছে তার পৌছল না। ঠিকানা বদল করেছেন।

আরো একবার রাজা। সবাইর কাঁধের ওপর।

ওর জন্যই তো আজকের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ওর জন্যই তো লুসীর চোখে একবিন্দু অশ্রু!

অরণ্য

মেস্‌এ আছি।—একটা চাকরি জোটাতে পারি কি না সেই ফিকিরে।

চেষ্টা-চরিত্র করবার মতো চরিত্রে আর বল পাই না, ছেঁড়া তোশকের ওপর একটা রঙ-চটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিই, বিকেলে এ-দিক ও দিক একটু হেঁটে আসি মাত্র,—শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, নরসিংহ লেনের মোড়ে চা-এর দোকান,—বড় জোর ওয়াই. এম্. সি. এ। লোকে বলে, কুঁড়েমি করে করেই আমি বুড়িয়ে যাব,—আমার দ্বারা কিছু হয় নি, হবে না।

আমি মেস্‌এ তক্তপোশে শুয়ে-শুয়ে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখি!—হাতে কোনোই তো আর কাজ নেই, সিলিঙ পর্যন্ত লম্বা একটা পেন্সিল পেলে বিছানায় চিত হয়ে জি. কে. চেস্টারটন্‌এর মতো সিলিঙে ছবি আঁকতাম! চাকরি-বাকরি না জুটলে শেষ পর্যন্ত বেলুড় মঠে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করব। চাকরি পেলেই বিয়েটা করে বেশ তৈলসিক্ত নিরীহ সংসারী বনে যাই,—কতটুকুই বা আমাদের চাহিদা!

এর মধ্যে একদিন আমাদের মেস্‌এর ঝি সব বাসন কোসন নিয়ে সরে পড়ল। সবাই বললে, আপনি তো চুপচাপ বসে আছেন, আমাদের শ্বাস গ্রহণ করবারো সময় নেই, যান একটা ঝি-ফি জোগাড় করে আনুন গে!

ঝি খুঁজতে বেরুলাম।

খুঁজতে খুঁজতে এসে গেলাম পাথুরিয়া-ঘাটা বাই-লেন। মোড়ের ওপর তেতলা বাড়ি,—সদর দরজার কাছে একটি মহিলা একটি

হিন্দুস্থানী মেয়ের কাছ থেকে ঘুঁটে রাখছেন। দুপুর তখনো প্রায় পুরোপুরি-ই।

মাসীমারা যে এখানে আছেন এবং এ-পাড়ায়ই,—এ-রকম-একটা জনশ্রুতি আমার কান এড়ায় নি। কিন্তু তখন বলসেবী বল্‌শেভিকদের মন্ত্র নিয়ে নয়,—অভিজাত জীবনের ওপর আমার স্বভাবজাত একটা বিতৃষ্ণা ছিল,—তাই মাসীমার সীমাতেও আমি আসি নি। আন্দামান থেকে দেশে ফিরে এসে যখন মাকে ফিরে পেলাম না, তখন মাসীর দিকে একবার ফিরে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, থাক্ গে. মেসোমশায়ের মনোভাব আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এই চোদ্দ বছর পরেও মাসীমা আমাকে চিনে ফেললেন। একেবারে দুই উৎসুক বাহু মেলে পথের কাছে নেমে এলেন,—মা যেন তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার করুণাসিক্ত অধীরতাটুকু মাসীমার বুকে রেখে গেছে! রইল পড়ে ঘুঁটে গোনা, মাসীমা আমাকে একেবারে বাহুতে জড়িয়ে বারান্দা দিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন,—নিয়ে এসেই গলা ছেড়ে ডাক : ও ভ্রমর, ও হেনা,—দ্যাখ এসে তোদের ক্ষিতি-দা এসেছে!

ক্ষিতি-দা! যেন তেতলা বাড়ির তেত্রিশটা ঘর থেকে একসঙ্গে তিয়াত্তরটা আওয়াজ বেরুল।

মুহূর্তের মধ্যে তিন দিকের তিনটা সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গে ছোট-বড়ো কতগুলি প্রাণী যে নেমে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল তার ইয়ত্তা নেই। মনে হল, এরা যেন এই ঘটনার আগে, নিশ্বাস নেওয়ার আগে পর্যন্ত, ক্ষিতি-দার জন্য জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। যখন দীর্ঘ প্রবাস থেকে প্রথম কলকাতায় এসে পা দিই, তখন কোথায় ছিল এতগুলি মুখ, স্নেহে সুকোমল, কল্যাণকামনায় লাবণ্যময়! সেদিন নিজের ভাগ্যকে নিষ্ঠুর বলে তিরস্কার করেছিলাম,—কোথায় ছিল মাসীমার বাহু-উপাধান! আমার চোখ ভিজে উঠল।

মাসীমা কান্নামাখা স্বরে বললেন,—খবরের কাগজে কতদিন আগে—

প্রায় দুবছর হল—জেনেছি তুই ছাড়া পেয়েছিস, কত তোকে খোঁজ,—কোথাও তোর হদিস নেই। আছিস কোথায়?

হেসে বললাম—মেস্‌এ। এখন একেবারে মেষ হয়ে গেছি কি না।

বলেন,—কেন, তোর মাসিমা কি বাসি হয়ে গেছে?

বলে আদর করে গালে একটি ছোট্ট চড় দিলেন।

বললাম,—মেস্‌এর জন্য ঝি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, ঝি-র বদলে মাসী পেলাম।

আমাকে ঘিরে যতগুলি প্রাণী দাঁড়িয়েছিল, সবাই আমাকে প্রণাম করবার জন্য ভিড় করে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি যেন মৃত্যুর মতোই ভয়ঙ্কর ও মহিমাময়, অথচ মৃত্যুর মতোই দয়ার্দ্রহৃদয় অদূর-আত্মীয়! হটে গেলাম, বললাম,—প্রণাম করে অন্যকে প্রভুত্বের মর্যাদা দেবে,—আমি এই দৌর্বল্য সহ্য করিনে! একটু দুর্বিনীত হও।

একটি ছোট্ট ছেলে, হয়তো সবে পাঁচে পৌঁচেছে কিংবা ছয়ে—দুই চোখে খুশির ঢেউ দুলছে—আমার হাত ধরে বললে,—তুমি আমার ক্ষিতি-দা।

বুঝলাম ক্ষিতি-দা-র খ্যাতি এই শিশুটির কাছেও পৌঁচেছে! ছেলেটির নাম আগে ছিল রুসো—এখন হয়েছে রুষ, ওর মেজদি হেনা ওর নাম রেখেছে।

রুষ আমার আদর না নিয়ে বললে—আমি তোমার মত হব ক্ষিতি-দা!

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম,—আমার মতন কি। দূর বোকা! আমি তো একটুখানি,—আমার চেয়েও ঢের বড়ো হবে।

রুষ বললে,—তবে আমাকে তোমার কাঁধে চড়িয়ে দাও, তোমার থেকে এক্ষুনি বড়ো হয়ে যাই।

ভ্রমর হেসে বললে—নাম্ দুষ্টু ছেলে!

রুষ বললে,—আর ক্ষিতি-দা বুঝি দুষ্টু নয়! দুষ্টু বলেই তো তাঁকে এতদিন আটকে রেখেছিল,—দুষ্টুমি করলে আমাকে যেমন তুমি তোমার ঘরে বন্ধ করে রাখ।

মেসোমশাইরা তিন ভাই,—বাড়িও তিন-তলা। মেসোমশায় মেজো—আলিপুরের জজ;—বড় যিনি, তিনি গোটা পাঁচেক কয়লার খনির মালিক, ছোটটিও ব্যবসাদার।

একান্নবর্তী পরিবার,—সেইটেই আশ্চর্য,—প্রতি বেলায় পাত-ও পড়ে একান্ন। বড়োর হাতে বারটি সন্তান, মেসোমশায়ের দশটি, ছোটোটি বিয়েতে দেরি করলেও দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন নি। তা ছাড়া চাকর-বাকর বয়-খানসামা দারোয়ান-মালি তো কতোই আছে। সব চেয়ে আশ্চর্য, সব কটিই বেঁচে আছে—আয়ু আর বিত্ত এদের অ্যাল্‌ফা এবং ওমেগা!

সন্ধ্যাসন্ধিতে মেসোমশায়ের ঘরে তলব পড়ল। হেসে বললেন,—শিং ভোঁতা করে এসেছ তো, চরকা নিয়ে? তা বেশ! আমাদের চরকায় তেল দিতে চাইবে না আশাকরি।

তার পর মাসীমার দিকে চেয়ে বললেন,—যাও একে ঘি-দুধ খাইয়ে বেশ একটি নধর তাকিয়া বানিয়ে ফেল,—সাপকে দড়ি বানানোটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ফের হেসে বললেন,—যাও, কদিন বেশ জিরিয়ে নাও এখেনে, ভ্রমরের এস্রাজ শোনো, ফ্লাই-র গান—মনটাকে ধুয়ে একেবারে সাফ করে ফেল। সিনেমা দ্যাখ, মুর্গি কাট, ঘুমাও,—বেশ নিরীহ হয়ে যাও।

বললাম,—তাই হয়ে গেছি। ভাবনা নেই আপনার।

কোথা থেকে কোথায় এসে মিশে গেলাম। ছিলাম ধাবমান নির্ঝরের ফেনসঙ্কুল দুর্নিবার খরস্রোত—এখন হয়ে আছি পুষ্করিণী—সীমাবদ্ধ, নিষ্প্রাণ, অগভীর! শেলির স্কাইলার্ক ওয়ার্ড্‌স্বার্থের হয়ে গেছি, কিংবা হাডির! যৌবন হারিয়ে বুড়ো যযাতি হাই তুলছেন।

প্রত্যেকের জন্য—মানে যারা বয়স্ক—এক-একটি আলাদা ঘর,—এবং প্রত্যেক ঘরেই আমার নিমন্ত্রণ। তার কারণ এই নয় যে ষোলো বছর বয়সে কালাপানি পেরিয়েছিলাম,—তার কারণ, আমি সবাইর চোখে একান্ত করে আলাদা, সবাইর কাছে তাই একান্ত করে আপন। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত,—আমি ভাতের প্রথম গ্রাস মুখে তুলবার

আগে হাতটা কপালে এনে ঠেকাই, সবাই তাই উৎসুক হয়ে দেখে,—আমি আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নোখটা অনেক বড়ো রেখেছি, এবং সেই নোখ দিয়ে অন্ধকারে একজনের চোখ কানা করে দিয়েছিলাম—

সকাল থেকে রাত একটা পর্যন্ত এ-বাড়িকে মনে হয় একটা কারখানা,—যেন অনবরত কল ঘুরছে;—পাঁচ বছরের ছেলে রুষই হচ্ছে এ-কলের কলিজা। আমি রুষেরও বন্ধু বনে গেছি। রুষ মেয়ে-পুরুষ সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে,—দু-নলা বন্দুক ছোঁড়ে, নিজে-নিজে ঘোড়ায় চড়ে, মোটরে ড্রাইভারের কোলে বসে হুইল্ না ধরলে ওর কোথাও যাওয়াই হয় না,—ঘড়ি ভেঙে ফেলে তার কলকব্জা দেখে, কাঠ আর পেরেক দিয়ে এঞ্জিন বানায়, দোরের পাশে লুকিয়ে থেকে সমস্ত বাড়িকে তোলপাড় করে ছাড়ে,—পরে গুটি-সুটি বেরিয়ে এসে বেমালুম প্রশ্ন করে—কাকে খুঁজছ, মেজদি?—রুষ যেন বাংলার পলি-মাটি দিয়ে তৈরি নয়,—রাশ্যার বরফ দিয়ে, কঠিন, হিম দুর্দমনীয়,—ওর দুই চোখে যেন বন্য দস্যুতা আছে,—তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার!

ইহসংসারে আমিই নিস্পৃহ,—তাই সবার কাছেই স্পৃহনীয়। আমাকে পেয়ে ওরা সবাই যেন হাঁপ ছেড়েছে,—ওদের আহার সুস্বাদু, পানীয় সুশীতল হয়ে উঠেছে,—ওদের ঘরের বাতাসে সুবাস এসেছে, যে কথা বলবারও নয় ভুলবারও নয়—সেই কথা যেন মুক্তি খুঁজছে। বন্দী ভাষা, দুর্বোধ তার রহস্য!

তে-তলা এক-তলা আমি টানা-পোড়েন করছি।

মোটমাট সতোরোটি খোপরি,—সুতরাং হাতে আমার সাতঘণ্টাও থাকে না। আমাকে ওরা বলে: তুমি দিনে ঘুমিয়ো, ক্ষিতি-দা,—তুমি তো ঘানি ঘুরিয়েছ দিনেই,—রাতেও ঘোরাও এবার।

ভ্রমর আমার মেসোমশায়ের বড়ো মেয়ে।

ভ্রমর তার খাটের ওপর বসে একটা সুটকেস উপুড়, উজাড় করে

কি সব জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে বিভোর হয়ে আছে। আমাকে দেখে খাট থেকে লাফিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন বেশ একটু বিব্রত হয়েছে। বল্লে,—আজ আর এস্রাজ নয়, ক্ষিতি-দা—এস্রাজের চেয়েও মিষ্টি বাজনা আছে, শুনবে? বোসো তা'লে।

ভ্রমর মাথার চুলটা ঠিক করতে-করতে ফের বললে,—চা খাবে?

এই ভাত খেয়ে এলাম। তোমাকেও নেয়ে-খেয়ে নিতে বললেন মাসীমা। কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে? তুমি এখন যাও। তোমার এ-সব জিনিসপত্র আমি পাহারা দিচ্ছি। তুমি খেয়ে এলে পর মিষ্টি বাজনা শোনা যাবে'খন।

ভ্রমর আলমারি থেকে শাড়ি-সেমিজ বার করলে,—তেল নিয়ে পিঠের ওপর সাপের মতো বেণী খসিয়ে একটু এদিক-ওদিক হেঁটে, দোলনায় ঘুমন্ত ছেলেকে একটু আদর করে যেতে-যেতে বললে,—তোমার ওপর এই সবের ভার রইল ঝুঁকি পোয়াবার, উঁকি দেবার নয়।

বলে একবার ছেলে ও আরেকবার খাটের ওপর বিশৃঙ্খল জিনিসগুলির দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে চলে গেল।

ভ্রমর যেন শরৎ-মেঘের বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরী,—ওর মধ্যে যেন সেই নিষ্ফল নিরানন্দ উজ্জ্বলতা,—ভ্রমর যেন মরুভূমির শুষ্ক নিষ্করুণ দিগন্ত-লেখা,—সেই ঔদাস্য ওর ললাটে। এস্রাজের মাঝে ওর অজস্রতা নেই, গানে নেই প্রাণ,—কোনো উৎসবে নেই উৎসাহ! ও ভ্রমে ভ্রমর নাম নিয়েছে।

আধঘণ্টা বাদে ভ্রমর এসে হাজির,—হাতে এক বাটি চা। ঘরে পা দিয়েই কলকণ্ঠে বলে উঠল: তুমি এ-চেয়ারটিতে বসেছ, ক্ষিতি-দা! বাঃ! চা-টা হাতে করে এইটুকুন আসতে আমার কী ভালো যে লাগছিল—

—তুমি কি পাগল হয়েছ ভ্রমর, এই দুপোর দুটোয় চা,—ভাত খেয়েই?

—চায়েঁ তোমার অরুচি আছে তা'লে। থাক রেখে দাও।

ভ্রমর সুন্দর করে সীমন্তে সিন্দূর পরলে,—মুখে গোধূলিবেলার নির্মল আভা, দুই ঠোঁটের কোলে ব্যথিত স্তব্ধতা ঘুমিয়ে আছে,—

দুটি হাতে ক্লান্তির কাতরতা। সেই ক্লান্তিই যেন ওকে কমনীয় করেছে!

ছেলের দোলনায় ছোট দুটি ঠেলা দিয়ে বললে—গিলে আসছি। এলাম বলে।

ভ্রমর এল খেয়ে। দুপুর প্রায় ফুরিয়ে এল।

বললাম,—তোমার মিষ্টি বাজনা শোনাবে না?

কাগজের স্তূপ থেকে কি-একটা বের করে ভ্রমর বল্লে,—শুনবে এস! এস এগিয়ে।

এগোলাম। ভ্রমর আমার চোখের কাছে একখানি ফটো এনে ধরল। নষ্ট হয়ে গেছে,—বহুদিনকার নিশ্চয়ই,—কিছুই ভালো চেনা যায় না। তবু আন্দাজ করে বললাম,—নীরেশবাবুর? এ বাজনা তো খালি তোমারই কাছে মিষ্টি!

ভ্রমর বললে,—তোমারো কাছে লাগবে, শুধু মিষ্টি নয়, মিস্‌টিক্! শ ডিলিট করে' দন্ত্য ন বসাও।

অবাক হয়ে বল্লাম,—তাব মানে?

—এটুকুরও মানে তুমি করতে পারবে না ক্ষিতি-দা? সোজাসুজি মানে, নীরেন আমার বন্ধু ছিল।

হেসে বললাম, তোমার টেন্‌স্-জ্ঞান আমার টেন্‌শান্ কমিয়ে দিয়েছে, ভ্রমর। 'ছিল',—এখন আর নেই তাহলে? বাঁচা গেল।

ভ্রমর ফটোটা চোখের কাছে তেমনি ধরেই আছে। অস্ফুটস্বরে বললে,—না, এখন আর নেই। সেইটেই দুঃখের।

—কেন নেই?

—রেপুটেশান ক্ষিতি-দা, রেপুটেশান। তুমি ওথেলো পড়েছ? ক্যাশিয়োকে মনে পড়ে?

হেসে বললাম—যদি দন্ত্য ন তালব্য শ হয়ে রুখে ওঠে, সেই ভয়ে দরজায় তালা দিয়ে তাকে বাতিল করে দিলে। এই তোমার মিষ্টি বাজনা, ভ্রমর?—থাক, এ বিষের চেয়েও মারাত্মক।

ভ্রমর জ্ঞানীর মতো বললে,—এ-বিষ নিরামিষ, ক্ষিতি-দা! সেইটেই

বাঁচোয়া। আচ্ছা, তুমি এ-ব্যাপারের প্রতি এত নিরুৎসাহ কেন? তুমি তো কোনোদিন ভালোবাসার বেসাতি কর নি, বেহাতও কর নি। তুমি কি একে অন্যায় মনে কর?

মুরুব্বিয়ানা করে বললাম,—অন্যায় নয়, মূর্খতা।

—হ্যাঁ, মূর্খতা! নইলে তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে কেউ কৃচ্ছ্রসাধনা করে,—জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে বসে! শুনলাম বুড়ো মাকে ফেলে জাহাজের খালাসি হয়ে সাউথ আফ্রিকা যাবে।

—তুমি আবার হাসালে, ভ্রমর। এখনো যায় নি তা'লে? বাঁচা গেল।...আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও ভ্রমর,—তোমার বন্ধুর নাম কি নীরেন চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ভ্রমর লাফিয়ে উঠল: তুমি চেন তাকে? সুন্দর দোহারা চেহারা, পাঞ্জাবি ছাড়া কোনদিন কোট গায়ে দেয় না, মোজা পরে না,—খালি ক্রেভেন্-এ খায়, ডান দিক দিয়ে মাথার আদ্দেক অবধি টেড়ি কাটে! তার সঙ্গে তোমার কবে দেখা হল? বিয়ে করে নি এখনো?

—মেস্এ দেখা হয়েছিল,—বোধ হয় দিন কয়েকের জন্যে। পরে কোন দিকে যে পাল খুলে দিল কেউ জানে না—

—কেউ জানে না? আমার ভারি ইচ্ছা করে, আবার সে আসুক—এমনি নির্জন দুপুরে—ঠিক ঐ চেয়ারটিতে এসে বসুক,—ভাত খেতে এসেই চা চাক্। কেন তা হয় না, ক্ষিতি-দা? জীবনের একটা চৌমাথার মোড়ে এসেও সে ট্রাফিক্-পুলিশের মতো আমার গাড়ির গতি বন্ধ করে দেবে না,—এ তার কী অমানুষিক অভিমান!

—ঘৃণাও তো হতে পারে, ভ্রমর।

—হতে পারে। কিন্তু কেনই বা সে ঘৃণা করবে?—আমাকে তো সে কোনদিন চায় নি। আমি তাকে বুঝতেই পারলাম না, ক্ষিতি-দা। আমার আঙুলটির সঙ্গে তার আঙুলটিরও আত্মীয়তা হয় নি,—

—তবু, হৃদয় যে প্রতিবেশী ছিল সেটা আজ বেশি করেই বুঝছ।

—হ্যাঁ, খুব বেশি করে। বাড়িব সবাইর কাছে ছিল সে এন্সাই-ক্লোপিডিয়া, আমার কাছে সে ছিল শুধু সাইক্লোন্!—আমি তার

সে-চেহারা আজো মনে করতে পারি, ক্ষিতি-দা। কিন্তু সত্যিই হয়তো পারি না।

ভ্রমর ছেলেকে দোলা দিয়ে এসে ফের খাটের ওপর বসল।

বললাম,—এও তো হতে পারে, ভ্রমর, যে সে মোটে তোমাকে পাবার মতো করে ভালবাসে নি,—এমনিই তোমার পথের মাঝে ধূলির মতো উড়ে এসেছিল, এমনিই আবার ধুয়ে গেছে।

—সুবাসের মতো,—ক্ষীণ হয়ে এসেছে শুধু। আমি তো তাকে তাই চাই। সে আমার অ্যাকোয়েন্‌টেন্‌স্‌,—তার সঙ্গে ফের চা খেতে ইচ্ছা হয়, একসঙ্গে জর্জ ম্যুর পড়ি, এক দিন এক সঙ্গে 'টকি' শুনে আসি। সে সবচেয়ে আমাকে বেশি বোঝে, সে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে পা ফেলে চলে, তার মাঝে আমি নিজেকে বেশি করে আস্বাদ করি বলেই তো সে আমার বন্ধু। আমাদের দুই পাখির এক পালক! সে নাই বা এল সন্দীপের মতো, সে সৌহার্দ্যের প্রদীপ নিয়ে আসুক,—আমি তার বন্ধু, এও আমার একটা পরিচয় হোক। তা কেন সম্ভব নয়, ক্ষিতি-দা।

—তার উত্তর তো তুমি আগেই দিয়েছ। এর আরো একটা উত্তর হতে পারে, পুরুষের চাওয়াটা ভারি পুরু, মেয়েদের মিহি।—তোমার অ্যাকোয়েন্‌টেন্‌সে তার প্রয়োজন নেই।

—তুমি আমাকে কি ভাবছ জানি না,—কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা করার সাঙ্ঘাতিক দরকার আছে।—হয়তো শুধু আজকের জন্যই। তার কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে না,—শুধু আজকে হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ মনে হল ক্ষিতি-দা, তাকে আমি ভুলি নি। আর একদিন হয়েছিল,—যেদিন হঠাৎ তুমি এলে। সেই হঠাৎ আসাটাই সেদিন ভারি রোমান্টিক লেগেছিল।

খানিক থেমে হঠাৎ ভ্রমর বললে,—আমি আমার স্বামীকে খুবই ভালোবাসি, সে-কথা বলাই বাহুল্য,—আমি ফোরসাইট সাগা পড়লেও বুঝি নি, আমি Ireneও নই Fleurও নই,—কিন্তু জান কি ক্ষিতি-দা, আমার স্বামী স্বামীই বটেন, বন্ধু নন—বহু তপস্যার স্বামী, বিনা মূল্যের

বন্ধু নন। কিংবা ঠিক তার উলটো। আমি ডাক্তার চাই বটে, হার্ট স্পেশালিস্ট,—কিন্তু সঙ্গে একটি হার্টি বন্ধু বেশ হয়।

ভ্রমরের ছেলে তখন কাঁদতে শুরু করেছে। ভ্রমর তাকে শান্ত করে।

উঠছি—ভ্রমর বললে,—তুমি মনে ভেবো না, তার সঙ্গে দেখা হয় না বলে আমার ঘুম হয় না,—তা হয়। শুধু সে যেন বিয়ে করে, যেন ভদ্রলোক বনে যায়,—এইটুকু।

হেসে বললাম—দেখা হলে ভদ্রতা শিখতেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন।

কে এই নীরেন চক্রবর্তী? সে একদিন ভ্রমরের নিকটবর্তী হয়তো হয়েছিল, কিন্তু আমি তো তাকে জানি না—আমি ভ্রমরকে ভাঁওতা দিয়েছি।

নীরেনের সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হবে না জানি। সে হয় তো এখন কেরানি, হয়তো বা স্পাই! তবু সে আমার বন্ধু। সে সাধ্যাতীতের জন্য সাধনা করেছিল—মন্দিরে পাষাণের বেদীকে সে দেবী বানায়।

তুচ্ছ মেয়েই তো বটে।

সুধাংশুর ঘরে আসি। সুধাংশু মেসোমশায়ের দাদার ছেলে।

—কি করছ, সুধাংশু?

—এসো এসো, ক্ষিতি-দা। কি আর করব বল? সেই ল' সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে পাড়ে থেকে লগি ঠেলছি। ইকুয়িটেব্‌ল্ সেট্-অফ মুখস্ত করতে করতেই অস্ত যাব।

বসি এক পাশে। ভ্রমরের ঘরে একটি বিষণ্ণ দারিদ্র্য আছে,—এর ঘরে একেবারে রৌদ্রের প্রখরতা। হঠাৎ মনে হয় যেন মিউজিয়মে এসেছি। ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝকঝক করছে,—কাশ্মীর থেকে বর্মা তো আছেই, সুদূর আইসল্যাণ্ডও তার কিউরিয়ো পাঠাতে

ভোলে নি। সুধাংশু পড়ে, আর তার চাকর চেয়ারের তলে বসে পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দেয়।

হঠাৎ সুধাংশু বললে,—আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পার, ক্ষিতি-দা?

যেন পাহাড় থেকে পড়লাম। যার শালের এক ধারের পাড় বেচে একটা লোকের এক মাসের ভাত জোটে সে চায় চাকরি? ঠাট্টা আর কাকে বলে?

কিন্তু ঠাট্টা নয়! সুধাংশুর মুখে মালিন্য এসেছে। বললে,—আমার দ্বারা পরীক্ষার সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হওয়া চলবে না ক্ষিতি-দা। তিনবার ঘায়েল হয়েছি—আমি আর বৌয়ের কাছে অপমান সইতে পারি না। একটা ছোটখাটো চাকরি নিয়ে কোথাও ভেসে পড়তে ইচ্ছা করে।

—বল কি সুধাংশু?

—সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গেরুয়ার লুঙ্গি পরে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই। বৌকে ছেড়েছিলেন বলেই তো শুদ্ধোধনের ছেলে সিদ্ধার্থ হতে পেরেছিলেন, ক্ষিতি-দা। আমিও আমার বিলাসের বস্তুটিকে ফেলে একান্ত সস্তা হয়ে বিকিয়ে যেতে চাই,—কেউ নেই আমার,—শুধু আমি, আর আমার অকূল ভবিষ্যৎ। জেলে গিয়ে পচতেও চাই, কিন্তু, এ-রকম জলো হয়ে যেতে চাই না।

বললাম,—মাসে তোমার তামাকেই এক শ টাকা লাগে—

—আর, জুতোর কালিতে পঞ্চাশ। তাইতেই তো সব তেতো লাগে, ক্ষিতিদা। আমার একেবারে আলাদা হয়ে যেতে ইচ্ছা করে,—ছোট সংসারে ছোট গণ্ডির মধ্যে একান্ত স্বার্থপর, একান্ত একেলা। একটা ছোটখাটো চাকরি তোমার হাতে নেই?

—আছে। রাস্তার ঝাড়ুদারের কাজ। এগারো টাকা মাইনে।

সুধাংশু যেন মরীয়া হয়ে উঠল: দাও ঝাড়ু, সত্যি আমি নর্দমা পরিষ্কার করব,—

—তোমার শালের কোণটা মাটিতে পড়ে গেছে তুলে নাও!

সুধাংশু শালটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে শান্তস্বরে বললে—ঝাড়ুদার

হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু ছোটখাটো একটা ইস্কুলমাস্টারির যোগ্যতা হয়তো আমার আছে। এবারেই আমার শেষ চান্‌স্‌। এবারে লাফাতে না পারলে আমি চৈতন্য হয়ে যাব।

—মালকোঁচা বাঁধবার সময় সেই চৈতন্যটুকু থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

—তুমি ঠাট্টা করছ ক্ষিতি-দা, কিন্তু তুমি জান না, আমি কী অসহায়! বাবু বৌ, তিনটে রোগা ছেলে,—এত খায় তবু চেহারায় হায়া নেই। মাসের বরাদ্দ টাকায় আমার চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ হয় বটে তবু সত্যি আমার মনে সুখ নেই। আমার গরিব হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

বললাম,—এবারে কোলড্‌ ওয়েভ এসেছে,—টেম্পারেচার একান্ন। ভালো করে শালটা বুকে জড়িয়ে নাও। জর্জ দি ফিফথ-এর মতো ফুসফুসে জল জমতে পারে।

সুধাংশু বোকার মতো আবার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

হেনার সঙ্গে কার তুলনা দেব? গৃহস্থের গৃহকোণে স্তিমিত দীপশিখার, না মেঘম্লান বিষাদিত চন্দ্রালোকের? কি বলে বোঝানো যায় একে? সুস্নিগ্ধ রজনীগন্ধা, না বৃষ্টিসিক্তি তৃণকণা? ওকে বোঝানো যায় না,—স্বপ্নেও ধরা দিতে শেখে নি। ও একটা আইডিয়া!

ভ্রমরের সৌন্দর্য তার মুখের সুচারুতায়, হেনার মাধুর্য তার করতলে!

কিন্তু দুই চোখে ওর প্রতিভা ও প্রতিজ্ঞার দীপ্তি! ওকে ভাঙা যায়, বাঁকানো যায় না।

ওর ঘরে এলে মনে হয় যেন ছায়ায় এসেছি। সমস্ত ঘরে যেন টোয়াইলাট,—সব সময়। ওর ঘরের সব রঙ ফিকা,—ওর চেহারায় একটি ম্লানাভ নির্মলতা আছে। ওকে দেখলে চট করে মনে হয় যেন স্তিমিত সন্ধ্যালোকে একটি ক্ষীণধারা নদী দেখছি। ও যেন নীল আকাশের একটি সঙ্কেত!

ঘর নয়,—মন্দির। কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই,—ভূষণস্বল্পতা ওকেও অনির্বচনীয় করে তুলেছে। শুধু দু-টি চেয়ার, পশ্চিমের দেয়ালের ধারে একটি ছোট গোল টেবিল, দুখানি বই,—উত্তরের দেয়াল ঘেঁষে একখানি নীচু খাট,—মাটি থেকে হয়তো শুধু বারো ইঞ্চি উঁচু,—তোশকের ওপর গরদের চাদর পাতা আর তার ওপর কতগুলি ফুল!—হেনা গরদ ছাড়া পরে না,—গরদে ওর পাড় নেই।

—কি করছ, হেনা?

—আরে, এসো ক্ষিতি-দা কি আর করব? পড়ছি।

—আজকে এমন একটা শুভসংবাদ পেয়ে বেরিয়ে পড়ো নি যে?

হেনা অল্প একটু হেসে বললে,—সেই শুভসংবাদে কোনো উত্তেজনার আস্বাদ তো পাচ্ছি না, ক্ষিতি-দা,—বরং একটি পবিত্রতা পাচ্ছি। আমার এই ছোট ঘরটি দূর আকাশের মতো যেমন পরমবিস্তার লাভ করেছে। একটা ভারি সুন্দর বই পড়ছি। মেয়েটি বলছে: তুমি দুঃখ কোরো না,—আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে তোমার নিঃসঙ্গতার বিয়ে,—তোমার লাঞ্ছনার সঙ্গে আমার লাঞ্ছনার!

টিপ্পনি কেটে বললাম—শেষ পর্যন্ত মেসোমশায় মত দিলেন তা'লে? যদি মত না দিতেন?

—মত না দিলে আমিও তেমনি সেই মেয়েটির মতো তার হাত ধরে বলতাম: আমরা পরস্পরে স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলাম বটে, কিন্তু এই বিচ্ছেদই আমাদের অন্তরের স্পর্শমণি হোক্!...নারীর সতীত্বকে সবাই সম্মান করে, সম্ভব বলে বিশ্বাসও করে, কিন্তু নারীর প্রেমের প্রতি-ই যত বিদ্রূপ। তাঁরা বলেন, নারী স্নেহ করতে জানে বটে, কিন্তু ভালবাসতে জানে না,—সে তার গঠনগত অসম্পূর্ণতা। আমি সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হতাম,—আমি প্রমাণ করতাম ক্ষিতি-দা, যেমন অভিচারের চেয়ে সতীত্ব বড়ো, তেমনি সতীত্বের চেয়ে বড়ো প্রেম—যে-প্রেমে দুঃখদহন আছে, আত্মত্যাগ আছে! তুমি জান না, এই দুঃখ সহ্য করবার সাহসের অভাবেই সমস্ত সৃষ্টি শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

শকুন্তলা যেখানে তপোবনবাসিনী, তার চেয়ে উজ্জ্বল,—শকুন্তলা যেখানে তপশ্চারিণী! পার্বতীর চেয়ে অপর্ণা!

—কিন্তু আই. সি. এস-এর চেয়ে শেষকালে আই-এসসি-কে বরণীয় মনে করলে?

—তুমি আমাকে আর হাসিয়ো না, ক্ষিতি-দা! আমি পরীক্ষকদের পার্শ্যালটির দরুন একটা এম্. এ. হয়েছি বলেই তো আর ডানা গজাইনি। বাবার আপত্তি ছিল তো সেইখানেই। তিনি বলেন—প্রেমে পেট ভরে না।—কিন্তু পেয়ালা তো ভরে,—সেই উত্তরটা সেদিন দিলে ভারি বেখাপ্পা শোনাত; বলিও নি। দিদি এই পেট ভরাবার জন্যেই প্যাটরার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের দোরে ধন্না দিলে। ডাক্তার অবিশ্যি ওর হার্ট-ডিজিজ সারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জান ক্ষিতি-দা, আমার জীবনের চাহিদা ভারি সাদাসিধা,—এখন মনে হচ্ছে কিছুই হয়তো আর চাই না,—নিশ্বাসের জন্য পরিমিত বায়ু, দেহধারণের জন্য স্বল্প আহার! প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয় না জানি, পরমায়ুও নয়—মানে প্রেমের প্রগাঢ়তা ধোপে টেঁকে না,—মানে যেখানে পরস্পর পরস্পরকে পেয়ে ফেলে, পেতে থাকে না।—একটি ছোট নীড়, দুটি ফোঁটা আঁখিনীর,—আর ধরণীর ধূলি! তোমার রবীন্দ্রনাথ পড়া আছে, ক্ষিতি-দা?

সোজা বললাম,—না। সময় হয় নি।

—আমার আজ কবির সঙ্গে সুর মেলাতে ইচ্ছে করছে:

> বহুদিন মনে ছিল আশা
> ধরণীর এক কোণে
> রহিব আপন মনে;
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা।
> গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
> ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
> চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
> ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।

তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা ;
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা ॥

বললাম,—রবীন্দ্রনাথের বাসা একটুকু নয়,—সমস্ত পৃথিবীতে তোমার বাসা দেখলে তে-তলা, না দেখলে পীযূষের হৃদয়।

হেনা হেসে বললে,—ও কবির ideal existence। জান, আমিও একদিন কবিতা লিখেছিলাম, শুনবে ?—

বহুদিন মনে মোর আশা—
চাহি না পাখির নীড়,
আমি নহি ধরণীর ;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, পথের পিপাসা
করিলাম আশা।
তিমির-স্তিমিত রাত্রি নাহি দীপশিখা,
মৃত্যুর আহ্বান আসে ; কে অভিসারিকা,
শ্লথবেণী চলিয়াছ চঞ্চল উধাও,
কাহার অলক্ষ্য লক্ষ্মী, কারে তুমি চাও ?
অজানারে জিনিবারে
নিরুত্তর অন্ধকারে
ডুবিলাম, চক্ষে মম সুদূর-দুরাশা ;
গৃহতরে স্পৃহা নাই, ভবিষ্যের ভাষা
করিলাম আশা ॥

এ-কবিতাটি বহু দিন আগে লিখেছিলাম। কত দিন আগে বল তো ?

সংক্ষেপে বললাম,—পীযূষে যখন তোমার গণ্ডূষ ভরে ওঠে নি।

হেনার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ওর দুই চোখে কবিতার বাতি জ্বলছে।

বললাম,—কিন্তু সারা জীবন হয়তো তোমাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

—আমি তার শক্তি পরীক্ষা করব।—হেনার উত্তরে একটা প্রাবল্য আছে; আমি অর্থোপার্জনে তো অযোগ্য নই, এবং যিনি আমার অযোগ্য নন তিনিও নিশ্চয়ই অনর্থক হবেন না।

—পীযূষবাবুর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

—বোধ হচ্ছে আজকের দিনটা ছাড়া। বোধ হয় আজ সে আমারই মতো ঘরোয়া হয়ে আছে।…রংপুরে চাকরি করতে যাব, ক্ষিতি-দা।

—সঙ্গে গাধাবোটটি আছে?

—হাসিয়ো না বলছি। তোমার উপমাগুলি ভারি কাঠখোট্টা।

অবাক হয়ে যাই। কঠিন মাটিতে বসে হেনা ফানুস ওড়াচ্ছে। ওদের বিয়ে হতে এক মাসও দেরি নেই।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি—সুবলের সঙ্গে দেখা। সুবল মেসোমশায়ের ছোট ভাইর চতুর্থ ছেলে। ষোলয় পড়েছে।

ও সব সময় টগবগ করছে। দমকারমতো সব সময়েই ও সজোরে ঝাপটা দিয়ে চলেছে। আমাকে দেখেই বলে উঠল: জান ক্ষিতি-দা, ব্যাপার? হ্যামণ্ড সাটক্লিফের রেকর্ড ভাঙল?

কথাটা মাথায় একেবারে ধাঁ করে লাগল। মনে হল গ্রীক শুনছি।

—হাঁ হয়ে আছ কি? কোনো খবর রাখ না তালে? টেস্ট ম্যাচ গো ফোর্থ টেস্ট ম্যাচ—ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়ায়। কুড়ি বছরের ছেলে জ্যাকসন জীবনে প্রথম নেমে পাঁচ ঘণ্টার ওপর ব্যাট চালিয়ে এক শ চৌষট্টি করলে—ভাবতে পার? যাবে অ্যাডিলেড?

সুবল আমার হাত ধরে টেনে বললে—এস আমার ঘরে।

স্ববলের ঘরটি ছোট—বলতে গেলে হকি-ষ্টিক আর ব্যাটে বোঝাই। কলকাতায় যখন এম. সি. সি. এসেছিল তখন একখানা ব্যাটের ওপর ও তাদের এগারো জন খেলোয়াড়ের সই নিয়েছে—সেটা দরজার সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে।—পড়ার বই ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, টেবিলে ও খাটের ওপর খালি কতগুলি পিকচার শো আর স্ফিয়ার্ পত্রিকা!

স্ববল কোনো ম্যাচে এখনো সেঞ্চুরি করতে পারল না—এই ওর আপশোস।

বললাম,—পড়াশুনা কি তোমার রসাতলে গেছে?

—রস পাই না বলে তাদের সেখানেই পাঠিয়েছি। ম্যাট্রিক পাশ করতে না পারলে বাবা ডিসইন্‌হেরিট করবেন বলেছেন। ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। ভালো লাগে না পড়াশুনো।

—কি ভালো লাগে?

—সত্যি বলব?—সিনারি আর মেশিনারি! সিনারির মধ্যে কি ভালো লেগেছিল শুনবে?—একটি তামিল ভিক্ষুক-মেয়ে তার বুড়ো স্বামীর জন্য ভিক্ষা চাইছে, আর একবার দেখেছিলাম ইটের ফাটলে ছোট কচি একটি বটগাছ। দেখবে সেই তামিল মেয়ের ছবি?

বলে স্ববল এক-ব্যাগ ফটো বার করলে। স্ববলের ক্যামেরার সামনে কে যে না দাঁড়িয়েছে ঠিক নেই। বুড়ো মজুর, ভাঙা বাড়ি, পচা ডোবা—সবই কেমন খাপছাড়া।

—আর মেশিনারির মধ্যে কি আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল, জান? গয়া একস্‌প্রেস্‌-এর চৌচির এঞ্জিনটা,—যেন দেশলাইয়ের কাঠি। আমি ছিলাম সেই গাড়িতে,—খালি এই দাঁতটা গেছে। জান ক্ষিতি-দা, আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করছি।

—কি?

—তাতে করে মানুষের astral body এক সেকেণ্ডে যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে।

—সে তো যাচ্ছেই। উড়ে যেতে মনের এক সেকেণ্ডও লাগে না।

—তেমন যাওয়া নয়। এ সত্যি গিয়ে বসবে, শুনবে, দেখবে, কথা

কইবে—খালি ছোঁয়া যাবে না তাকে। হিমালয় তার বাধা হবে না, বা আটলাণ্টিক। এ-বিষয়ে কোনান্ ডয়েলের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে ভালো হত।

কৌতূহলী হয়ে বললাম,—আর কি ভালো লাগে তোমার?

—তিনটি বিস্ময়কর আবির্ভাব,—একটি আকাশে, একটি জীবনে, আরেকটি স্টেজে! সহসা একদিন খুব ভোরে জেগে উঠে সমস্ত রাত্রির ঝড়ের পর সূর্যোদয় দেখেছিলাম—তা আজ ভাবলেও আমার আনন্দে হৃৎকম্প হয়। দ্বিতীয়টি—ভোরবেলায় স্নান করে ক্ষৌমবাসে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার বসবাস ঘরে এসে দাঁড়ান,—তুমি তো ধারণা করতে পারবে না ক্ষিতি-দা,—যেন একটি স্তব মানুষের মূর্তি নিয়েছে। আরেকটি দেখছি—আলমগীরের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ি যখন রঙ্গমঞ্চে এসে প্রথম দেখা দেন—কাছাকাছি একদিন আলমগীর দিলে দেখে এসো। ও! তুমি তো আবার থিয়েটারের ওপর চটা। সিনেমার ওপরও?

—নিশ্চয়!

—কেন নিশ্চয়? যাও যাও একদিন চার্লি মারে আর জর্জ সিডনিকে দেখে এস, হেসে-হেসে সুস্থ হবে,—দেশের জন্যে গুণ্ডামিটা ঠাণ্ডা কর দিন কতক। হলিউড স্টুডিয়োর ছবি দেখবে একটা? ডগলাস্ আর পিক্‌ফোর্ড। বল তো, কেমন সুখে আছে ওরা!

হঠাৎ সুবল গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—তুমি নাচ ভালোবাসো?

—ভালুক-নাচ?

—না না, আনা পাভলোভার নাচ। এম্পায়ারে দেখতে গেছলাম সেদিন। সুপার্ব! কিন্তু যাই বল ক্ষিতি-দা, নটীর পুজোর কাছে লাগে না! তুমি দেখ নি তো? তুমি কেন আছ তালে,—খালি মুগুর ভাঁজবে? পাভলোভা মনকে অভিভূত করে বটে, কিন্তু প্রীত করে না, ঠিক হুইটম্যান্-এর কবিতার মতো,—মনে একটি বিষাদশ্রী আনে না। আচ্ছা, তুমি রেস ভালোবাস? আমার কাছ থেকে টিপ্‌স নেবে? এই

যা, তোমাকে একটা জিনিসই দেখানো হয় নি,—এই দেখ, এই পাখার ওপর পাভলোভা তার নাম লিখে দিয়েছে। আমি গেছলাম দেখা করতে গ্র্যাণ্ড হোটেলে।

বললাম,—আজ তো শনিবার, যাবে না বায়স্কোপ ?

হঠাৎ সুবলের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বললে,—সেই তো দুঃখ,—বাবা আর পয়সা দেন না। আজ he who gets slappedটা ছিল, শুনেছি খাসা ফিল্‌ম্‌—আঁদ্রিভ-এর ড্রামা, পড়েছ নিশ্চয়ই; দেখেছ লন্ চ্যানিকে ?—সহস্রানন!—কিন্তু ট্যাঁকে আধলাও নেই একটা। সেদিনকার ফ্ল্যাশ একেবারে ফতুর করে দিয়েছে। জানই তো চার-আনা আট-আনায় আমার পোষায় না। আমাকে দেবে তিনটে টাকা ধার ? বলে হাত পাতলে।

ধমক দিয়ে উঠলাম। সুবল খিলখিল করে হেসে উঠল!

খানিক বাদে মুখ গম্ভীর করে বল্লে,—আজ যদি slumming করতে বেরিয়ে কোনো মজুরের দুঃখ দেখ, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে তিনটে টাকা দিয়ে ফেলে তার দুঃখকে প্রশ্রয় দেবে। কিন্তু, আমি আজ বায়স্কোপ দেখতে পাচ্ছি না, সেটা তোমার কাছে একটা দুঃখই নয়। তুমি ভারী সেণ্টিমেণ্টাল, ক্ষিতি-দা। আজ উপোস করে সমস্ত রাত্রি তোমার মজুর-hero যে কষ্ট পাবে আমি তার চেয়ে ঢের বেশিই কষ্ট পাচ্ছি। মোটে তিনটি টাকা,—দেবে ? আরো যদি দুটো টাকা বেশি দাও, একবার সোডা-ফাউণ্টেনে ঢুঁ মেরে আসি। বলেই আবার হাসি।

উঠছি, সুবল বললে,—সেজদার ঘরে যাচ্ছ ? নিশ্চয়ই কবিতা লিখছে এখন। ওঁকে দেখেছ তো ?

সুবল আবার হাসলে। বললে,—তুমি কাউণ্টি কালেনের কবিতা পড় নি ?

Yet, do I marvel at this curious thing
To make a poet black, and bid him sing!

যাও যাও, সেজদাকে একবার দেখে এস।—বাংলা কাব্যমন্দিরের কালাপাহাড়!

চট করে প্রশ্ন করলাম—ওঁর কি দুঃখ ?

—বাংলা দেশে ওঁর নাম হচ্ছে না,—প্রশংসা-কাঙাল সেজদার এই দুঃখেই কবিতা অপাঠ্য হয়ে উঠছে। বাংলা দেশে এতগুলো যে খিস্তির কাগজ আছে তার একটাও ওঁকে গালাগাল দিয়ে পরোক্ষে ওঁর অধ্যবসায়ের তারিফ করছে না—এ ওঁর অসহ্য। তুমি যাও দেখা করতে, তোমাকে এক্ষুনি ওঁর কবিতার সমালোচনা লিখে দিতে বলবেন। যদি বল অতি রোথো, থার্ড-রেট কবিতা, তবে একমাত্র রেগেই ওঁর passion দেখাবেন। এ-রকম সত্যিই একটা কাণ্ড ঘটে গেছে।

বললাম,—কবিতা শোনবার মতো আমার অস্বাস্থ্য নেই।

—Eggzactly! বল না ওঁকে সে-কথা, থামচে দেবেন। উনি নিজেই এক কাগজ বের করে নিজের কবিতার কুকীর্তি কীর্তন করবেন ঠিক করেছেন—যদি তাতে অন্তত লোকের চোখ পড়ে। সেজদার জন্যে আমার ভারি করুণা হয়, ক্ষিতি-দা! ওঁকে পিঁজরাপোলে কেন পুরে রাখে না? আমায় যদি বায়স্কোপ দেখতে কিছু টাকা দেন, আমি ওঁর কবিতার জন্যে প্রোপাগাণ্ডা করি,—রুপার্ট ব্রুক, ড্রিঙ্কওয়াটার, গিবসন্‌রা যেমন করেছিল—

বেরুচ্ছি, সুবল চেঁচিয়ে বললে—সেজদার আরেক কীর্তি শুনে যাও, ক্ষিতি-দা।

ফিরলাম।

—সেজদা কবিতায় কুস্তি তো করেনই, এমনিও করেন। এগিয়ো না ওঁর কাছে। ওঁকে তৎক্ষণাৎ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে। এখানেই আরেকটু বোস। আমার অটোগ্রাফের খাতাটা দেখে যাও।

বলে এক খাতা বের করলে। ভাবছিলাম বুঝি মহর্ষি বাল্মীকিরও দস্তখত দেখতে পাব। কেন না সুবলের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়!

সুবল বললে—এ সব খুব নিরীহ নগণ্য লোকদের সই—আমাদের উড়ে মালির, ঝাড়ুদারের, দারোয়ানের—

বললাম—ওরা লিখতে জানে নাকি?

—উড়ে মালিটাকে হাত ধরে-ধরে লিখিয়েছি, ঝাড়ুদারটা

আঁকি-বুঁকি দিয়েছে কতকগুলি। এই দেখ, বই-বাঁধানো দপ্তরির, ফোটো-ফ্রেমারের, বাজার-সরকারের, বোতল-বিক্রিওলার,—কার নেই সই? এই একটা ভিখিরির। এ একটা দামী জিনিস বলতে হবে। আর এই দেখ সেজদার, একজন ব্যর্থ বোকা কবির।

হেসে উঠলাম। সুবল বললে,—জীবনে যারা পতিত, পরাজিত—এই কটি আখরের আঁচড়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস জমা করে রেখেছি। তুমিও তো কত গুণ্ডামি করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না।—দেবে তোমার সই?

চুপ করে রইলাম।

সুবল বললে,—একটা কথা ভুল বলেছি। সেজদা যে-খিস্তির কাগজ বার করছেন, তাতে তোমাকেও গাল দিতে পারেন তুমি ওঁর কবিতার সার্টিফিকেট দাও নি বলে',—যদি তোমাকে গাল দেন তবে তুমিও কোনো কাগজে ওঁকে গাল দিয়ে ওঁকে একটু মর্যাদা দিয়ো, ক্ষিতি-দা। এত কষ্ট হয় ওঁর জন্যে।

রুষের জন্য আলাদা ঘর নেই—কিন্তু একটি বাক্স আছে। সেই বাক্স নিয়ে ওর দোকানদারি আর ফুরোয় না—সেই বাক্সই ওর সম্পত্তি, ওর শৈশবকবিতা!

রুষ বলে—আমি কবে বড়ো হব, ক্ষিতি-দা?

হাত দুটো উঁচুতে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠে রুষ বলে—আমি বড়ো হয়ে কবে আকাশ থেকে সূর্য পেড়ে আনব? ঐ মেঘটাকে কেড়ে আনবার জন্য মইর মতো লম্বা হব কবে?

এ-ছাড়া রুষের মুখে আর কোনো কথা নেই।

রুষ সমস্ত বাড়ি মাতিয়ে রেখেছে—রুষ ছাড়া কারো খাবার রোচে না। ভ্রমর রুষকে কাপড় পরিয়ে দেয়, হেনা কানে দেয় ফুল গুঁজে, ফ্লাই দেয় চুল ছেঁটে, সুবল তার অটোগ্রাফের বইয়ে ওর আঁকিবুঁকি সই নেয়, মোটা সেজদা ওকে নিয়ে কবিতা লেখে।

রুষ ছোট সাইকেল চালায়, ছোট থালায় ভাত খায়—আর বড়ো হবার স্বপ্ন দেখে।

আমি থাকি নীচে একতলায়, ঠিক সদর দরজার পাশে। সকলের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে আলাপ করে শুতে-শুতে রাত দুটো বাজে।

এরা সবাই যখন একসঙ্গে থাকে, তখন মনে হয় এদের ঘিরে স্ফূর্তির ফোয়ারা চলেছে, বিলাসের প্রাচুর্য ও আড়ম্বরের কৃত্রিমতার মাঝে এদের দুঃখকে ছোঁয়াই যায় না। মনে হয় না নীরেন চক্রবর্তীর জন্য ভ্রমরের মন একদিনও উচাটন হয়েছিল, মনে হয় না পীযূষকে পাবে না জেনে হেনা কোনোদিন দুঃখের তপশ্চারণের প্রতিজ্ঞা করেছে। একসঙ্গে থাকলে মোটা সেজদাকেও মনে হয় না সে কবিযশভিখারী, মনে হয় বড়ো-বড়ো হাঁ করে ভাত খাওয়াই ওঁর কাজ।

কিন্তু যখন ওরা একা থাকে, তখন যাও ওদের কাছে। ভ্রমর অতীতের একটি ছায়াশীতল দিনের কোলে এখনো ঘুমোয়, হেনার দুই চোখে এখনো অনিশ্চয়তার অন্ধকার, সুধাংশু স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়ে যেতে চায়, মোটা সেজদা কবিতা ভালো লিখতে পারছে না বলে কপাল কোটে। যদি মেশোমশায়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, শুনব হয়তো তিনি ইন্‌সল্‌ভেন্ট্, তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাবে আরো লাখ সাতেক ক্যাপিট্যাল চাই হে।

রাত তখন কটা হবে ?—তিনটা প্রায়। সদর দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। উঠে দরজা খুললাম। যিনি ঢুকতে পারছিলেন না তিনি মেসোমশাইয়ের দাদার তৃতীয় পুত্র,—নাম ললিত।

ছি ছি, সারা গা ঘিনঘিন করছে। ললিতচন্দ্র দস্তুরমতো টলছেন!

ঘৃণার স্বরে বললাম,—এ কি ললিত, ছিঃ! এততেও তোমার লজ্জা নেই ?

ললিত আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—আমার পিঠে কয়েকটা

লাথি মেরেও যদি তার আদ্ধেকের আদ্ধেক টাকা দাও, তা হলে আমি আরো খানিকটা খেয়ে বেহুঁশ হয়ে যেতে পারি। দেবে না? সত্যি ক্ষিতি-দা, আমি বেহুঁশ হয়ে যেতে চাই, থেমে যেতে চাই—

আমার বিছানায় ওকে শুয়ে দিলাম। ললিত জড়িয়ে-জড়িয়ে বলতে লাগল :

I have been faithful to thee Cynara! in my fashion.

বললাম,—তোমার এই দুর্মতি কেন, ললিত?

—দুর্মতির জন্যই দুর্মতি, ক্ষিতি-দা। পিপাসার জন্যে জল খেতে গিয়ে দেখলাম গলায় কে কলসী বেঁধে দিয়েছে।

—আর কোনোদিন খেয়ো না।

—কে? তুমি বলছ, ক্ষিতি-দা? সে এসে বললেও খেতাম, পেছ-পা হতাম না।

—কে সে?

—স্বয়ং Cynara।

ওর চুলে হাত বুলুতে বুলুতে বললাম,—কাকে ভালোবেসেছিলে?

—মোট্টে না। কোথায় সুযোগ ভালোবাসার? ভালোবাসা তো একটা air বই কিছু নয়। আমার উচ্ছন্নে যাবার কোনো ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল ব্যাখ্যা নেই,—আমি এমনি ডুবলাম।

বললাম,—তবে কে এই Cynara?

—চেন না তাকে? যাকে শুধু in fashion-ই পাওয়া যায়।

বললাম,—মিথ্যে কথা।

—একটা সত্য কথা না শুনলে বুঝি তোমার মন ওঠে না,—Cynara আমার ভাবী স্ত্রী, মদ ছাড়বার জন্যে ভালো হয়ে যাবার জন্যে যাকে আমার বিয়ে করতে হবে, যাকে কোনোদিন আমি হারাতে শিখব না। সেই,—আমার অনাগত প্রেমপাত্রী। তার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছি কি না—

—কত উড়োলে?

—বহু;—রেখেই বা কি হত? দারিদ্র্য আর স্বাচ্ছন্দ্য দুইই

আমার কাছে সমান। আচ্ছা, তোমার মনে হয় না ক্ষিতি-দা, সমস্ত সৃষ্টিটাই একটা নিরর্থক আর্ট! মনে হয় না, আমাদের জন্মটা একটা নিদারুণ পাপ,—সমস্ত জীবনটা আমাদের অন্তরীণ-বাস, মুক্তি আমাদের মৃত্যু। মনে হয় না? তুমি তো দেশের মুক্তিকামী,—তুমি তালে মদ খাও না কেন, ক্ষিতি-দা?

বললাম,—তোমাদের মতো মেরুদণ্ড আমার কোমল নয়, ললিত।

ললিত বললে,—ক্ষিতি-দা, তুমি একটা ইডিয়ট।

খানিক বাদে ললিত বললে,—ঘুমোচ্ছ? শুনলে না Cynara কে? জীবনব্যাপারে তোমার কৌতূহল এত কম, ক্ষিতি-দা?

ঘুমোবার ভান করে রইলাম।

ললিত বলতে লাগল: Cynara তো এলেন, রূপ আর বেশের বর্ণনা নাই বা করলাম, এসে যা বলবার বললেন।

—মানে?

—বললেন, ভালোবাসি। আমি কি বললাম, জান?

—না।

—বললাম, দাঁড়াও, কাগজ কলম স্ট্যাম্প আনি,—কণ্ট্র্যাক্ট-ফর্মে সই করতে হবে। ছমাসের জন্য ভালোবাসার কণ্ট্র্যাক্ট, ক্ষিতি-দা।

—ছমাস তো ছিল?

—ছমাসের ছদিন কম।

এ-বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না। এদের নির্জীবতা এদের অস্বাস্থ্যকর ভাবাকুলতা আমাকে অসহ্য পীড়া দিচ্ছে। আমাকে আবার বেরিয়ে পড়তে হবে ঝড়ো হাওয়ার মতো,—আমি পায়রার কোটরে কয়েদ থাকব না।

ভ্রমরের সঙ্গে দেখা। ছেলেকে নিয়ে খুব আদর করছে।

বললাম,—আমি যাচ্ছি, ভ্রমর।

—কোথায় যাচ্ছ?

—আপাতত পথে।

—বা রে, আমরা যেতে দিলে তো!

বললাম,—কাউকেই ধরে রাখতে পার নি, নীরেন চক্রকেও নয়। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিয়ে যাব। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, ভ্রমর।

—আমার আবার মনস্কামনা কি?

—তোমার ইচ্ছা ছিল নীরেন যেন ভদ্র বনে যায়। সে তাই হচ্ছে—আসচে সপ্তাহে তার বিয়ে।

যেন উল্লাসে ভ্রমর বলল,—বল কি! সত্যি?

কিন্তু কথার স্বরে একটা কাতরতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

বললাম,—তোমাকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছে।

ভ্রমর সহসা উদাসীন হয়ে গেছে। বললে,—ভালই তো, কিন্তু কে না কে,—তার বিয়েতে আমি যাব কিসের জন্যে? সে আমার কাছে একটা পথের লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ক্ষিতি-দা, তোমরা তো মেয়েদের খুব ঠাট্টা কর, কিন্তু তোমাদেরই বা সেই আদর্শ-আরাধনা কই, তার জন্যে কঠোর কষ্টভোগ কই? নীরেনের এই অধোগতি আমাকে যে কী অপমান করছে বলতে পারি না।

বললাম,—এ মজা মন্দ নয়। তুমি যে ভারি স্বার্থপরের মতো কথা কইছ, ভ্রমর।

—কিন্তু নীরেনকে আমি এত ছোট কোনোদিন মনে করি নি ক্ষিতি-দা। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তার নিষ্ঠার প্রতি আমার আসক্তি ছিল। ছি ছি!

—ঠিক অমনি তোমাকে সেও ছি ছি করেছে।

—তবু, তবু ক্ষিতি-দা নীরেনকে আমি সত্যি-সত্যি কত বড়ো মনে করতাম! আমার সংসার-জীবনের সমস্ত মাধুর্য যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল আজ। নীরেনের স্মৃতি আমার কাছে আমার সন্তানের মতোই স্নেহাস্পদ ছিল! তুমি আমাকে এ কী শোনালে?

ভ্রমরের দুই চোখ ছলছল করে উঠেছে। করুণ করে বললে,—আমার জীবনে কবিতার একটি কণাও আর রইল না, ক্ষিতি-দা।

নীরেনের বেদনা আমার জীবনে পরমমধুর একটি লাবণ্য বিস্তার করেছিল, আমি আজ একেবারে বিরস, বিগত-সৌরভ, বিফল হয়ে গেছি। কেউ আমার জন্যে মার্টার হয়েছে,—এ ভাবার মধ্যে বেদনা ও স্নেহের সঙ্গে কী প্রকাণ্ড গৌরব ছিল!

ভ্রমর উদাসীনের মতো চুপ করে বসে আছে খাটের বাজুতে কনুই রেখে। ভ্রমরের চোখে জল দেখে মনটা ভিজে উঠল। বেচারা নীরেন!

হেনার ঘরে যেতে-যেতে শুনলাম সুধাংশু আর তার বৌর বাকযুদ্ধ চলেছে। সুধাংশু কেন এবারও পাশ করতে পারল না,—বৌর আপত্তি সেইখানে; বৌ কেন বাইবেলের প্রথম উপদেশ বৎসরে বৎসরে পালন করছে—সুধাংশুর আপত্তি অমানুষিক।

হেনার ঘরে এসে দেখি হেনা ভারি ব্যস্ত হয়ে জিনিসপত্র গুছোচ্ছে। ওর দুই উৎসুক করতলে সেই দিৎসা, সেই চঞ্চল স্নেহাকুলতা!

বললাম,—এত তাড়াহুড়ো কিসের, হেনা?

হেনা বললে,—আমি রংপুরে যাচ্ছি ক্ষিতি-দা, এক হপ্তার মধ্যেই। আমাকে সেই মাস্টারিটা নিতেই হল।

—কেন? তোমার বিয়ে?

—সে আর হচ্ছে না। তুমি বুঝি শোননি কিছু? পীযূষের টি বি···

হেনা যেন বলতে বলতে নিজেই শিউরে উঠছে!

বললাম,—বল কি?

—তুমি তার চেহারা দেখলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে, ক্ষিতি-দা, —একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমাদের মিলনের মাঝে মৃত্যুকে দেখলাম। মৃত্যুর নিশ্বাসে প্রেম যদি পুড়ে যায়,—আমি যদি আবার কোনদিন পীযূষকে ভুলে যাই,—সে কী মারাত্মক ট্র্যাজেডি।

—তুমি তাকে ফেলে মাস্টারি করতে যাবে?

—সে-ই তো আমাকে ফেলে যাচ্ছে। মৃত্যুটা হয়তো তত শোচনীয় নয় ক্ষিতি-দা, মৃত্যুর পরে বিস্মৃতিটা যেমন। আর তাকে মনে রাখব

না, তাকে ভুলে যাব, আবার তেমনি সময়ের চাকা গড়িয়ে চলবে—আমার জীবনের সেই দুর্দিনের চেহারা ভেবে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেছি। আমাকে সারা জীবন যুদ্ধ করতে হবে, অথচ পরাস্ত হবার গৌরবটুকুও আমার রইল না।

হেনা ললাটের ঘাম মুছবার ছলে চোখের জল মুছে ফের বললে,—আমি তো বর্তমান শক্তির তৌলে ভবিষ্যতের জরার পরিমাপ করতে পারছি না, তাই হয়তো কোনোদিন অবশ্যম্ভাবী ঘটনার কাছে আমার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে—এটুকু দূরদর্শী হতে গেলেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হয়ে আসে। আমার অতীতকাল ম্লানমুখে প্রার্থীর মতো চেয়ে থাকে। অতীতের প্রতি সেই অবমাননা কি নিদারুণ, ক্ষিতি-দা!

বললাম—আশায় একেবারে দেউলে হয়ে গিয়ে লাভ নেই, হেনা।

হেনা কি ভেবে খানিকবাদে বলে উঠল: আশা করব, না? তা হলে রংপুরের পোস্টটা না নিলাম, কি বল? পুরী-ই যাই তা হলে। প্রাণপণ দেখি না চেষ্টা করে সে বাঁচে কি না! তবে রইল রংপুর।

বলে হেনা সব জিনিস-পত্র ওলোট পালোট করতে লাগল।

হঠাৎ বললে,—প্রেমের মাঝে মৃত্যুর আবির্ভাব,—একটা এপিক লিখবার বিষয়, না ক্ষিতি-দা? যদি লিখে উঠতে না পারি নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করব! আশা—আশা!

স্থবলের ঘরে এসে দেখি দরজায় একটা পিজবোর্ড টাঙানো,—তাতে লেখা: To Let।

কি ব্যাপার? বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে স্থবল নাকি বাড়ি ছেড়েছে। ও জাহাজের খালাসি হবে, এঞ্জিন-ড্রাইভার হবে, কলের কুলি হবে—তাও স্বীকার, ওর পয়সা চাই, বসে বসে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ করবার মতো আলস্যকে ও বরদাস্ত করে না,—ও খেটে পয়সা কামাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

ওকে যেন কেউ না খোঁজে,—দৈনিক কাগজে যেন বিজ্ঞাপন না দেয়।

তারপর একদিন—সেই দিনের ঘটনাটা বলেই পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেনের তেতলা বাড়ির ওপর যবনিকা টানব।

তারপর একদিন—তেতালার ছাদের ওপর দিয়ে একটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল, রুষ গেল হাত বাড়িয়ে ধরতে।

রুষ পলকের মধ্যে তেতালার ছাদ থেকে পড়ে গেল বাড়ির সিমেণ্ট-করা উঠোনের ওপর। মাঝের ফাঁকটা রুষকে ধরে রাখতে পারেনি, অদম্য রুষের গতি,—উঠোনই ওকে আশ্রয় দিলে। স্তব্ধ রুষ, রক্তাক্ত রুষ!

সমস্ত অরণ্যে আগুন লেগেছে; প্রকাণ্ড জাহাজ রাত্রির ঝঞ্ঝাবিদীর্ণ অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় ডুবছে; একটা আগ্নেয়গিরি যেন মুহূর্তমধ্যে মরীয়া হয়ে উঠল।

চিরকালের জন্য রুষ থেমে গেছে—এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে বোধগম্য, এর চেয়ে অপ্রতিরোধ্য আর কি আছে পৃথিবীতে?

নীরেন বিয়ে করছে বলে ভ্রমরের আর তিলার্ধ দুঃখ নেই, পীযূষের আসন্ন তিরোধানের অন্ধকার হেনার চক্ষু থেকে মুছে গেছে। Cynara বলে যে কেউ ছিল ললিত তা আজ মনে করতে পারছে না, মোটা সেজদা পর্যন্ত ভাবছে—শিশুর মৃত্যুর অন্ধকার সমুদ্রের মতোই বিশালবিস্তৃত—কবিতার সঙ্কীর্ণ আয়তনে তার স্থান নেই। সুবল হয় তো ভাবছে রুষের যাত্রা কত সুদূর-অভিমুখে, এভারেস্ট ছাড়িয়ে, কামস্কাটকা ছাড়িয়ে! সুধাংশু ভাবছে—হোক সে ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু তার সব কটি সন্তানই যেন বেঁচে থাকে।

সমস্ত বাড়ির ভিত্তি নড়ে উঠেছে,—যুদ্ধে সমস্ত দেশ যেন উজাড় হয়ে গেল। নির্জন রাত্রির কল্পনামণ্ডিত ছোট-খাটো সমস্ত দুঃখ শোকবন্যায় ভেসে চলেছে—মানুষের স্নেহবন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের আশা কত ক্ষীণায়ু, মানুষের প্রতীক্ষা কি বিশ্বাসঘাতক!

শুধু আমিই বিচলিত হইনি। শুধু আমিই বলতে পারলাম: মাসিমা, রুষকে এবার ছাড়ুন, ওকে এবার নিয়ে যেতে হবে।

ধন্বন্তরি

ছোট ছেঁড়া র‍্যাপারখানি কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে আসে। শীতটা খুব জোরেই পড়েছে।

ঘরে ঢুকতেই নেপালি চাকরটার সঙ্গে দেখা, ঘর সাফ করছিল। মুখটা অনেকদিন থেকে পরিচিত, পাষাণের মতো নির্বিকার। ঐ উদাসীন মুখটার দিকে চাইলেই ওর ভয় হয়।

তবু, অকারণে বিনীত হয়েই বলে,—ডাক্তারবাবু আছেন?

যেন কত অপরাধী! ঐ নেপালী চাকরটার সুস্থ দৃঢ় বিস্তৃত বুকটার পাশে ওর শীর্ণ কঙ্কালটা যেন ব্যঙ্গ করে ওঠে। নিজেকে এত অনর্থক মনে হয়!

চাকর বেশ বিরক্ত হয়েই বলে,—সাব সাড়ে আটটার আগে তো কোনোদিনই নামেন না।

জানা কথা। তবু একটি নিদ্রাহীন দীর্ঘ রজনী কাটাতেই যেন কত যুগ কেটে গেছে। অপরিসীম ক্লান্তি।

নির্দিষ্ট বেঞ্চিটাতে বসে। অনেকক্ষণ। পাশের বাড়ির পাঁচিল টপকে বারান্দার টবের কি-একটা শিশু গাছের নবোদ্গত পাতায় আঙুল বুলিয়ে রৌদ্র ডাক্তারের ঘরে আসে। কত প্রফুল্ল, কত বাঞ্ছনীয়!

খবরের কাগজওলা দিনের কাগজ রেখে যায়,—দু-তিন রকম। ও হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ও না। সব বিস্বাদ লাগে। চীনে মারামারি,—তাতে ওর কি? ও কান পেতে ডাক্তারের জুতোর শব্দের জন্য

প্রতীক্ষা করে। ভাবে, সমস্ত চীন যদি তুবড়ির মতো একদিন ফেঁসে যায়, যাক—আর ও যদি আরেকবার বেঁচে ওঠে! কিই-বা হবে বেঁচে ?—তাও মাঝে মাঝে ভাবে।

চাকরটার দারুণ বিরক্তি লাগছিল নিশ্চয়। এক সময় উপরে উঠে গেল।

পর্দাটা একটু সরিয়ে বললে,—বাবু, সেই লোকটা। অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।

—জ্বালালে! যা, যাচ্ছি। ননসেন্স।

রমার কিন্তু স্বামীর এই আকস্মিক ঘৃণার কারণ জানবার এতটুকুও কৌতূহল হল না। কি নিয়ে যেন দুজনে একটা বচসা হচ্ছিল,—তার স্রোতকে আরো মুখর করে দিয়ে বললে,—এটা আমার চাই-ই, তুমি ঠাকুরঝিকে আর একটা কিনে দাও গে,—আরো দামী, আরো মজবুত—

ডাক্তার জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে বললে,—দুবার করে খরচ করবার মতো আমার পয়সা নেই।

—আলবত আছে। নইলে আজ কক্ষনো—। যে-হাতে মড়া কাট সে-হাত দিয়ে ছুঁতেও দেব না আমাকে। শোন, যাচ্ছ যে বেরিয়ে, বায়স্কোপে যেতে হবে আজ। আমার আরো একজোড়া ব্রেসলেট চাই-ই।

ডাক্তার বললে,—আর একজোড়া নাকছবি ?

হঠাৎ রমা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বললে,—আর একজোড়া—

নেপালি চাকরটার আবার অভ্যুদয় হয়। বলে,—লোকটা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বলে, আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার জুতো মসমসিয়ে নামে। রমা চেঁচিয়ে ওঠে: রাস্তায়-রাস্তায় রোদ্দুরে না ঘুরে চট করে চলে এস,—ঢের কথা আছে। পরে চাকরটাকে ধমকায়: রুগীর আবার আপিস কি রে ? যাক না আপিসে, কে ধরে রাখছে ? আপিসে যাবার গাড়ি চাই না ?

ডাক্তারের প্রথম সম্ভাষণ: আমার ভিজিট কই ? তিন-দিনেরটা জমে গেছে। দিয়ে দিন এবার।

রেবতী পাংশুমুখে বললে,—মাইনে তো এখনো পাইনি। মাসের মোটে সতেরো দিন আজ।

ডাক্তার বললে—রোগ চোদ্দ দিন ছেড়ে চোদ্দ বছর অপেক্ষা করতে পারে, আমরা পারি না। দিন। তা ছাড়া ইনজেকশনগুলোর দাম দিতে হবে একস্ট্রা—

—কিছুই তো নেই—

ডাক্তার বললে,—নাচার! আমাদের ব্যবসা চলে কি করে তা হলে বলুন?

অতিশয় সত্য কথা।—তোমার সামান্য ব্যবসার থেকে আমার জীবনের দাম ঢের বেশি,—এ অত্যন্ত বাজে যুক্তি। নিরুপায় নিঃসহায় ভাবে রেবতী চেয়ে থাকে।

তবু বলে,—কিন্তু কাল রাত্রে যন্ত্রণাটা বড্ড বেড়েছিল।

কথাটা নিতান্ত খাপছাড়া শোনায়।

ডাক্তার সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলে,—কিন্তু পেটের যন্ত্রণা বলে আমাদেরও একটা ব্যায়রাম থাকতে পারে। পয়সা যখন কুলোয় না, হাসপাতালে গেলেই তো পারেন—

রেবতী বলে,—কিন্তু আপিস। চোদ্দ দিন ফুরুলে কয়েকটা টাকার আশা।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বলে,—বটে! অত বাবুগিরি করলে কি করে চলে? এই ইস্‌মাইল—

ইসমাইল মোটরে স্টার্ট দেয়।

গাড়িতে উঠে ডাক্তার উপদেশ দেয়,—বিনি পয়সায় বলেই হয় তো: অন্যায় করলে শাস্তিভোগ করতেই হবে। বলেছিলেন, পনেরো দিন বাদেই সব চুকিয়ে দেবেন,—আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ভুল হয়েছিল। —এই, চালাও।

টাকার জোগাড় হয়। কেমন করে হয়,—কি কাজ ডাক্তারের জেনে?

টাকায় সাড়ে তিন আনা সুদ—কাবলিওয়ালা বাঁচিয়েছে। মনে-মনে বিধাতাকে রেবতী প্রণাম করে। কাবলিওয়ালার কর্কশ নিষ্ঠুর বুকের অন্তরালে বসে বিধাতা ওকে অভয় দেন। একবার তো ভালো হোক, —আপিস তো আছেই, দুবেলা ছেলে পড়াবে,—বাড়তি সময়ে মোট বইতেও নারাজ নয়। নিজের ক্লান্তকাতর দেহটার দিকে একবার তাকায়।

একরকম ছুটেই চলে।

দরজার কাছেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা,—বেরুচ্ছিল হয়তো। অদূরে একটি মেয়ে,—ভালো দেখা গেল না, রেবতীকে দেখেই সরে গেছে।

রেবতী হাঁপ নিয়ে বললে, টাকাটা এনেছিলাম।

ডাক্তার অত্যন্ত কটুকণ্ঠে জবাব দিল : এই কি দেখা করবার সময় নাকি ? জানেন না ? আপনাদের নাড়ী টেপা ছাড়া আমাদের কি আর কাজ নেই ?

তবু না বলে পারে না : ভারি যন্ত্রণা হচ্ছে, অসহ্য !

—কাল সকালে আসবেন।

ডাক্তার হাত নাড়া দিয়ে চলে যেতে বলে। তবু রেবতী খানিকক্ষণ অন্যমনস্কের মতো প্রতীক্ষা করে।

ভিক্ষুকই তো বটে। ডাক্তারের কাছে ভিক্ষা করতে এসেছিল এক মুঠো ভাত, দুটি নিদ্রাক্রান্ত দীর্ঘ সুমধুর রাত্রি,—কয়েকটি সহজ নিশ্চিন্ত নিশ্বাস।

আবার চলতে শুরু করে। জুতোর গোড়ালিতে একটা লোহা ক্ষুধার্ত দাঁত দিয়ে ওর বাঁ পা-টা ক্ষতাক্ত করে দিচ্ছিল। ফুটপাতের ওপর বসে জুতোটা খুলে ফেলে একটা ইট দিয়ে রেবতী লোলুপ লোহাটাকে ঠুকতে লাগল।

শীতের দুপুরে রাস্তায় স্বভাবতই ধুলো জমে। তার ওপর একটা মোটর যদি হুঙ্কার দিয়ে চলে যায়,—দিগ্বিদিকে ধুলোর ঝড় উঠবেই। অভিযোগ করবার কি আছে ?

তবু রেবতীর মনে হয়,—সামান্য একটা মোটর পর্যন্ত ওর বিরুদ্ধে চীৎকার করে উঠেছে,—নেই, নেই, বাঁচবার অধিকার নেই তোমার—

উদ্ধত লৌহাগ্রকে বশীভূত করা যায় না।

একটা পড়ো জমিতে কতকগুলি হিন্দুস্থানী মেথর জড় হয়ে হল্লা করছিল। কেউ বাজাচ্ছে ঢোল,—কেউ করতাল। কারো গলায় গাঁদাফুলের মালা,—কারো কাঠগোলাপের। নেচে হেসে চেঁচিয়ে পাড়াটাকে মাত করে তুলেছে। এপারের বস্তির বারান্দায় কতগুলি নোংরা মেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই নৃত্য ও সঙ্গীত সম্ভোগ করছে।

রেবতী এক পাশে বসে পড়ল। কোথা থেকে একটা ঘেয়ো কুকুর হাঁচতে হাঁচতে ওরই কাছটিতে এসে বসেছে। রেবতী এই গানের একটি বর্ণও বোঝে না,—পথের অন্য লোকেরা বধির উদাসীনের মতো চলে যায়, কেউ কেউ বা বিরক্ত হয়,—তবু রেবতী তন্ময় হয়ে এই আনন্দহিল্লোল দেখে, ওর হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণ রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়। মনে হয় ও-ও যেন এই সঙ্গে হঠাৎ পা ফেলে নেচে উঠবে। এমনি অকারণ আনন্দে চীৎকার করে উঠবে।

হঠাৎ পাশের রুগ্ন বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কুকুরটাকে অসহ্য লাগে। মনে হয় ও যেন এই আনন্দোৎসবকে ব্যঙ্গ করছে। একটা ঢিল কুড়িয়ে কুকুরটাকে ছুঁড়ে মারে,—কুকুরটা গোঙাতে-গোঙাতে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে বসে,—যেন বেশি দূর হাঁটতে পারবে না আর।

যত দোষ কুকুরটারই! রেবতীর নিজের মনে হয়, ওর শরীরে আর কোন যন্ত্রণা নেই, জুতোর কাঁটাটা তো অদৃশ্য হয়েছে। ও খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে, চোখ মেললেই ও দেখতে পাবে ওর পঙ্গু কুঁজো দেহটা দীর্ঘায়তন, সবল ও সতেজ হয়ে উঠেছে, মনে এসেছে অগাধ সাধ, দুটো হাতে বিপুল কর্মপ্রবণতা, দুটো পায়ে অনন্ত পথপ্রেম!

চোখ খুলেই দেখে সামনের খেজুর গাছটার আড়ালে একটি তারা কাঁপছে। বেশ লাগে দেখতে! কখন যে উৎসব থেমে গেছে, সভা ভেঙে কখন যে সবাই বিদায় নিয়েছে, রেবতীর খেয়াল নেই। দূরে ট্রাম-লাইন থেকে থেকে-থেকে চাকার অস্পষ্ট আর্তনাদ ভেসে আসছিল। কুকুরটাও চলে গেছে।

রেবতীও উঠল।

পাখির নীড়—

আকারে ছোট হলেও এ উপমা চলে না।—একটা গর্ত—যেমনি স্যাতসেঁতে এঁদো তেমনি অন্ধকার। একটা একতলা বাড়ির একটি ফালি,—ঘর মোটে একটিই, এক পাশে শোয়া, শুয়ে-শুয়েই খুন্তি নেড়ে শাক-চচ্চড়ি রাঁধা যায়।

একটি ভাঙা তক্তপোশ, একটি ভাঙা লণ্ঠন, একটি ছেঁড়া ছাতি—

দুখানি কাপড়, দুটো থালা, দুটি বালিস—

আর প্রাণী তিনটি। স্বামী স্ত্রী ও তাদের একটি প্রতিনিধি। তাদের কামনার, তাদের প্রেমের, তাদের ব্যর্থতার।

কুপিটা জ্বালানো হয়নি। গলির গ্যাসের আলো যেটুকু এসেছে, তাই! রেবতী ঘরে ঢুকে জুতোটা খুলে তক্তপোশটার ওপর বসল।

শিপ্রা বললে,—খোকার জ্বর খুব বেড়ে গেছে। তোমাকেই এক্ষুনিই আবার বেরুতে হবে,—যে করে হোক একটা ডাক্তার আনতেই হবে। একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে,—টুঁ শব্দটি নেই। শুনছ?

অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে বলে রেবতী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে হাঁপ নেয় একটু। মুখে কোনো কথা আসে না, চুপ করে থাকে।

শিপ্রা আবার বললে,—হাতে-পায়ে ধরে যেমন করে হোক কাউকে আনা চাই-ই। বাছা আমার এতক্ষণ কি রকম ছটফট করছিল। যাও, ওঠ—

তবু রেবতীর হুঁশ নেই। কান পেতে কি যেন শোনে—

বাসর-রাত্রে ও ওর স্ত্রীর নাম রেখেছিল শিপ্রা। না-জানি কোন কবির কবিতায় এই নদীটির কথা পড়ে ও মুগ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হয়েছিল তখন একটি ভীতু কিশোরী তার প্রথম অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে ওর পানে দুটি অর্থহীন ও অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য প্রসারিত করে ধরেছিল। অর্ধস্ফুটযৌবনা পার্শ্ববর্তিনী প্রেয়সীর দেহে ও যেন কোন নদীর অতিমধুর কলগুঞ্জন শুনতে পেয়েছিল: আমার কাছে তুমি শিপ্রা! আর সবাইর কাছে যাই কেন না হও—

শিপ্রা এবার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে: বাপ হয়ে ছেলেটাকে

এমনি অচিকিৎসায় মারবে নাকি ? ছেলেকে পথ্য দিতে পারবে না তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?

রেবতী নিঃশব্দে উঠে পড়ে। ছেঁড়া ছোট র‍্যাপারটি কোনো রকমে গায়ে জড়িয়ে নেয়, জুতো আর পায়ে দেয় না। আস্তে বেরিয়ে পড়ে।

শিপ্রা ফের বলে,—শিগগির ফিরো, কেমন করছে খোকা।

রেবতী যেন কেউ নয়,—ওকে একবার জিজ্ঞাসাও করে না,—কেমন আছ ? ছেলেই সব। এর চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই শিপ্রার কাছে।

তবু রেবতী একরকম দৌড়েই চলে। মাঝে-মাঝে দুটো হাঁটুতে দু হাতের ভর রেখে পথের মধ্যেই হাঁপায়। ভাবে,—আমি শিপ্রার কেউ নই, শিপ্রারও না।

শ্বশুরের পয়সাতেই ডিসপেনসারি, ল্যাবরেটরি—সব কিছু সরঞ্জাম। বাড়িখানা পর্যন্ত। দুটো চাকর, একটা বেয়ারা, দুটো কম্পাউণ্ডার—সবই শ্বশুরের দৌলতে। মোটরখানাও।

রমা পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বলছিল,—একদিন এস পাত্তাড়ি গুটোই। দরজা জানালা সব বন্ধ করে কাউকে না-বলে-কয়ে এস একদিন টুপ করে বেরিয়ে পড়ি। কি হবে এই সব মাথা মুণ্ডু করে ?

ডাক্তার রমার দুটি স্বচ্ছ ও চঞ্চল চোখের পানে চেয়ে বললে—কোথায় যাবে ?

যেখানে কেউ যায় না, এমনি একটা গণ্ডগ্রামে। যেখানে সব গণ্ডমূর্খের বাস। যাবে ? চল না,—

ডাক্তার বলে,—তুমি খুব ফাজিল হয়েছ।

রমা ঘাড় দুলিয়ে বললে, যেতেই হবে কোথাও। আচ্ছা, বল সিমলে—

—এই শীতে ?

—হ্যাঁ, তাই তো মজা। আচ্ছা একবার নিউজেলাণ্ডে যাবে ? না না, ঠাট্টা না, সত্যিই সুইজারল্যাণ্ড-এ গেলে ভারি চমৎকার হয়।

সমুদ্র-গামিনী হতে আমার এত ইচ্ছা করে। আমাকে কে একজন বলতেন, আমার চোখে নাকি তুই অগাধ নীল সমুদ্র দেখা যায়। সত্যি? তুমি কি দেখতে পাও বলবে?—যাক সে কথা, সত্যি কোথাও চল।

ডাক্তার বললে,—তোমার মতো লক্ষ্মীছাড়া হলে তো আমার চলবে না।

রমা হেসে ঢলে পড়ে বললে,—লক্ষ্মীছাড়া হতেই দেব না তোমাকে। অঞ্চলে বেঁধে রাখব।

যথাসম্ভব মুখ গম্ভীর করে ডাক্তার বললে,—আমার অনেক কাজ। তুমি মেয়েমানুষ, কি বুঝবে?

ঠোঁট কুঞ্চিত করে রমা বললে,—বটে? কতগুলো নিরীহ নিরপরাধ প্রাণীকে অকারণে যমের বাড়ি পাঠানো। এ-বাড়িতে একটি কৈকেয়ী থাকত! তোমার সঙ্গে সঙ্গে তা হলে আমি পরম সতীর মতো বনবাসে যেতাম। মোটরটাকেও নিয়ে যেতাম অবিশ্যি।

নেপালি চাকরটা পর্দার ওপার থেকে ডাক দেয়।

ডাক্তার বলে,—চললাম নিচে। তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করার বাড়তি সময় আমার নেই।

টুপিটা মাথায় দিয়ে গটগট করে নেমে যায়। রমার দুটি গাঢ় গভীর চোখে ক্ষণেকের জন্য একটি মন্থর মেঘ ভেসে আসে। টেবিল পরিষ্কার করে,—পরে একটু চিঠিপত্র নিয়ে বসে,—রান্নাঘরে গিয়ে হিন্দুস্থানি ঠাকুরটার সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে একটু বচসা করে,—একটা বই নিয়ে ইজিচেয়ারে শোয়,—

অনন্ত অবকাশ,—স্তব্ধ হয়ে একটি মুহূর্ত কাটালেই ওর মনে হয়। কিন্তু মোটেই চুপ করে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না। নিজে স্টোভ ধরিয়ে কিছু একটা রাঁধতে বসে। মনগড়া নানান রকম খাবার তৈরি করে,—স্বামীকে অবাক করে দেবে।

স্বামী হয়তো বলবেন, বেড়ে হয়েছে তো! এ অদ্ভুত খাবার কোত্থেকে এল?

ও বলবে—আকাশ থেকে।

স্বামী খেতে-খেতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন,—তুমি বুঝি ফের রান্নাঘরে ঢুকেছিলে? তোমাকে—কতবার বলব কয়লার ধোঁয়ায় তোমার চোখ আরো খারাপ হয়ে যাবে। চোখ দুটো গেলে খেয়ে ফেলতে চাও নাকি?

ও বলবে,—মোটেই না। কিন্তু খুব গাঢ় নীল আকাশ বা ভীষণ গাঢ় নীল সমুদ্র না দেখলে আমার চোখ কিছুতেই ভালো হবে না। খালি-খালি তোমার ঘরের চারিদিকের এই অসভ্য যন্ত্রপাতিগুলো দেখে-দেখে আমার চোখ ক্ষয়ে গেল।

স্বামী গম্ভীর হয়ে বলবেন,—এ তোমার অত্যন্ত অন্যায়, রমা। তুমি দিন-কে-দিন বড্ড অবাধ্য হচ্ছ।

বলে তিনি রাগ করে খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়বেন।

রমার তা খুব ভালো লাগবে। ছুটে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলবে—তোমার জন্যে রাঁধলে কখনই আমার চোখ নষ্ট হবে না। আর, তোমাকে সেবা করে যদি অন্ধই হই—

বলে ও ওর ভীরু বাঁ চোখটি স্বামীর ঠোঁটের কাছে রাখবে।

স্বামী তা গ্রাহ্যও করবে না। ওকে ঠেলে দিয়ে আঁচিয়ে নিচে চলে যাবেন।

রমার আরো ভালো লাগবে। কাজকর্মের মধ্যে স্বামী একবারও অন্তঃপুরে এসে তাঁর অবকাশরঞ্জিনীর সঙ্গে মধুরালাপ করবেন না। এক গ্লাশ জলের দরকার হলে চাকরকেই ডাকবেন,—ওপর থেকে চেঁচিয়ে নিজে ঠাকুরকে তাড়া দেবেন শিগগির রান্না করতে। খেয়ে-দেয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বেন, নিজেই মশারি ফেলবেন। সংসারে তাঁর যেন কেউ নেই,—কেবল ঠাকুর আর চাকর।

রমাও রাগ করে থাকবে। খাবে না, চুল বাঁধবে না,—ঠাকুর জিগগেস করতে এলে বলবে—খিদে নেই। জীবনে যা কোনোদিন বলে নি। মশারি তুলে আগের মতো সন্তর্পণে স্বামীর পাশে শুতে যাবে না, ইজিচেয়ারটা দক্ষিণের বারান্দায় টেনে এনে চুপ করে শুয়ে থাকবে।

ঘরে বাতিটা জ্বলতেই থাকবে। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে দেখে স্বামী

বিরক্ত হয়ে এক সময় উঠে আলোটা নিবিয়ে দেবেন। ওকে বারান্দায় ঠাণ্ডায় পড়ে থাকতে দেখে একবারও ঘরে গিয়ে শুতে বলবেন না। তেমনি লেপের নিচে গিয়ে শোবেন, একাই।

রমা চোখ বুজে পড়ে থাকবে। তাই বেশ।

ওর স্বামীর সঙ্গে এমনি ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে। দৈনন্দিন ভালোবাসার একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না।

যেমন-কে-তেমন—সেই লোকটা আছেই। অপয়া, অনামুখো। দেখেই ডাক্তারের সমস্ত গা রি-রি করে উঠল।

কোনো কিছু ভূমিকা না করেই হাঁকলে : এবারে দিয়ে দিন টাকাটা—

রেবতী মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল, ঠোঁট দুটো বারকয়েক চেটে ভিজিয়ে নিয়ে বললে—টাকাটা খরচ হয়ে গেছে।

ডাক্তার বললে—তবে অন্যত্র দেখুন। আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

বেঞ্চিতে অন্য একটি রুগী বসে ছিল, গৌরবর্ণ—কিন্তু সমস্ত গায়ে বীভৎস একটা বিবর্ণতা এসেছে। তার দিকে চেয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলে—কদ্দিন ভুগছেন ?

রেবতী তেমনি দাঁড়িয়েই ছিল। নবাগত রুগীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর সারা হয়ে গেল। দরে বনল না দেখে রুগীটি চলে গেল। দুটো ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে এসেছিল তা হয়তো ভুলে ফেলে গেছে।

ডাক্তার রেবতীকে বললে—আপনিও পথ দেখুন।

রেবতী বললে—ছেলেটা রাত্রে হঠাৎ হাত-পা নীল হয়ে মারা গেল। আপনাকে দেব বলে যা জোগাড় করেছিলাম সব সেই রাত্রেই ডাক্তারের পিছে ফুরিয়ে গেল।

ডাক্তার এতেও বিচলিত হয় না। বলে,—সেই ডাক্তারের কাছেই যান। এখানে জোচ্চোরদের জায়গা হবে না।

রেবতী তবু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে সেই ছেঁড়া ছোট র‍্যাপারের তলা থেকে শীর্ণ একখানি হাত ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে,—আপনার কাছে একটি ভিক্ষা চাই—

ডাক্তার টেবিলের খবরের কাগজের ওপর চোখ রেখেই বলে,—এখেনে ভিক্ষে-টিক্ষে মেলে না, মশায় !

রেবতী বলে,—আমাকে এমন একটা সহজ ওষুধ দিতে পারেন যা সন্ধ্যাবেলা খেয়ে শুলে সকালবেলা আর ঘুম থেকে উঠতে হয় না? লোকে কেমন করে ট্রেনের তলায় বুক পেতে মরে আমি তা ভাবতে পারি না। ভয়ানক ভাবে আত্মহত্যা করতে আমার ভারি ভয় করে। বেশ আরামে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। তেমনি একটা ওষুধ আমাকে দেবেন, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার এবার রেবতীর মুখের দিকে তাকায়, বলে—আপনি পাগল হয়েছেন ?

স্বরটা যেন তত রুক্ষ নয়।

রেবতী বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ে। বলে, মোটকথা, মরতে আমি চাই না হয়তো। কিন্তু বাঁচবারও অধিকার নিশ্চয় নেই। তবু এমনি এই অসুখ নিয়েও এই শোক ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে ভালো লাগে। কিন্তু কত দিন ? সবাইরই তো একটা সমাপ্তি চাই।—আপনাকে খুব বিরক্তি করছি। যাচ্ছি এখুনি, কিন্তু একটা কিছু ওষুধ দেবেন ?

ডাক্তার নিরুত্তর। রেবতী দরজার দিকে পা বাড়ায়।

পরে হঠাৎ ফিরে এসে বলে,—আচ্ছা আপনি আমাকে ভালো করতে পারেন না? দেখুন না একবার চেষ্টা করে? জগতে এর চেয়ে আর বড় কীর্তি কী আছে? একজন আপনার কাছ থেকে জীবন ভিক্ষা করে চেয়ে নিল—আপনি তা পরম গৌরবে দান করলেন। আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো। পারেন না ভালো করতে? সংসারে কত অল্পই চাই আমরা—শুধু টিকে থাকার, শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নেবার সহজ ও সাধারণ আনন্দটুকু। দিনের পর রাত, আবার রাতের পর দিন—ঘুমোবার রাত আর খাটবার দিন,—এর বেশি আর কিছুই চাই না—আমাকে ভালো করা সত্যিই কি যায় না, ডাক্তারবাবু?

রেবতী পথে নেমে পড়ে। ডাক্তার কি ভেবে ওকে ডাকে। পরে নেপালি চাকরটাকে জল গরম করতে হুকুম দেয়, আরো নানা ফরমাজ করে। দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যেতে বলে।

রেবতীর চিকিৎসা চলে।

রেবতী বিদায় নেয়। ডাক্তারই বলে,—কালকে আবার আসবেন। ভয় করবেন না, ভালো হয়ে যাবেন।

রেবতী প্রফুল্লমুখে ডাক্তারেব দিকে তাকায়। এই একটি কথায় ও বুকের মধ্যে প্রকাণ্ড বল পায়, মুহূর্তের জন্যে রৌদ্রের প্রখরতাটি পর্যন্ত ভালো লাগে। এমন ভাবে চলতে চেষ্টা করে যেন ওর কিছুই হয় নি।

ঘরে ফিরে এসে শোকাকুলা শিপ্রার মাথার কাছে বসে একটু। শিপ্রা দিনরাত ছেলের জন্যে অশ্রুবিসর্জন করছে। রেবতী একসময় ওর একখানি হাত শিপ্রার মাথার ওপর রাখল—একটি শীতল শিথিল স্পর্শ। কোনো সান্ত্বনার কথা মুখে আসে না, চুপ করে বসে ঘরের চারপাশের ঝুলগুলি দেখে আর ভাবে। মৃত ছেলের কথাই নয়—একদিন ও আবার ভালো হবে, একদিন শিপ্রার দুই চোখ জলভারে এমনি মলিন থাকবে না—

মেটে মেঝের ওপর বুকটা পেতে শিপ্রা কাঁদতেই থাকে। রেবতী উঠে আফিসে যাবার জন্য তৈরী হয়।

রেবতী বিদায় নিলে ডাক্তার খানিকক্ষণ সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে বিমনা হয়ে বসে রইল। পরে নেপালি চাকরটাকে ডাকিয়ে কতকগুলি বই পেড়ে কতক্ষণ পাতা উল্টোল, একটু পড়লও বুঝি। পরে বললে,—এই, ইসমাইলকে বল তো বেরুব।

ডাক্তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য ব্যাপার। রমা চাকরকে ডেকে বললে,—বলিস কি রে, বাবু বেরিয়ে গেছে?

এমন কাণ্ড ঘটে নি কোনদিন। এর আগে সূর্যের পশ্চিমে ওঠা

উচিত ছিল। এই বেলায় ডাক্তারের বেরিয়ে যাওয়াটা রমার কাছে যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি যেন কতকটা অপমানসূচক। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের কৃত্রিম কোপস্ফুরিত ঠোঁটের পানে চেয়ে ভাবলে—সত্যিই রাগ করব আজ।

সাহেব-ডাক্তারকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। বাঙালি ডাক্তার বললে, —তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। একটা সিরিয়াস কেস এসেছে হাতে।

দুজনে খানিকক্ষণ পরামর্শ হয়। সাহেব-ডাক্তার বাঙালি ডাক্তারকে দুই একটা নতুন ওষুধ বাতলে দেয় হয়তো।

বাড়ি ফিরে ডাক্তার তখুনিই রমার দুখানি করপল্লব স্পর্শ করবার অভিলাষে উন্মুখ হয়ে অন্তঃপুরে ছোটে না। ল্যাবোরেটরিতে বসে কি খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে। ওর কেবলই মনে হয়,—দুখানি ব্যাধিজীর্ণ দুর্বল হাত ওর দিকে কে প্রসারিত করে দিয়েছে, ঘোলাটে দুই চোখে কি বিবর্ণ বেদনা, ওকে বলছে: আপনার কাছে আমি আমার জীবন ভিক্ষা করছি,—আপনি বিধাতার চেয়েও বড়ো!

অনেকক্ষণ বসে পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় না।

তার পরে খুব আস্তে-আস্তে সিঁড়িগুলি ভেঙে ওপরে আসে। মানিনী রমা খাটের ওপর শুয়ে আছে,—চুল আলুলিত রুক্ষ,—তনু-লতায় একটি বিপর্যস্ত শোভা,—মুখে একটি বিনম্র ঔদাস্য। শুয়ে-শুয়ে একটা বই দেখছে। ডাক্তার পাশে বসে বললে,—একটা সিরিয়াস কেস হাতে এসেছে, তাই দেরি হয়ে গেল। ভারি ক্লান্ত হয়েছি।

তবু রমা কোনো কথা কয় না। ক্লান্তি নিরাকরণের অমোঘ ওষুধ কি আজ ওর ফুরিয়ে গেল! ডাক্তার একটু বিস্মিত হয়ে বললে—কি গো, অসুখ করেছে বুঝি? শোও আরো জানলা খুলে!

বলে ওর নাড়ী দেখে, কপালে ও বুকে হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করতে চায়।

রমা একটু সরে শোয়।

ডাক্তার আরো বিস্মিত হয়। বোতাম খুলতে-খুলতে বলে,—

তোমার জন্যে কি আমার ব্যবসা ছাড়তে হবে নাকি? এদিকে রুগী মরবে আর আমি—

রমা ঠোঁট দুটো কুঞ্চিত করে মাত্র। বলে—এমনি শান্তিতে মরত; শেষকালে কতগুলি অমানুষিক যন্ত্রণা পেয়ে যাবে আর কি। বেচারা।

ডাক্তার বলে,—তোমার কী হল আজ?

রমা কথা কয় না, চুপ করে বইএর দিকে চেয়ে থাকে। ডাক্তারও জামা-জুতো ছেড়ে চুপ করে বসে—ওরই পাশে। সময় গড়িয়ে চলে। একটি বিষাদক্লিষ্ট মুখের ওপর দুটি ব্যথাতুর নিষ্প্রভ চোখ, মনে হয় সেই বিশীর্ণ দুখানি হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সেই ক্ষুদ্র শতছিন্ন নোংরা আলোয়ানটা,—পায়ে জুতো নেই, কাল রাত্রে ওর ছেলেটি মারা গেছে!

রমা উঠে পড়ে; স্নান করে আসে। ডাক্তারও স্নান করে খেয়ে নেয়। দুপুরটা তেমনি মদকলকূজনে অতিবাহিত হয় না—ডাক্তার নিয়মিত অভ্যাসের ব্যতিক্রম করে নিচে ল্যাবোরেটরিতে চলে যায়, রমা শিশিরমথিত ম্লান পদ্মকোরকের মতো চুপ করে শুয়ে-শুয়ে অদূরবর্তী রাস্তাটা দেখে—

সমস্ত ঘরে যেন আসন্ন বিরহের সুমধুর একটি শোকচ্ছায়া ঘনায়িত হয়ে উঠেছে।

ডাক্তারের পরীক্ষা তখনো সফল হয় নি। অনেক রাত্রে শুয়ে অন্ধকারে ডাক্তারের চোখে রেবতীর সেই ক্লিষ্ট বিপাণ্ডুর মুখ ভেসে আসে, সেই বিকৃত দেহটা যেন একটা উদ্ধত তর্জনীর মতো ওকে শাসায়, সেই প্রসারিত দুটো হাত যেন ওকে নিষ্ঠুর মুষ্ট্যাঘাত করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ও সহসা পার্শ্বচরী রমাকে দুই বাহু বন্ধনে অনুভব করে, ভাবে—ভাগ্যিস ঐ রুগী রমা নয়,—ওর কোনো আত্মীয়-বন্ধু নয়, একজন অপরিচিত পথিক! যেন স্বস্তি পায়। ওর পাশে সত্যিই রমা,—স্বচ্ছকান্তি, অভিনবযৌবনা, অভিমানিনী।—ও নিজে সুস্থ, সবল, অর্থশালী। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

রমা আজ আর ভালো করে কথা কয়নি, হাসেনি। ভাবে, চঞ্চলা রমার চেয়ে এই মানিনী অবনম্রা রমার মধুরতা কোনো অংশে হীন নয়।

ডাক্তার নিয়মভঙ্গ করে একটু আগেই নিচে নামল আজ। যেন রেবতীর বেশিক্ষণ বসে থাকতে না হয়, কেমন আছে না জানি! রমা স্বামীর তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তখনো রেবতী এসে পৌঁছোয় নি,—কেউই নয়। বিশেষ কেউ আসেও না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারিই করতে হবে এ-সম্বন্ধে ডাক্তারের কোনোই স্থিরতা ছিল না। ডাক্তার হওয়াটা ওর জীবনে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। তবু ভাবে,—তবু যদি একজন এল, শুধু টিকে-থাকার আনন্দের কাঙাল হয়ে ওরই দোরে,—ওকে বিমুখ করে কী লাভ?

ডাক্তার জানলা দিয়ে রেবতীর সেই ধূলিলিপ্ত ব্যাধিজীর্ণ পা-দুটো দেখবার আশায় রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবতী আসে,—অতি কষ্টে। ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে ওকে সম্বর্ধনা করে। বলে,—কেমন আছেন?

রেবতী অত্যন্ত কাতর-স্বরে বলে,—যন্ত্রণা আরো বেড়েছে। আজকে আর আপিস যাওয়া হবে না।

ডাক্তার ওকে চেয়ারে বসতে বলে বলে,—খুব কি?

—খুব।

ডাক্তার ওকে প্রবোধ দেয়: ও কিছু নয়, সেরে যাবে।

মুহূর্তের জন্য রেবতী আবার ওর সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যায়। বলে,—আর কতদিন?

—এই মাসখানেকের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠবেন।

রেবতী ভারি তৃপ্তি অনুভব করে। ভাবে,—একমাস! বিস্তীর্ণ আয়ুর সমুদ্রে একটা মাস তো একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ! এক বৎসর বাদে ও কোনোদিন হয়তো এই পরম দুঃখদায়ক পরম কুৎসিত মাসটার কথা মনেও করবে না। একবার একটা মাস কোনোরকমে কাটাতে পারলেই

হয়! এটা মাঘ,—চৈত্র মাসে যখন দক্ষিণ থেকে হাওয়া দেবে, সে হাওয়া ওরই জন্য বিধাতা পরম স্নেহে পাঠিয়ে দেবেন—ভাবতে চোখের কোণে জল আসে।

বাড়ি এসে রেবতী দেয়ালে-টাঙানো বাংলা ক্যালেণ্ডারটা নেড়েচেড়ে দেখে। চৈত্র মাসের একটা তারিখ পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়,—সাতাশে চৈত্র। সে-দিন হয়তো ওর শরীরে এই দুঃসহ ক্লান্তি থাকবে না,—বিশীর্ণা শিপ্রা আবার কলধ্বনি করে উঠবে। ডাক্তারের সময় নির্ধারণ করে দিতে কিছু ভুল হতে পারে,—একমাসে না হোক বড় জোর দুমাসে ও সেরে উঠবেই। ও মনে-মনে সেই আগামী সাতাশে চৈত্রের বেলা বারোটার কথা মনে করে,—ক্যালেণ্ডারে চেয়ে দেখে সে তারিখটায় রবিবার পড়েছে, আপিস যেতে হবে না! সেদিন রৌদ্র কত প্রখর হবে, কত ধুলো উড়বে—কে জানে? সেদিন ও আবার স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারবে, অতি সহজে নিশ্বাস নিতে পারবে,—এই ওর সুখ! হয়তো সেই রৌদ্রেই ও বেরিয়ে পড়বে,—কিংবা হয়তো আর কিছু করবে যা মোটেই অসাধারণ নয়।

তবু, কিছু না খেয়েই আপিসের দিকে রওনা হয়। কিছুই রাঁধা হয় নি। ভাবে, পথের থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে নিলেই হবে। দিন কয়েক পরেই তো মাইনেটা পাবে,—আরো কয়েক দিন পরে,—যাকই বা না এ রোথো চাকরি,—যদি আবার স্বাস্থ্য ফিরে পায়, মোট বইতেও নারাজ হবে না।

কিন্তু কত দূর গিয়েই রেবতী ফিরে এল। শিপ্রা তখনো কাঁদছে। ওর মাথার কাছে বসে বললে,—ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। যেতে পারলাম না।

শিপ্রা তবু মুখ তোলে না। যে-জায়গাটায় ওর সন্তান শেষ চোখের পাতা দুটি বন্ধ করেছে, সেইখানেই বুকটা দিয়ে পড়ে আছে। এখন আর একটুও আওয়াজ করতে পারছে না।

রেবতী চুপ করে বসে ভাবে,—সাতাশে চৈত্রেও এমনি আপিস যাবে না। কিন্তু আজকের সঙ্গে সেদিনের কত তফাত!

আরো অনেকগুলি দিন গেল। যে-পথ আসতে আগে রেবতীর পনেরো মিনিট লাগত, এখন সেই পথটুকু ভাঙতেই ওর একঘণ্টার ওপর লাগে। আসে,—অতি আস্তে আস্তে লাঠি ভর দিয়ে,—তবু ডাক্তারকে তার করুণার জন্য মনে-মনে ধন্যবাদ দেয়। নিজের কষ্টটাকে বেশি বলেই মানে না, ডাক্তার যে ওকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করছে, সেইটেই বেশি।

দিন-কে-দিন ওর অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। হলদে দাঁত, চোখ পাঁশুটে, বরাবর সেই ছোট র‍্যাপারটাই গায়ে দিয়ে আসে,—খালি পা —বিকট, বীভৎস।

তবু যদি বলে: কবে ভালো হব? ডাক্তার জবাব দেয়: সবই সময় লাগে মশায়।

আবার যদি বলে: ভালো হব তো? ডাক্তার স্বাভাবিক মুরুব্বিয়ানা করে বলে: বড্ড দেরি হয়ে গেল বলেই এতটা বেগ পেতে হচ্ছে। তা, আমার হাতে যখন আছেন, ভালো হয়ে যাবেন বৈকি। এ তো আর হাতুড়ে চিকিৎসা নয়।

ক্ষণিক মৃদু একটি হাসিতে রেবতীর ঠোঁট দুটো একটু বিস্ফারিত হয়। সেই হাসি দেখে ডাক্তারের বুক শিউরে ওঠে।

এক-এক সময় ডাক্তারের মন দারুণ ঘৃণায় কিলবিল করে ওঠে। ইচ্ছে করে, শক্ত মুঠি দুটো দিয়ে বকের ঠ্যাং-এর মতো রেবতীর গলাটা টিপে ধরে। কিংবা এমন একটা ওষুধ দেয়, যাতে যেতে-যেতে মাঝপথেই—

পারে না তা। নিজের ট্যাঁকের পয়সা থেকেই ওষুধ-পত্রের খরচ জোগায়। খেতে শুতে সব সময়েই ভিক্ষার্থীর দুটি প্রসারিত হাত ওকে যেন অনুসরণ করে। ও মনে একটুও স্বস্তি পায় না।

দিন-রাত্রি পরীক্ষা চলে। শরীর অবসন্ন হয়, মন বিমুখ হয়ে আসে, তবু ল্যাবোরেটরিতে রাত জেগে বসে-বসে নানান রকম তথ্য আবিষ্কারের আশায় প্রহর গোনে। রমার নিশ্বাসপতনের অস্পষ্ট শব্দ শোনবার জন্য ওর আর এতটুকুও কৌতূহল নেই। ও ভাবে, একটা

ওষুধ ও বের করতে পারত—আর রেবতী যদি খালি একটি দাগ সেই ওষুধ খেয়েই ভালো হয়ে যেত,—ওর চোখের সুমুখে রোজ ভোর বেলা এমনি পাংশু মুখে জীর্ণ বেশে ভিক্ষুকের মতো, অপরাধীর মতো আর দাঁড়াত না—

রাত বেশি করেই ওপরে যায়। রমা এক পাশে ঘুমিয়ে থাকে, কোনো-কোনোদিন ইজিচেয়ারেই,—ডাক্তার খানিকক্ষণ খোলা ছাদে পায়চারি করে, আর কেবলই রেবতীর সেই কুৎসিত রোগবিকৃত ব্যথিত মুখটা ওর মনে পড়ে। মনে হয়, কে যেন ওর পিছে-পিছে একান্ত নিঃশব্দে, একান্ত অলক্ষিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে, যেন দুই হাত মেলে কী ভিক্ষা চাইছে,—কী কাহিল দুটো হাত! ডাক্তার তখুনি ঘরে এসে শোয়, ঘুমন্ত রমাকে একটু স্পর্শও করে না। চোখ বুজে থাকে, মনে হয় সমস্ত বাড়িতে যেন রেবতীর ক্ষুধিত মূর্তি অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—যেন ভিক্ষুকের বেশেই নয়, দস্যুর বেশে। যদি যেতে না পায়, তবে যেন চুরি করে, জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

এক-এক সময় ডাক্তার ভাবে, শহরের একজন সেরা ডাক্তার দিয়ে ওর চিকিৎসা করানো যাক। নিজের ওপর ওর একটা দারুণ ঘৃণা হয়। ভাবে, এতদিন বিলেতে থেকে পয়সা খরচ করে ডাক্তারি শিখে আসার এই কি পরিণাম? ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে: আমিই ভালো করব। খাটের ওপর উঠে বসে। দেখে পাশে রমা নেই। কখন যে বারান্দায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে শুয়েছে, কে জানে? ডাক্তার অস্থির হয়ে খোলা ছাদে টহল দিতে লাগল। আপন মনে বলল,—মৃত্যুর সঙ্গে আমারই এ যুদ্ধ। কখনই জিততে দেব না ওকে।—খুব জোরে পা ফেলে তাড়াতাড়ি হেঁটে বেড়ায়।

পরে আবার ভাবে,—কে এ রেবতী? কোথাকার কে না কে একটা কেরানি, তাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? ওর জন্যে এত খরচপত্র করা, বিনামূল্যে এত পরিশ্রম করা,—কি বোকামিই না হয়েছে! ও মরে গেলে ডাক্তারের কী-ই বা ক্ষতি, চিকিৎসাশাস্ত্রের কী-ই বা অপমান? যে ভুল করবে, শাস্তিভোগ করতেই হবে তাকে,—তার

জন্যে পরের কী এসে যায়? রেবতীর কাছে ডাক্তারের কী দায়িত্ব আছে? পৃথিবীতে এত বড়ো দয়ার সাগর না হলেও তো চলে! ভগবানের ইচ্ছা, ও কষ্ট পাবে, মরবে,—তাতে ডাক্তারের কিছুই করবার নেই। কী হবে এ-সব পরের ঝক্কি মাথায় নিয়ে? ডাক্তার তো আর রেবতীর কাছে ধারে না কিছু। ওর ইচ্ছে নেই আর ডাক্তারি করবার, তাতে রেবতীর অভিযোগ করবার কিছুই নেই। নিশ্চয়।

ডাক্তার হঠাৎ রমাকে ঠেলে তুলে বললে,—চল, কাল ভোরেই আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি। আর ভালো লাগছে না কলকাতা—

রমাও হঠাৎ তার অভিমানের ঘোমটা টেনে ফেলে উৎসুক উৎফুল্ল-স্বরে বললে,—যাবে?

ডাক্তার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—কিন্তু হাতে যে প্রকাণ্ড একটা রুগী, কেমন করে যাই?

রমা ঘাড় ফিরিয়ে ফের চোখ বুজে পড়ে থাকে। ডাক্তার বললে,—বাঁচবার কি অদম্য ইচ্ছা ওর! সমস্ত ইচ্ছার চেয়ে প্রচণ্ড। কালই যাওয়া হতে পারে না।

বিনিদ্র রাত্রি রমার অসহ্য লাগে। যেন কোন একটি অপরিচিত বেদনা, কোন একটি আসন্ন মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকার ওর আর স্বামীর মধ্যে কি একটি অদৃশ্য যবনিকা বিস্তার করেছে। এই অভিমানের ভার কবে ঘুচবে? রমার চোখ জলে ভরে আসে। ভাবে, স্বামীর থেকে ও যেন কত দূরে সরে গেছে। এই নিষ্ঠুর অকারণ বিচ্ছেদ আর ও সইতে পারে না।

ডাক্তার আবার গিয়ে শোয়। ভাবে,—ভোর হলেই আবার রেবতীর সঙ্গে দেখা হবে। ভাবতেই ভয় হয়। সারা রাত আর ঘুম হয় না। রমারও না।

একদিন সত্যি-সত্যিই রেবতী আর এল না।

ডাক্তার ঘুম থেকে উঠেই নিচে নেমে এসেছিল রেবতীর প্রত্যাশায়।

পুবের জানলাটা দিয়ে বহুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল,—এই বুঝি রেবতী আসে! যে যায় তারই মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে ইচ্ছে করে ডেকে সবাইকে শুধায় কারু কোনো ব্যাধি আছে কি না, সমস্ত ব্যাধির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবার অদম্য স্পৃহা জাগে।

হঠাৎ এক সময় নেপালি চাকরটাকে শুধায় : সেই বাবুটি এসেছিল রে?

চাকর উত্তর দেয় : না তো!

আর কখনই বা আসবে? এসে ফিরে যাবার মতো অসহিষ্ণু সে নয়। তবু রেবতী আসছে না দেখে ডাক্তার একটুও স্বস্তি বোধ করছিল না। এটা ওটা করে আরো খানিকক্ষণ কাটাল, আবার চুপ করে চেয়ারটায় বসল। ভাবল, আজ যদি রেবতী আসে, তবে নিশ্চয়ই ওকে ওর মনোমত ওষুধ দিয়ে দেবে। ও সত্যিই এবার যাক, ডাক্তারকে মুক্তি দিক।

কিন্তু, কেন রেবতীকে ভালো করা যাবে না?—ডাক্তার নিজের ভীরুতা ও অক্ষমতাকে সহসা মনে-মনে কশাঘাত করে সজাগ হয়ে উঠল। আবার হেলান দিয়ে ভাবতে বসল—বয়ে গেছে! দুনিয়ার সবাইকে যদি ভালো করতে হবে তা হলে এখানে মানুষের পা ফেলবারও জায়গা হত না। রেবতী মরবে, সে একটা বেশি কথা কি? ও তো একটা না-খেতে-পাওয়া গরিব কেরানি মাত্র।

ডাক্তার আরো খানিকক্ষণ বসে থেকে কি ভেবে ওপরে উঠে গেল।

রমার ঘুম ভেঙেছে বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে তখনো ওঠে নি। ভোরের রোদ একটুখানি চুলে এসে পড়েছে, দুই চোখে সদ্য-জাগরণের একটি প্রশান্ত আভা! উঠে কি-ই বা করবে ভেবে ওঠেনি, শুয়ে-শুয়ে কিছু না-ভেবে সময় কাটানোটা বেশ উপভোগ করছে।

ডাক্তার ঘরে এসে চেয়ারে বসল। রমা ভাবছিল তেমন দিন থাকলে এই বিছানায় এসেই উনি বসতেন, ওকে চুমু খেতেন, এখনো ওঠে নি দেখে একটু বকতেন, হয়তো বা হাত ধরে টেনে তুলে দিতেন—

ডাক্তার অপরাধীর মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—সেই রুগীটি আজ এখনো এল না।

রমা শুয়ে-শুয়েই বললে,—বোধ হয় হয়ে গেছে।

—না না, হতেই পারে না তা।—ডাক্তার একরকম চেঁচিয়ে উঠল : আমি ওকে ভালো করবই। ওকে আমার ভালো করতেই হবে।

রমা ঠাট্টা করে বললে,—হঠাৎ এত পরার্থপরতা?

ডাক্তার ততোধিক ব্যঙ্গ করে বললে,—মেয়েমানুষ, তুমি তার কি বুঝবে? এ হচ্ছে যুদ্ধ, আমি জয়ী হতে চাই।—কিন্তু কেন সে এল না!

রমা উঠে বসে একটা ফাঁস খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বললে,—চিকিৎসার হাত থেকে সরতে পারলেই হয়তো ও বাঁচে।

ক্ষেপে গিয়ে ডাক্তার বললে,—ওর মৃত্যু বুঝি এতই সস্তা,—কেন না ভালো করে চিকিৎসা করবার ওর টাকা নেই, ওর পথ্য জোটে না, ও পাপী? বাঁচবার অধিকার যদি কারু থাকে, তো খালি ওর আছে। আমার তোমার নয়।

রমা ভুরু কুঞ্চিত করে বললে,—কেন না ওর আপিস করতে হয়, না খেতে পেয়ে ওর ছেলে মরে,—ওর জীবনে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আনন্দ, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই,—তাই?

নিচে কিসের আওয়াজ শুনে ডাক্তার উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল : ঐ বুঝি ও এল। ওকে আজ আর বাড়ি যেতে দেব না, এখানে রেখেই চিকিৎসা করব। দেখি সারে কি না।

বলে তাড়াতাড়ি নেমে যায়। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকে : ঝুনটু, ঝুনটু!

নেপালি চাকরটা পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার বলে,—বাবুটি এসে বুঝি ফিরে গেল? আমি ওপরে ছিলাম, ডেকে আনলি না কেন? বোকা!

ঝুনটু বললে,—কোই বাবু আসে নি।

—আসে নি? ডাক্তার জানলার কাছে এসে একটু দাঁড়ায়। পরে চাকরটাকে টাকা দিয়ে বলে,—সিগারেট নিয়ে আয় কিনে। একটা

কাগজে সিগারেটের নাম লিখে দেয়। আরো বলে,—রাস্তায় যদি সেই বাবুটিকে দেখিস, বলিস যে ডাক্তারবাবু এখনো বাড়িতেই আছেন। বুঝলি?

বিকেলেও রেবতী এল না। দিনের মুমূর্ষু আলো দেখে রেবতীর রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর কুৎসিত মুখ মনে পড়ে।

ডাক্তার ওপরে উঠে গিয়ে রমাকে বলে,—চল, কার্নিভালে যাই।

পরে বলে,—চিরকাল আমার ডাক্তারি করতেই হবে এমন কথা কুষ্ঠিতে আমার লেখে নি। ছেড়ে-ছুড়ে একদিন পরম বৈষ্ণব হয়েও যেতে পারি। যখন যা মন চায় তাতেই মন দেব,—তাই সুখ। একটাকে নিয়েই চিরজীবন আঁকড়ে থাকতে হবে এ-কথা মানায় বোকা বা প্রতিভাবানের মুখে। আমি ও দুটোর কোনটাই হতে চাই না। নাও, চটপট সারো।

রমা সাদাসিধে একখানি শাড়ি পরে। রুচি নিয়ে ডাক্তারের আজ আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এ-বাড়িটা থেকে কোনো সুযোগে বেরিয়ে পড়তে চায়,—রমাকে একলা ফেলে যেতেও মন যেন কিছুতেই সরে না।

গাড়িতে রমার একখানি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে কঠিন করে চেপে ধরে ডাক্তার বলে,—আমরা কত ছোট, আমরা একটি মানুষের সামান্য চোখের জলও মুছে দিতে পারি না। কত অক্ষম আমরা।

কার্নিভাল রাজোদ্যানের মতো শোভা পাচ্ছে। রমা আর ডাক্তার দুজনেই অন্যমনস্কের মতো হেঁটে বেড়ায়, যেন পথ ভুলে এসে পড়েছে এখানে, কোনো উদ্দেশ্য নেই। ডাক্তার বলে,—হুইপ-এ চড়বে?

রমা বলে,—না, থাক।

সমস্ত উৎসবের আলোকমালা ম্লান করে ডাক্তারের চোখে একটি রোগবিবর্ণ বিকৃত ও বিষণ্ণ মুখ ভেসে বেড়ায়,—দুই চোখে তার কি নিঃশব্দ ব্যাকুল যাচ্ঞা! স্বামীর ব্যর্থতা-বোধের বেদনা অনুভব করে

রমা নিজেকেও ব্যর্থ মনে করে, হেসে কথা কইতে চায়, নিজের হাসি নিজের কাছেই অত্যন্ত করুণ লাগে।

ফিরে যাবার সময় গাড়িতে কেউ একটিও কথা কয় না।

বাড়ি এসে অন্ধকারে ডাক্তার যেন কার বিষাক্ত দীর্ঘনিশ্বাস শোনে, যেন কার হাহাকার রাশীকৃত হয়ে আছে। ও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, শোবার আগে একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেয়, যাতে রাতে আর ঘুম না ভাঙে।

রমা তক্ষুনিই শুয়ে পড়ে না, ড্রেসিং টেবিলে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নিজেকে হঠাৎ অত্যন্ত বিফল ও নিরাশ মনে হয়। অস্পষ্ট করে অতীতের একটুখানি আবার মনে পড়ে।

সকাল বেলা উঠে ডাক্তারের অত্যন্ত ক্লান্তি লাগছিল, তবু দেরি না করেই নিচের ঘরে গিয়ে বসল।

ঝুনটুকে জিগগেস করে জানা গেল,—সে-বাবুটি আজো এখন-তক আসে নি।

রোদ যত চড়া হয়, ডাক্তারের মন ততই হতাশ, চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তার পর এক সময় মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, সঙ্গে কতগুলি টাকা নিয়ে। সাহেব-ডাক্তারকে তাঁর বাড়ি গিয়ে পাওয়া গেল। তাঁকে তার প্রাপ্য ভিজিট আগে দিয়েই ডাক্তার বলে,—তোমাকে আমার সঙ্গে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে। বোধ হয় আর নেই।

সাহেব টাকাটা ড্রয়ারে রেখে বলে,—আগে দেখেই আসি।

এঁদো গলি, এক পাশ দিয়ে একটা কাঁচা নর্দমা, সাহেব নাকে রুমাল দিয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার ঠিকানাটা আরেকবার মিলিয়ে দেখলে। পরে চেঁচাতে লাগল : রেবতীবাবু, রেবতীবাবু।

ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না, একটা কান্নার শব্দও না। শুধু দুপুরের রৌদ্রের প্রখরতা নির্ণয় করবার জন্যই যেন একটা কাক নিদারুণ কর্কশ স্বরে চীৎকার করছে।

অগত্যা দরজা ঠেলেই ডাক্তার ঢুকে পড়ে,—পিছনে সাহেব। এই পথ দিয়েই হয়তো মৃত্যু এসেছে, কিন্তু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, কী অলক্ষিতে—কাপুরুষের মতো।

একেবারে ঘরে ঢুকে পড়েই ডাক্তার বলে,—রেবতীবাবু কেমন আছেন?

তক্তাপোশটার ওপর রেবতী শোয়া,—হিক্কা উঠেছে। এবারে যাবে, বড় জোর ঘণ্টা দুয়েক আছে। দেখেই ডাক্তারের মন হাহাকার করে উঠল। পাশে বসেই নাড়ী পরীক্ষা করলে। সাহেবকে বললে,—হোপলেস।

সাহেব কি-একটা ওষুধের কথা বলে চলে গেল।

মুমূর্ষুর শিয়রে একটি স্ত্রীলোক বসে মৃদু-মৃদু পাখার হাওয়া করছে,—ডাক্তার অনুমানে বুঝলে, মেয়েটি রেবতীর স্ত্রী। ভারি শীর্ণ, মলিন—কোলের ওপর কার ছোট একটি লাল জামা, একটি ভাঙা ঝুমঝুমি। ওদের দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, এখনো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সেই ছোট লাল জামাটিই দেখছে।

মেঝের ওপর কতগুলি বমি—কতগুলি মাছি ভন-ভন করছে।

ডাক্তার বললে,—বমিটা কখন হয়েছে?

প্রথম কিছু বলতে চায় না, পরে বহু অভয় পেয়ে শিপ্রা বললে—কাল।

—এখনো নিকোন নি কেন?

শিপ্রা উত্তর দেয় না।

ডাক্তার বললে, আপনাদের আর কেউ নেই? বসুন, আমি এই ওষুধটা নিয়ে আসছি।

ওষুধ এনে রেবতীকে খাইয়ে দেয়। রেবতীর আর খাবার শক্তি নেই, কষ গড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার ভাবে, শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেই যাবে নাকি? কী লাভ থেকে? কে ওর রেবতী?

সমস্ত ঘরে দারিদ্র্যের কী কদর্য বীভৎসতা। বাসনপত্র ওলোট-পালোট, এঁটো তোলা হয় নি কত দিন থেকে কে জানে, নোংরা জামাকাপড় আর পোড়া কয়লার ছাই, রোগীর বমিতে আর জামাতে

একাকার। আর রেবতীর মুখটা কি বিকট, ভয়ঙ্কর, হাঁ-করা ঠোঁট দুটোর মাঝে কি কুৎসিত ঘৃণা। ডাক্তারের সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। আবার বললে,—আপনাদের কেউ নেই আর ?

শিপ্রা তেমনি ঘাড় নেড়ে জানালে—কেউ নেই।

ডাক্তার তারপর আর কিছু না বলেই টুপ করে বেরিয়ে এল।

মোটরে করে অনেকক্ষণ বিমনার মতো ঘুরতে লাগল। ভাবে,—এই বুঝি রেবতীর নিশ্বাস থেমে গেল, কি হবে তারপর ? ঐ মেয়েটির কি হবে ? কোথায় যাবে ? রেবতীই বা কোথায় গেল ? হয়তো এখনো যায় নি, হয়তো এখনো আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে হয়।

কিন্তু কেন ? যাক না।

বাড়ি এসেই ডাক্তার রমাকে বললে, ও গেল! পারলাম না বাঁচাতে।

রমা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বললে,—গেছে ?

—এখনো হয়তো একেবারে যায় নি। কিন্তু যাবে। কেউ নেই,—একা স্ত্রী। কোথায় যে ভাসবে কে জানে। মেয়েটি কিছুই হয়তো বুঝতে পারছে না।

পরে বললে,—সত্যিই ও আর ভালো হল না, রমা। হ্যাঁ, ঐ অসুখ হলে ভালো হয়ও না, এমনি বেয়াড়া অসুখ। আমি চেষ্টা করতে আর কসুর করলাম কই ? এই রোগে প্রতি বছরে আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক মরে। হাজার হাজার রেবতী। কে কার খোঁজ রাখে ?

পাইচারি করে আর বলে,—যাক, বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন ফের ভুগত। বাঁচাটা বিড়ম্বনা বই আর কিছুই মনে হত না। এই বেশ হল—শান্তি পেলে। আমার কাছ থেকে একদিন আত্মহত্যা করবার জন্য বিষ পর্যন্ত চেয়েছিল। যাক, আত্মহত্যার পাপ তো আর করে নি—

চেয়ে দেখে, রমা দুই হাতে মুখ ঢেকে আছে। কেন ? রেবতী মরল বলে সেই দুঃখে, না ডাক্তার তাকে ভালো করতে পারল না—সেই লজ্জায় ?

আবার অন্ধকার জমে উঠেছে। কনকনে শীতের হাওয়া বইছে। একটু মেঘও করেছে বুঝি!

ডাক্তার ছাদে পাইচারি করে বেড়ায়,—মনে হয় ওর অপরাধের যেন অন্ত নেই। মনে হয়, রেবতী যেন লক্ষ লক্ষ করতল প্রসারিত করে ওর কাছে তার জীবন ভিক্ষা করছে। যেন বলছে—যে জীবন আমার নিলে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

ডাক্তার ঘুমের ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। রমাও।

বাতাসের বেগ বেড়েছে—অন্ধকারে মরা কান্নার মতো।

হঠাৎ রমা ঘুমের মধ্যে উৎকট চীৎকার করে উঠল: ওগো, কে যেন ডাকছে—

ডাক্তারও অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে আর্তনাদ করে উঠল: কে? রেবতী?

এবং উঠেই জানলা দিয়ে নিচে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখলে, রেবতীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিছুই দেখা গেল না। খালি, এই শীতের রাতেও ফুটপাতের ওপর কতগুলি গৃহহীন পথিক শুয়ে আছে।

আর কিছু না।

রুদ্রের আবির্ভাব

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখানে আমি চাকরি পাব কোথায়? তবে কলকাতায় যেতে চাও তো মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

বড়োবাজারে পিপুলের দোকান করিয়া মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন: পরের জন্য মাথা না ঘামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এস। গ্রামে বসিয়া কী কেবল পচিয়া মরিতেছ? চাকরি করিতে চাও তো একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লোক আমারও চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবসা করিতেছি। কতো লিখিব, নিজে তুমি একবার আসিতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পচিয়া মরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম,—চাকরি করে কী হবে? তোমাকে কিছু জমি ছেড়ে দিচ্ছি, চাষ করো! খাজনা বাবদ কিছু চাই না, ফসল হলে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। কেমন, রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। গোরু-লাঙল কিনিবার পয়সা নাই, আমি ধার দিলাম। কিছু মহৎ কীর্তি অর্জন করিতেছি এমনি ভাবে কহিলাম,—জমিতে সুবিধে না করতে পারো তো এই ধার তোমার শোধ করতে হবে না।

মহাসমারোহে ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। জাঁকালো ভাষায় খবরের কাগজে এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম। বি-এ পাশ-করা ছেলে চাকুরির খোঁজে ফ্যা-ফ্যা না করিয়া নিজ হাতে জমি চষিতেছে—বড় বড় হেডলাইনে খবরটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভাবিল, কী যেন একটা করিতেছি! আমি ভাবিলাম, মামার উপর খুব একটা প্রতিশোধ নেওয়া হইল যা হোক!

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারিদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী ও নতুন ছবির মতো ঝকঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে শহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিতেই তাহার মনে গোরুর গাড়ির চাকার একঘেয়ে করুণ আর্তনাদের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্যাপ্ত বাতাসে আঁচল ফুলাইয়া নদীর পাড়ে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের শহুরে রুক্ষ শ্রী সবুজ ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সাম্রাজ্যে তার কর্ত্রীত্ব অসীম: তাহার মুখের একটি কথায় জন-মজুর একশোখানা কাজ নিমিষে সমাধা করিয়া আনে। দেখিতে-দেখিতে তাহার হুকুমে সামনের জমিটা ফুলন্ত বাগান হইয়া উঠিল; দুইটি সিসু গাছ যেখানে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার নিচে বাঁশের একটি মাচা বাঁধা হইল—সেখানে সকাল বেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের তলার মতো নরম ও তকতকে করিয়া তুলিল। দিল্লীর দেওয়ানি খাসএর সিলিঙের মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে, স্বর্গ বলিয়া যদি কিছু থাকে তো এইখানে, এইখানে!

বিবাহের দান-সামগ্রীর যাবতীয় জিনিস আসিয়া পৌছিল—দক্ষিণের ঘরটাকে ছোটখাটো একটা ড্রয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-

বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নির্জনতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া রান্না করে ও আমি যখন একা ঘরে বসিয়া গল্প লিখি, তখনো আমরা নির্জন নই—যখন কিছু নেহাত করি না, তখনো আকাশ ও আলো, তারা ও অন্ধকার মিলিয়া আমাদের পরিপার্শ্বের শূন্যতাকে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-একা এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের সঙ্গে অপরিসীম বিরহ ভোগ করিতেছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় মেস-এ থাকিয়া কলেজে পড়িতেছি ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজ ঠিক না পালাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরালয়ে নিয়মিত আতিথ্য নিতেছি। এবং আশ্চর্য এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অসাবধানে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিতাম ও জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া লাস্ট ট্রামকে যখন অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন চট করিয়া মনে পড়িয়া যাইত যে আজ রাত্রে মেস-এ যাইবার কোনো পথ-ই আর খোলা রাখি নাই। এবং শনি-বারের রাতটাই যখন যাই-কি-না-যাই এমনি মিথ্যা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিলাম, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া রবিবারের রাতটাই বা ঘুমাইয়া লইতে কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার ভোরে অনিদ্রাক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেস-এ ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলি কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কিছু নয়, বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহাশয় এখানেই একটা কাজ দেখিয়া লইতে বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখিবেন ও পচা পুকুরের জল ঘাঁটিতে দিবেন না এমনি একটা অজুহাতে আমার জন্যে বাড়ি-ভাড়ার টাকা গুনিতে রাজি হইয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল, ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। গ্রামে তো আসিলামই, বাসন্তীকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সে যতোই

কেন না নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত করুক, এতো বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া এতো প্রচুর জ্যোৎস্না তাহার দুই চোখে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বাড়িতে নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এইখানে সে সর্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথায় যে তাহার আসন, এতো দিনে তাহা আবিষ্কারের পর তাহার আনন্দের আর সীমা নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে ছোটখাটো একটা বচসার সূত্র ধরিয়া ভীষণ কলহের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল। তিনি সরাসরি বলিয়া বসিলেন: বাসন্তী যদি আমার কথার অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখবো না। বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম, —সে ধীরে আমার পাশে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, মুখ বিকৃত করিয়া অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া স্টেশনের পথে আসিতে-আসিতে কহিলাম,—তুমি রামায়ণের সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুর মহাশয় শখ করিয়া যাহা যৌতুক দিয়াছিলেন, স্পষ্ট রূঢ় কণ্ঠে তাহা দাবি করিয়া বসিলাম। খাট-টেবিল আলনা-দেরাজ বাসন-কোসন হইতে শুরু করিয়া বাসন্তীর চুলের পিন ও আমার ফাউণ্টেন-পেনএর ক্লিপটি পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে শ্বশুরমহাশয় কড়া করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে, যে, এই সব জিনিস ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিতেও তাঁহার ঘৃণা হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিবারও যে কোনো কালে তাঁহার অধিকার ছিল না সবিনয়ে এই কথাটাও তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী এতেও ক্ষান্ত হইল না,—সময়ে-অসময়ে কেবল নানাজাতীয় ক্যাটালগ লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এটা-ওটা ফরমাজ করিয়া কলিকাতার সাহেব-পাড়ার দোকানগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বিয়েতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা দিয়া বইয়ে-আসবাবে ঘর-দুয়ার ভরিয়া ফেলিলাম। পা-পোশের মতো পুরু কার্পেট হইতে শুরু করিয়া দেয়াল-জোড়া

বড়ো-বড়ো দিশি-বিলিতি ছবিতে ঘর-দুয়ার গমগম করিতে লাগিল।

নিজের শরীর সম্বন্ধে যতোটা না হোক, গৃহ-প্রসাধনে বাসন্তী একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু গৃহ ছাড়িয়া গৃহস্বামিনীকেই শুধু দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন কতো যে সুন্দর হইয়াছে ভাবিয়া তৃপ্তির কুল পাইতেছি না। প্রত্যেক ছবির প্রকৃত আবেদন যেমন তাহার পটভূমিতে, তেমনি অন্তরালহীন আকাশের প্রতিবেশের মধ্যে এতোদিনে তাহার সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটিত হইল! পায়ের রক্তাভ নখকণা হইতে শুরু করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট ভুরু দুটির চঞ্চল সঙ্কেতে লাবণ্যের তরল একটি নদীরেখা নিঃশব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতাম—এতো সব জিনিস-পত্রে ঘর বোঝাই করছ, এ তোমার দেখবে কে? লোককে দেখাতে না পারলে বিলাসিতায় সুখ কী!

বাসন্তী কোমরে আঁচলটা জড়াইতে-জড়াইতে কহিত, কে আবার দেখবে? আমি আর তুমি।

হাসিয়া বলিতাম,—নিজেদের দেখার জন্যে নিজেরাই তো যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে আড়ম্বরে নিজেদের খালি সঙ্কীর্ণ করে রাখা!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিবারই মেয়ে বটে! ততোক্ষণে পেট্রোম্যাক্সটা ফিট করিলে তাহার কাজ দিবে।

জীবনে নূতন একটি আবহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত গাঢ়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে কেমন একটা মুক্তির নিমন্ত্রণ পাইতেছি, আকাশের প্রত্যেকটি তারা বাসন্তীর দেহের প্রত্যেকটি স্পর্শের মতো পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর দেহে নতুন স্বাদ, আমার অনুভূতিতে নতুন তীব্রতা! গ্রামের বিরাট সঙ্গহীনতায়ও নিজেদের কিছু নির্জন লাগে না: যখন আমি ঘরে বসিয়া লিখি ও বাসন্তী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করে, তখন প্রকৃতি শব্দে ও নিঃশব্দে আমাদের মতো পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অথচ শহরের জন-বহুল বিপুল উৎসব-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনর্থক মনে হইয়াছে।

এই নতুনতরো নেশা ছাড়িয়া আমি শহরে গিয়া চাকুরি করিব ও রাস্তায় চলিতে প্রতিমুহূর্তে গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার স্নায়বিক উত্তেজনায় দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—শ্বশুর-মহাশয় আমাকে কী ভাবিয়াছেন!

বাবা নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই ছোট সুন্দর বাড়িখানি, বিঘে পাঁচ-সাত আবাদি জমি, কয়েক ঘর প্রজা—এই দিয়াই আমি আমার জীবনকে সুদীর্ঘ একটি রবিবারের সুরে ভরিয়া নিতে পারিব। চাকুরি করিব কোন দুঃখে? জীবিকা-নির্বাহের ক্ষমাহীন কঠিন প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া এই যে অবারিত একটি আলস্য ভোগ করিতেছি, কী বলিয়া ইহার তুলনা দিব! আমার এই অবকাশের আকাশ হইতে তারার স্ফুলিঙ্গের মতো কতো কাহিনী, কতো ঘটনা কতো চরিত্র মূর্তিময় হইয়া উঠিবে কে বলিতে পারে!

রাত করিয়া গাছ-পালা ঝাপসা করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। শিয়রে মোমবাতি জালিয়া নতুন একটা গল্প লিখিতেছি। ইজিচেয়ারের গভীর কোলে ডুবিয়া গিয়া বাসন্তী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কান পাতিয়া দূরে নদীর তরল কোলাহল শুনিতেছি।

আবছা অন্ধকারে বাসন্তীকে কেমন যেন ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল গ্রামের এই অজস্র প্রশান্তি ধীরে ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে হয়তো গভীরতার বদলে বিস্তার কামনা করে—প্রচুর বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে প্রকাশিত, বিকীর্ণ করিতে চায়—এইখানে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না। একটানা বৃষ্টির শব্দে তাহার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট কানে বাজিল।

পায়রার বুকের মতো তাহার নরম, তপ্ত দেহটিকে কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। কহিল,—আমার বড্ড ভয় করছে।

বলিলাম,—ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না: আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মোমবাতিটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি রাশি কোলাহল যোজনব্যাপী বিরাট স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই কোলাহল বাসন্তী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়া ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, সারারাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই নিঃশব্দতা। বাসন্তী পরিচিত জগতে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিস-পত্র ঝাড়ে পোঁছে, ঘর-দুয়ার ছুরির ফলার মতো ঝকঝকে করিয়া তোলে।

নদী কাল রাত্রে নাকি অনেকদূর ভাঙিয়া আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ব্যোমকেশের ক্ষেত মাতামাতি শুরু করিয়াছে! গাঢ় সবুজে ফিকে সোনালির আভা দিয়াছে দেখা যায়। ব্যোমকেশের স্ফূর্তি আর ধরে না! সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না—নদীই যা-হোক অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এখনো তাহার আর্তনাদ থামে নাই। সর্বাঙ্গ ভরিয়া এখনো তাহার উত্তাল উৎসাহ। ভীষণ খাড়া পাড়, নিচে চাহিলে দস্তুরমতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, অমনি তোমাকে বেষ্টন করিয়া মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড় ধরিয়া গেল, সাবধান না হইলেই অমনি তোমাকে সুদ্ধ গ্রাস করিয়া বসিবে। দূরে চাহিলে মনে হয়, একটা ফিনফিনে সাদা সিল্কএর আঁচল ফাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগবসনা রাক্ষুসি মূর্তি! কাল শেষ রাত্রের দিকে নটবর ভূমালির ঘরটা নিয়াছে—অল্পের জন্য ছেলেপিলে লইয়া সে বাহির হইতে পারিয়াছিল; চালের কুটাটি পর্যন্ত বাঁচাইতে পারে নাই। নদী একটু জুড়াইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে অন্তত তাহার স্ত্রীর গলার হাঁসুলিটা সে উদ্ধার করিতে পারে কি না। স্ত্রী মারা গিয়াছে পর এই একটিমাত্র চিহ্নই সে কোনোক্রমে

আঁকড়াইয়া ছিল,—শত অভাবে পড়িয়াও তাহা সে বিক্রি করে নাই। কাহারো বাধা সে মানিবে না, জলটা একটু জুড়াইলেই সে নামিয়া পড়িবে। অমাবস্যা ছাড়িতে আর ঘণ্টা দুই মাত্র বাকি।

বাসন্তী বেশিক্ষণ সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দিল না। গর্জমান বিরাট নদীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করে। মনে হয় ফেনময় বাহু বাড়াইয়া অলক্ষ্যে সে আমাদের দুজনকে ডাকিতেছে। পায়ের কাছের মাটিতে একটা চিড় ধরিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া বাসন্তীকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম।

বিকেল হইলেই মার কোলে ঘুমন্ত খুকিটির মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতোক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দুজনে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—ব্যোমকেশ অবশ্য এইবার সঙ্গে আসিল না। চলিতে-চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি। নদী-ভাঙা প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থের গুঁড়ির উপর পাশাপাশি দুজনে বসিলাম। সামনেই নদী—এখন দেখিতে নিতান্তই বাঙালী মেয়ের মতো নিরীহ: রুপালি গলায় মৃদু-মৃদু কথা কহিতেছে। যতো ভাবি নদীর দিকে বেড়াইতে আসিব না, ততোই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। আর যাইবারই বা জায়গা কোথায়? যেখানে যাইব, সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে কতো কাছে যে আগাইয়া আসিল! আমাদের বাড়ির দক্ষিণে যে ঝাউগাছের সারি ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আকাশকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, দেখি তাহা হঠাৎ কোনদিন ফাঁকা হইয়া গেছে! এখন দক্ষিণটা একেবারে সাদা, সবুজ বা নীলের কোথাও এতোটুকু বাধা নেই—যেন অবিনশ্বরতার গাঢ় রঙ। এত বড়ো মুক্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জায়গাটায় আসিয়া বসিলাম তাহা গাছ-পাতার আড়ালে কার একটি কুটিরের নিভৃত আঙিনা। কোনো চাষা-ভুষোর বাড়ি হইবে,

নদী কাছে আসিয়া পড়ায় আগেই বিদায় নিয়াছে। ছোট উঠানটি ঘিরিয়া সংসারের ছোট-ছোট চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়াতাড়ি সব জিনিস হয়তো সরাইতে পারে নাই —মানুষের প্রাণের চেয়ে কতোগুলি ডালা-কুলোর দাম তো আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত, শূন্য ঘরের নিরানন্দ চেহারা দেখিয়া মন ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হালকা সুরে অনেক সব কথা কহিতে লাগিল। সম্প্রতি এখানে সে ছোটখাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—বিনে মাইনেয় ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া তবু যা-হোক করিয়া দিন তাহার কাটিবে। আমি উহার আবদার চিরকাল পালন করিয়াছি, আজো কহিলাম,—সরকার-মশায়কে বলে দেবে, সামনের বাগানের ধারে তালপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ঘর তুলে দেবেন।

বাসন্তী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—একটুখানি তো ঘর, তা আবার তালপাতার কেন? রানীগঞ্জের টালি দেবে।

—একটুখানি বলেই তো তালপাতার বলছি।

—গরিব ছেলেমেয়েরা পড়বে বলেই বুঝি এমনি হেনস্তা করতে হয়? বেশ পাকা দালান হবে—উঁচু ক্লাসের ছাত্র জুটলে তুমিও মাস্টারি করতে পারো,—অবশ্যি আমি যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করি। দুজনে কাজ পেয়ে বেঁচে যাব। এমনি আর পারিনে।

বলিলাম,—খালি পাকা দালান হলেই চলবে?

—বা, বেঞ্চি-চেয়ার কিনতে হবে না? গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড, আলমারি—সে-সব ফর্দ আমি ঠিক করে রাখব। সরকার-মশায়কে বলে তুমি কেবল টাকা জোগাড় করে দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আছে কী করতে? এ তো আর বাজে কাজে উড়োচ্ছি না, দস্তুরমতো দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাব কোথায়?

—সরকার মশায়কে বললেই তিনি বন্দোবস্ত করে দেবেন ছাড়া আমি বাঁচি কী করে বলো? ওদিকে আমার ভারি-হাতে একটা অসুখ করুক, তখন তো উঠে পড়ে খরচ করতে শুরু করবে! কেমন, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। পাখার চাঞ্চল্যে সমস্ত নিঃশব্দতাটা হঠাৎ স্বচ্ছ, তরল হইয়া আসিল। দূরে খেজুর গাছে দীর্ঘ পাতার ফাঁকে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। যতো এগোই, ততোই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে! পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি নিঝুম কালো নদী বালির বিছানায় গা এলাইয়া ঘুমাইতেছে—কোথাও যেন একটুকু নিশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী আমার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া যেন হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর স্কুলের বাড়ি উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে! নিতাই কামারের দুইটি ছেলে নিয়া সে অ-আ শুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবেন না এমন কথা হলফ করিয়া বলিবার আর সাহস রহিল না।

দুপুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া 'মাস্টার' হয় ও খড়ি লইয়া ইস্কুলে গিয়া ঢোকে, আর নিতাই কামারের দুরন্ত দুই ছেলে অক্ষর ভুলিয়া যতোই ঘরময় দাপাদাপি করিতে থাকে, বাসন্তীর উৎসাহ ততোই বাড়িয়া যায়। শাসন করিবার পদ্ধতিটা তাহার অতিমাত্রায় আধুনিক। একটুও রাগে তো সে না-ই, বরং দুরন্ত ছেলে দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করে।

দক্ষিণের কোঠায় বসিয়া আমি তাহা দেখি ও লিখিবার কিছু প্লট

খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্তানকামনাতুরা নারীর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা লইয়া গল্প লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সম্প্রতি কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। যাগ-যজ্ঞ করিয়া নদী শুকাইয়া দিবে বলিয়া আমাদেরই সম্মুখে মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পুজা যখন একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর বাদ পড়িবে না—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ভালুকের মতো ভীষণ দুইটা অক্ষরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অবয়বের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে, নিতাই কর্মকারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর আঁচলের তলা হইতে কখন ছুটিয়া পলাইল।

বাসন্তী বিরত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উমেদারি করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এত করিয়াও ছেলেতে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে যোগাড় করিতে পারিল না। নদীতে গ্রাম লোপাট হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিগ্‌গজ হইবার জন্য কে এখানে শখ করিয়া বসিয়া থাকিবে?

সন্তানকামনাতুরা নারীর সেই গল্পটা আজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে শুনাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু নদীর গর্জনের সঙ্গে রাত্রির অপার নিঃশব্দতা মিলিয়া তাহাকে এমন অভিভূত ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রস্তাবটা পাড়িবার আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুইবার ভঙ্গিটা এত করুণ ও কৃশ যে মায়া করিতে লাগিল। নুইয়া পড়িয়া তাহার দেহে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল দেহে—চুমা খাইলাম, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। ভাটার নদীর মতো নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। আশ্চর্য, আমার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল, নদীর এই ক্ষিপ্ত উদ্বেলতা বাসন্তীর যৌবনকে ক্রমে-ক্রমে ম্লান, স্তিমিত করিয়া আনিয়াছে। নদীর লবণাক্ত, তিক্ত স্বাদের কাছে বাসন্তীর দেহের মদিরা অনেকাংশে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রত্যক্ষ, এত নিদারুণ, এত

অজস্র-উচ্ছ্বসিত যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই অপ্রতিবাদ পরাভব ইহার আগে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নেই, সেই আবেগের আগুন তাহার নদীর জলে নিভিয়া গেছে। আমি বোধ হয় দিনে-রাত্রে নদীর এই উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

গফুর তরি-তরকারি বেচিয়া দিন গুজরাইত, একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল-ঘরে থাকিবার মিনতি জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় যে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে চাবি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া দরজা খুলাইলাম। উহাদের জায়গা হইল—এবং দেখিতে দেখিতে ইস্কুল-ঘরটা বিচিত্র ধর্মশালার চেহারা নিয়া বসিল। কাহারো নড়িবার নাম নাই। শেষে কেবল মনে হইতে লাগিল, নদী এই হতভাগাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উহাদের না সরাইলে হয়তো আমারই দরজার কাছে আসিয়া হানা দিবে! গোরুর গাড়ি ডাকাইয়া পোঁটলা-পুঁটলিতে চিঁড়ে-চাল বাঁধিয়া উহাদের পথ দেখিতে বলিলাম। রাজী না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না—উহাদের তাড়াইবার জন্য বাসন্তী এমন বিজাতীয় গোঁ ধরিয়াছে! যদি ক্ষুধার তাড়নায় একদিন সকলে মিলিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া আমাদের সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে-একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন গৃহপ্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুশী হইল এমন মনে হইল না। রাজা মিঞা তো ঝাঁজালো গলায় দস্তুরমতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গৃহহীনদের তাড়ায়, রাক্ষসী নদী তাহাকেও তাড়াইয়া ফিরিবে!

আমাদের অতিথিবৎসল না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। কয়েকদিন পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির—ইস্কুল-ঘরে আজ

রাত্রের জন্য তাহাদের ঠাঁই দিতে হইবে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, —কণ্ঠস্বরটা যে কাহার প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। জানলা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘিরিয়া কতকগুলি শিশু ভিজা কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এত বড়ো আকাশের তলে কোথাও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জালিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই প্রজা—নবীন মাইতি। বুঝিতে বাকি রহিল না, নদী আমারও জমিতে থাবা বসাইয়াছে!

বলিলাম,—ঘর-দোর সব গেল?

নবীন গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—সব বাবু, কোনো রকমে সেরে আসতে পেরেছি। আজই এমন ঝড়-বৃষ্টি করে না এলে আরো কিছুদিন থাকতে পারতাম। এখন আপনি জায়গা না দিলে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় যাই বলুন।

পরিষ্কার বুঝিলাম, তাহার কাছে যে বাকি-খাজনা পাওনা ছিল, নদী তাহাও কাড়িয়া নিয়াছে।

ধমক দিয়া উঠিলাম: সময় থাকতে সরতে পারিস নি? জিনিসপত্র কতক তো অন্তত বাঁচত।

কিন্তু ধমকাইয়া তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে, এই ঢের—তুচ্ছ কতগুলি জিনিস দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল,—তাড়াতাড়িতে এই মাদুর আর বালিশ দুটো শুধু নিতে পেরেছি—

ও-দিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল: আর আমি আমার নাটাইটা, বাবা!

মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া সরকার-মহাশয় ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম: আজকে কী নতুন খবর?

সরকার-মহাশয়ের মুখে তক্ষুনি ভাষা জুয়াইল না। অনেক ঢোঁক গিলিয়া পরে কহিলেন,—আমগাছগুলি কাল গেছে।

বিস্মিত হইব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু খবরটা এমন মর্মান্তিক যে মনে হইল যেন এইমাত্র কোনো আত্মীয়তম পরমবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনিতেছি। চমকাইয়া উঠিলাম : কোন আমগাছ?

—সব। সরকার-মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিলেন না।

মনে আছে গত বৎসর এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই আমবাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া নির্লজ্জ এই নদীর বন্যার মতো অকস্মাৎ আকাশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জোরে বাতাস ছাড়িতেই কচি-কচি আম অজস্র শিলাবৃষ্টির মতো এখানে-ওখানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কোঁচড় বাঁধিয়া বাসন্তীর সে কী আম কুড়াইবার ঘটা! ধূলায় সমস্ত মাঠ-বাড়ি একাকার হইয়া গেছে, খানিকটা গরম থাকিয়া সমস্ত শূন্য পাথরের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় কাহাদের গোরু-ছাগল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে —বৃষ্টি এই আসিল বলিয়া! আর আকাশের যেমন চেহারা, বৃষ্টি একবার আসিলে সহজে থামিবাব নাম করিবে না। কিন্তু কথা শুনিবার মেয়ে বাসন্তী নয়। হাওয়ায় চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রাণপণে সে আম কুড়াইতে লাগিল। ঝড় এমনি দুর্দান্ত যে তাহাকে প্রবল পরুষ স্পর্শের আলোড়নে একেবারে বিপর্যস্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বলিলাম,—কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছ? ঝড় থামলে চাকরকে পাঠিয়ে দেব, সব আম কুড়িয়ে নেবে। বাগান তো আমাদেরই—ভাবনা কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উন্মত্ত বাতাসে কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ তুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল। আবহাওয়াটি এত গম্ভীর ও এত ভয়ঙ্কর যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রখরতররূপে সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, একবার দৃশ্যটা দেখে আসি।

নিজে তো যাইবেই না, আমাকেও সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া

রহিল। খবরটা তাহার কাছে এত নিদারুণ যে শতপুত্রশোকে গান্ধারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ায় দেয়ালের প্রকাণ্ড ছবিগুলি মেঝের উপর ভাঙিয়া পড়ে। বিস্তৃত জলরাশির কিনারে মর্তের দুইটি প্রাণী মৃত্যুর প্রলোভন এড়াইয়া কোন রকমে একের পর এক মুহূর্ত গুনিতেছি!

তারপর আসিল ব্যোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সময় থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে গিয়া সে যে লাঙল ও বলদ বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কিনা তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই দুঃখ হইতে লাগিল যে, তাহাকে এইবার সত্যি-সত্যিই চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিবেন না, জানিলেও এত বড়ো ব্যর্থতার কথা সসমারোহে ছাপিবার আর তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভবের ব্যর্থতার মধ্যে মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া! এত দুঃখেও ব্যোমকেশ তাই সুখী হইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। শত-লক্ষ হাত মেলিয়া নদী স্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, এতএব তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই।

বাসন্তী বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি যেতে দেবে নাকি?

এত বড়ো বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী দার্শনিক না হয় তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কোন জিনিস তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পার শুনি? যা যায়, যাক।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ারগুলিও তো বেচতে পারতে ?

—কোথায় বেচব ? কিনবে কে ? কতোই বা দাম পাওয়া যাবে ? পয়সা যা পাবে তাও কি অমনি যাবে না খরচ হয়ে ? ও নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ কোরো না—দেখ, মৃত্যুর এমন চমৎকার চেহারা আর দেখেছ কখনো ?

দক্ষিণের কোঠায় পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম সরকার-মহাশয় লোক লাগাইয়া স্কুল-ঘরের জিনিস-পত্র বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এগুলি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কে ইহাদের বোঝা টানিয়া বেড়াইবে ? তবু নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ইহাদের তুলিয়া দিতে সরকার-মহাশয়ের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ায় বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী যত তাহার আবরণ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে, ততই সে কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ হইয়া এতটুকু হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য-সমারোহের মাঝে সব এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হইল যে, সেই মুহূর্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না !

আমাদের চোখের সমুখে স্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী !

বুকে মুখ গুঁজিয়া বাসন্তী কাঁপিতেছে ; চাপা গলায় কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল যে।

আসুক। বাড়ি নিতে এখনো দেরি আছে! পুব দিক ঘেঁসে চরও পড়ছে শুনছি—সবাই তো বলছিল এই বর্ষাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলেই বেঁচে গেলাম। ভয় কী, বাসন্তী ? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিস-পত্র স্তূপাকার করে রেখে লাভ কী ? দুজনে আবার ফাঁকা হয়ে যাব।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারব না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাব।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই স্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিতাই কর্মকারের ছেলে মুন্সেফ-কোর্টের সামান্য একটা পেশকারও আর হইতে পারিল না।

এখন একেবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি। ফুলের বাগানটাও গেছে। এখন এক পাড়ে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সমুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত,—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া, কাড়িয়া তাহারই মতো আমাদের সে বস্তুর জগতে একবারে উলঙ্গ করিয়া দিবে।

কৌচগুলিতে ধুলা জমিতেছে, আলমারির কাচগুলি আর পরিষ্কার করা হয় নাই। কার্পেটটা জায়গায়-জায়গায় ফুটা হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ডাবরে পাতাবাহারের গাছ দুইটা কবে মরিয়া গেছে—কে আর উহাদের আদর করিয়া জল দিবে! দেয়ালের বড়ো ক্লকটা বন্ধ, চাবি দিতে ভুলিয়া গেছি। অনেক দিন ধোপা আসিতেছে না—বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলি এত ময়লা হইয়া গেছে যে, যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কতদিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে থেকে কী হবে—চলো, পালাই।

বলিলাম,—নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠব। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারব না।

—যা কিছু অসহ্য, তাইতেই তো তীব্র আনন্দ আছে। বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমো খাইলাম। যেন ভালো লাগিল না। উহার চেহারা এই ঘর-বাড়িরই মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে। কতদিন উহাকে একটু আদর পর্যন্ত করি নাই। মৃত্যুর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে ক্ষণভঙ্গুর প্রেমের অভিনয় করিতেও হাসি পায়।

ভিতরের উঠান ছাড়াইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় সময় থাকিতে ছোট-খাটো একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই বাড়ি ছাড়িয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার-মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; তবু আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য হাতের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চট করিয়া ভাবিয়া নিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার—কোনটা ছাড়িয়া কোনটার প্রতি যে সে পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মাত্র শুইবার খাটখানা, বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় ভরিয়া একটা বড় ট্রাঙ্ক, লিখিবার ছোট একটি টেবিল, এমনি, মোটামুটি কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। আমার গল্পের খাতা ও বাসন্তীর গহনার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল—নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট ঘরখানি—রানীগঞ্জের টালিতে নয়, উলুখড়ে কোনোরকমে ছাওয়া হইয়াছে! চাকর সেই ঘরে একটি বাতি জ্বালিয়াছে দেখিলাম। বিপুলকায় গর্জমান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ মৃদু শিখাটিকে ভারি করুণ মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো, ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

অভয় দিয়া বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারব।

জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত,—ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে! কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া-গর্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড়, স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়তবেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—সাদা, গাঢ় জল। বেগের প্রাবল্যে কোথাও এতটুকু বিশ্রামের রঙ নাই—ফেনায়িত, প্রখর সাদা! অমন তীব্র শুভ্রতা চক্ষু মেলিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছি। তাহার ঘুম নাই, প্রবল আর্তকণ্ঠে কী যেন সে চাহিতেছে! তাহার ভাষা বুঝিতে পারি না, কী যেন সে চাহিতেছে! সেই ভাষা আমরা কি করিয়া বুঝিব!

হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হইল—হয়তো এক তাল মাটি পড়িল—সঙ্গে সেই শিমুলগাছটাও। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখি পাশে বাসন্তী নাই। চারিদিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে—চীৎকার করিয়া উঠিলাম: বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি, দক্ষিণের দরজাটা খোলা, প্রচুর উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে ধুলা উড়িতেছে—এত বাতাসে ও ধুলায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম: বাসন্তী। অজস্র কণ্ঠে নদী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল, নদীর ডাকে বাসন্তী কখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বুঝি।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। ঝাপসা অন্ধকারে খেজুর-গাছের নিচে কি-একটা কাপড়ের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসেছ যে!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল—একটুও ঘুম আসছে না! বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের তীরে তাহার এই ধ্যানময় স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নির্জনতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে আছ কী করতে? ঘরে চলো!

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ লাগছে। তুমিও আমার পাশে এসে বোসো না।

তাহার পাশে বসিলাম; কিন্তু তাহার পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে পারে—সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া আমিও জল দেখিতেছি। তাহার পর জল কখন চোখ হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—বাধাহীন অশরীরী বেগ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে রাখিয়াও নিজেকে এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। আগে তবু এখানে সেখানে কয়েকখানা নৌকা দেখা যাইত, ছইয়ের তলায় বসিয়া মাঝিদের রান্না ও গল্প-গুজবের শব্দ কানে আসিলে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতাম। সামনের রাস্তাটা ভাঙিয়া গেছে বলিয়া একটা গোরুর গাড়ির চাকার শব্দও আর শুনিতে পাই না। সব যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা শকুন অন্ধকারে পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। গায়ে ঠেলা দিয়ে কহিলাম,—এখান থেকে উঠে চলো, নইলে এবার ভেঙে পড়ব।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকিতে মনে হইল, উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে, এমন স্তব্ধ-মত্ততায় তন্ময় হইতে আর কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন এখুনি উহাকে আমার বাহুবন্ধন হইতে ছিনাইয়া নিবে! আর দেরি নাই!

আমাদের ঘিরিয়া সত্য-সত্যই অনেকখানি জায়গা লইয়া চিড় ধরিল। দুই বলিষ্ঠ হাতে মাটি হইতে উহাকে বুকের মধ্যে কাড়িয়া লইলাম। কোনোদিকে না চাহিয়া বাসন্তীকে বুকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

*

অবশ ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে, বাসন্তী ?

দুর্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল,—ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে রাখো। আমায় ছেড়ে দিয়ো না।

আমার স্নেহ দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিলাম। কহিলাম,—কেন তোমায় ছেড়ে দেবো ? কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখে ?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের গভীরতম মিলনের মুহূর্তকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যেন উদ্দাম প্রবাহে এই মুহূর্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তাহার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নিচে নদীর এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সময় থাকিতেই ছোট খড়ের ঘরে উঠিয়া আসিয়াছি। চাকর ছোট টেবিলের উপর তেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাট জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু রাতে আজ গল্প লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

লিখিবার খাতা ও গয়নার বাক্সটার সঙ্গে আরো কিছু খুচরা জিনিস সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষকালে কেন জানি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিয়াই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি একটা মূঢ় সন্দেহে বা বৈরাগ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া মুক্তির এই উজ্জ্বল ও প্রখর উলঙ্গতা দেখিতে শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ অমিতবিক্রম শ্বেতহস্তী আমাদের বাড়িটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—যে বাড়িতে বাসন্তী কার্পেট ও কৌচ বিছাইয়া ড্রয়িং রুম্ তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোঠায়

বসিয়া আমি যতো না লিখিয়াছি তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে বাড়িতে প্রকৃতির পরিবেশে পরস্পর দুই জনের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বাবা মার অপূর্ব বিচ্ছেদ-স্মৃতির স্বপ্নটি রাখিয়া গিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নির্মেঘ জ্যোৎস্না—এই জ্যোৎস্না-রাতে আমরা দুইজনে যে সিম্‌-গাছের তলায় বাঁশের মাচার উপর বসিয়া কতো গল্প করিয়াছি—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

অসহায় চোখের সামনে বাড়িটার মৃত্যু দেখিতে লাগিলাম।

বড়ো বড়ো ছবি, কৌচ-টেবিল-চেয়ার-আলমারি, বাসন-কোসন, খেলনা-পত্র, বিম-বরগা, ইঁট-কাঠ, জানলা-দরজা—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মতো কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমতো সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গের বস্তুর সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না।

মুহূর্তমধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির আকাশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সমস্ত কিছু আকাশের মতো সাদা হইয়া গেল।

সকালবেলার দিকে সরকার-মহাশয় গোরুর গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা গাড়িতে বোঝাই হইল। বাসন্তীকে লইয়া ঘুরপথে রেল ইস্টিশানএর দিকে রওনা হইলাম।

খড়ের ঘরে সরকার মহাশয় কিছুকাল আরো থাকিবেন ও বর্ষার শেষেও যদি পুবদিকের চর মাথা চাড়া দিয়া না উঠে, তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ট্রেনে চড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা কলিকাতায়ই যে যাইতেছি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যে বাগবাজারে তাহার বাপের বাড়িতে গিয়া উঠিব না, ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সগৌরবে ব্যঙ্গ করিবেন, আমার স্ত্রী হইয়া তাহা তাহার অসহ্য।

বলিতে কি, মামার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কালীঘাটের অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি মাত্র ঘর—একটিতে সামান্য কয়টি রান্নার সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের উপর মাদুর বিছানো শয্যা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নাই। দেয়ালে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলে ও গল্প লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া-দেখিয়া দরখাস্ত লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উত্তাল বেগে সমানে আগাইয়া আসিতেছে।

একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অহঙ্কারে কিছু দরকারি জিনিস-পত্র কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে কোথায় খুব সস্তায় নিলাম হইতেছে—চার টাকা দিলে অনায়াসে ঘরে একখানা করিয়া টেবিল ও চেয়ার আসে। কথাটা ভয়ে-ভয়ে বাসন্তীর কাছে উত্থাপন করিলাম। বাসন্তী ম্লান হইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাড়াটে বাড়ি, কখন উঠে যেতে হয় ঠিক নেই, জিনিসপত্র কাঁধে করে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? এই বেশ আছি।

টেবিল-চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া ঠিকে একটা ঝি রাখিলে বরং কাজ দিবে।

ভাড়াটে বাড়ি! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

নদী আমাদের বাড়ি ভাঙিয়াছে, কিন্তু সময়ের স্রোত আমাকে ও বাসন্তীকে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

গেল সোমবার হইতে ছোট খোকাটার জ্বর—ডাক্তার একজন

ডাকিয়া আনিলে হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি সারে, মিছামিছি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া এমন আর বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো কয়েকদিন যাক।

ঝি-র সঙ্গে বাসন্তী নিতান্ত খেলো শহুরে ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি-কে তাড়াইবার জন্য তাগিদ দিতে বাসন্তী আসিল, না, বাকি মাসের মাহিনা লইয়া বিদায় হইতে ঝি আসিল, সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আপিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার গ্রাহ্য নাই। রোদে তোশক মেলিবার জায়গা নাই বলিয়া ছারপোকার কামড়ে রাত্রে একটু ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া তাজমহলের ছবিওয়ালা সুন্দর একটা ক্যালেণ্ডার আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত ছেলে দুইটা কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেও সময়ের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

শুনিতেছি আপিসে কর্মচারীদের ছাঁটাই শুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিঁকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি ফেনিল জলের থেকে এ অনেক ভালো। টাইম্‌পিস্ ঘড়িটির মতো হৃৎপিণ্ড মৃদু-মৃদু ধুক-ধুক করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই একরকম ভালো লাগিতেছে। তীব্র সুখের মধ্যে এই যে, শত দারিদ্র্যেও শ্বশুরের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না হয় আরেকবার মামার পিপুলের দোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-জানি এখন কী করিতেছে·

অমর কবিতা

নির্মলা কী সম্পর্কে আমার মাসি হত। হাটখোলার ওদিকে তার শ্বশুর-বাড়ি। বড়ো বেশি আনাগোনা নেই। মাঝখানে শুধু উড়ো একটা খবর পেয়েছিলুম যে তার বছর খানেকের প্রথম খুকিটি এক দিনের জ্বরে হঠাৎ করে মারা গেছে।

জগৎ সংসারে সেটা এমন-কিছু বিচিত্র ঘটনা নয় যে তাকে নিয়ে অকারণ দীর্ঘশ্বাসে একটি মুহূর্তও ভারাক্রান্ত করে তুলব। খবরের কাগজের টুকরো সংবাদের মতোই ঐ খবরটার উপর ক্ষণিক চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলুম মাত্র। তলিয়ে দেখলেও এর বেশি নিশ্চয়ই দেখতে পেতুম না যে, নির্মলার নতুন বিয়ে হয়েছে, তার শরীরে বয়সের সবে বসন্ত, তার সময়ের সমুদ্রে এক-বছরের সামান্য একটা খুকির কী বা স্থান, কতোটুকু বা মূল্য!

হারিয়ে যেতে দিয়েছিলুম ঘটনাটাকে। এর মধ্যে একদিন, প্রায় মাস খানেক পরে, নির্মলা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। ভেবেছিলুম একটা কুৎসিত কান্নাকাটির অভিনয় শুরু হবে। মার সঙ্গে নির্মলার এই প্রথম দেখা—তার খুকি মারা যাবার পর। কিন্তু উলটোটা দেখে যেমন আশ্বস্ত হলুম, তেমনি, তারো চেয়ে বেশি হলুম বিস্মিত। শুনলুম, আমার পাশের ঘর থেকে শুনলুম, নির্মলা একবারে সে কথার কাছ ঘেঁসছে না, এটা-ওটা নিয়ে অবান্তর কথা কইছে, টুকরো-টুকরো কথায় হেসে উঠছে টুকরো-টুকরো করে। তার কথার বিষয় হচ্ছে, বাসএর রাস্তা যেন আর ফুরোতে চায় না : যা গরম পড়েছে,

বৃষ্টি কবে নামবে : আমাদের সংসারে মাসে ক মণ করে লাগে কয়লা !

মা-ও কথাটা ছুঁলেন না টের পেলুম। বললেন শুনতে পেলুম : এই ভর-দুপুরে, এতো রোদে—

নির্মলার স্বর হাসিতে পিছলে পড়ছে : না এসে আর কী করি বলো? করবার মতো কাজ তো একটা কিছু চাই হাতের কাছে।

মা বললেন,—পিনুকে কতোদিন থেকে বলছি তোকে একবার দেখে আসতে—

—সেই আমিই এসে একদিন সশরীরে উদয় হলুম। হাসিতে তার কথাগুলি যেন রোদ-লাগা রঙিন ঝিনুকের মতো ঝিকমিক করে উঠল : পিনু, পিনাকী কোথায়? আমি ওর কাছেই এসেছি। ওর সঙ্গে আমার ভীষণ একটা জরুরী কথা আছে।

আমি তখন টেবিলে মাথা নিচু করে বসে লিখছিলুম। হঠাৎ আলো-নেবানো অন্ধকার ঘরে জ্যোৎস্নার মলিন, দীর্ঘ একটি রেখার মতো নির্মলা আমার ঘরে, আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার সারা গায়ে বীতবর্ষণ আকাশের সুনীল, সস্মিত প্রখরতা। দুটি চোখ খুশিতে যেন অগাধ হয়ে উঠেছে। তার শাড়ির সব কটি ঝিলমিলে রেখায় যেন এই খুশির মৃদু, মদির অনুচ্চারণ।

বলে রাখা ভালো, নির্মলা আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নেমে এসেছে অবন্ধুর বয়সের সমতায়।

আমার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে সে জিগগেস করলে : কী লিখছ?

বললুম,—একটা গল্প।

নির্মলা পাশে নিচু একটা বেতের চেয়ার টেনে এনে বসল। বসবার সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত ভঙ্গিটা যেন ক্লান্তিতে কোমল হয়ে এল। ভালো করে তার দিকে চোখ ফেরালুম। তার আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন আবির্ভাবের সঙ্গে তার এই ঘন, বিস্তৃত উপস্থিতির যেন কোনো সুষাম্য

নেই। শাড়ির কুঞ্চিত সব রেখায় যেন কেমন একটা করুণ আলস্য এলোমেলো হয়ে আছে।

ম্লান গলায় সে বললে,—গল্প,—কেন, কবিতা আজকাল আর লেখো না?

স্ট্যাণ্ড-এর গায়ে কলমটা হেলিয়ে রেখে চেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে বললুম,—কখনো সখনো। খুব কম।

লাজুক হাসিতে নির্মলার সমস্ত মুখ ভিজে গেল। গাঢ়, অথচ করুণ গলায় বললে,—আমি একটা লিখেছি।

ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। বললুম,—বলো কী, তুমি কবিতা লিখেছ?

কথাটা যেন বিশ্বাসযোগ্য নয় আমার কথা বলার ধরনে তাই বোধ করি নির্মলার মনে হল। দেখলুম গাঢ় লজ্জায় তার চোখের নিম্ন প্রান্ত দুটি কালো, ঈষৎ সজল হয়ে উঠেছে। সে চেয়ারের মধ্যে যেন আরো ডুবে গেল; নিতান্ত অপরাধীর মতো ভীত, দুর্বল গলায় বললে —হ্যাঁ, একটা শুধু লিখেছি—শুধু একটা—তা-ও কতো কষ্টে, কতো কাটাকুটি করে।

অনাবিষ্ট, নির্লিপ্ত গলায় বললুম,—একদিন দেখিয়ো।

—হ্যাঁ, তোমাকে দেখাব বলেই তো নিয়ে এসেছি। নির্মলা হঠাৎ সর্বাঙ্গে মর্মরিত হয়ে উঠল। দুটি ভুরু প্রসারিত প্রতীক্ষায় ধনুকের মতো ধারালো।

এতোটা অবিশ্যি আশা করি নি। কবিতা সম্বন্ধে, বিশেষত প্রথমতম কবিতা সম্বন্ধে, লেখকমাত্রেরই একটি স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকে। লোকচক্ষুর কাছে তা প্রকাশিত করা যেন দৈহিক আবরণোন্মোচনের মতোই ভয়াবহ লজ্জাকর মনে হয়। অন্তত আমার তো তাই হত। কিন্তু নির্মলার এই নির্ভীক, নির্মল নির্লজ্জতায় মর্মে-মর্মে কণ্টকিত হয়ে উঠলুম।

ব্লাউজের তলা থেকে সে কয়েকটা আলগা কাগজের টুকরো বার করল। পৃষ্ঠাগুলির নম্বর মিলিয়ে গুছিয়ে দিতে-দিতে এগিয়ে এল

টেবিলের কাছে। গলা নামিয়ে, যেন গভীর কোনো পাপ স্বীকার করছে, নির্মলা বললে,—কাউকে বোলো না কিন্তু। এই একটা মাত্র লিখেছি—আজ প্রায় এক মাস ধরে। দয়া করে তুমি শুধু একটু জায়গায়-জায়গায় দেখে দাও। সব জায়গায় সমান মেলাতে পারি নি।

কাগজের টুকরোগুলি হাতে নিয়ে কৌতূহলী হয়ে জিগ্‌গেস করলুম : সমস্তটাই একটা কবিতা?

নির্মলা তার চেয়ারে ফিরে গেল। বললে,—হ্যাঁ। তবুও তো সব কথা এখনো লিখতে পারি নি। তুমি দেখ না পড়ে। বলো না কী কথা আর লেখা যায়।

রুদ্ধ নিশ্বাসে কবিতাটা পড়তে লাগলুম। নির্মলার প্রতি আত্মীয়তার খাতিরেই সেটাকে কবিতা বলছি। নিতান্ত সে কাছে, নাগালের মধ্যে বসে আছে; নিতান্তই সে মেয়ে, সমস্ত শরীরে তার এমন স্নেহশীতল শোকের শীর্ণতা : তার বসবার উদাস ভঙ্গিতে ধূসর প্রেতচ্ছায়া—তাই সে কবিতা পড়ে প্রবল উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠতে পারলুম না। নইলে এ-কবিতা এমনি হাতে এসে পড়লে, শপথ করে বলতে পারছি, আজ আমাদের বৈকালিক সাহিত্য-আড্ডায় প্রচুর একটা হাসির ভোজ দিতুম।

অনেক পরিশ্রম যে সে করেছে তাতে সন্দেহ নেই, করেছে অনেক কাটাকুটি, তার অনেক প্রসাধন,—কিন্তু ছন্দ বা মিল দূরে থাক, একটা বানান পর্যন্ত সে শুদ্ধ করে লিখতে পারে নি। বিষয়টা মিল্‌টনের প্যারাডাইজ্‌ লস্ট্‌-এর মতোই গুরু-গম্ভীর : তার খুকির মৃত্যুর উপর এক প্রকাণ্ড শোক-গাথা। কোথাও পার দেখা যাচ্ছে না, একটা বন্যা-আবিল উদ্বেল সমুদ্র যেন দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

তবু সব কথা নাকি সে লিখতে পারে নি। আর কী কথা লেখা যেত তাই ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম। তার খুকি দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে যেত, আলনায় তার জন্যে জুতো সাজিয়ে রাখা যেত না, জলের কুঁজোটা সে দু-দুবার ভেঙেছে—কোনো কথাই সে বাদ দেয় নি। তার উপর-মাড়িতে ছোট-ছোট দুটি দাঁত উঁকি মারত, দাঁত ওঠবার সময়টায় তার কী রকম অসুখ হয়, কোন

ডাক্তার আসে—সব কথা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্মাকার করে তুলেছে। তাকে কে কী নামে ডাকত, দিয়েছে তার একটা লম্বা ফিরিস্তি: শুধু নির্মলার দেয়া 'বুড়ি' বলে ডাকলেই সে বেশি সাড়া দিত, তার বাঁ কাঁধের উপর ছোট একটা জড়ুল ছিল, কবে ও কতোবার সে বসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মেঝের উপর পড়ে গেছে—এমনি দিনের পর দিন, পর্বের পর পর্ব, নির্মলা এক বিরাট মহাভারত লিখে এনেছে। তার অশিক্ষিত শোকের এই উচ্ছৃঙ্খল আড়ম্বর দেখে, বলতে কি, তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু হতে পারলুম না।

বললুম, চাপা বিরক্তির স্বরে বললুম,—এটাকে কী করতে হবে?

নির্মলা উৎসাহে জ্বলে উঠল; নরম গলায় জিগগেস করলে,—কেমন লাগল? চলবে?

ভীষণতর অবাক হলুম: বললুম—কোথায়?

যে কোনো মাসিকপত্রে। তোমার সঙ্গে অনেকেরই তো চেনা-শোনা। কোথাও চালিয়ে দিতে পারবে না?

কী বলা যায় কিছু ভেবে না পেয়ে বলে বসলুম,—বড্ড বড়ো হয়েছে যে।

—কই আর বড়ো! ছাপলে এই একটুখানি হয়ে যাবে। নির্মলা তার ম্লায়মান ছুটি চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরল: তবু তো আরো কতো কথা লেখবার ছিল, আরো কতো কথা লিখলে তবে বুকটা ঠাণ্ডা হত।

এবার অপরিমাণ কঠিন হতে হল। বললুম,—কিন্তু কিছুই কবিতা হয় নি যে।

—সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা। নির্মলা লঘু গলায় হেসে উঠল: জায়গায়-জায়গায় মিলগুলি একটু ঠিক করে দাও না। তোমার পাকা হাতে কতোক্ষণ আর লাগবে?

—শুধু মিল ঠিক করলেই কি হবে? তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অসহায়ের মতো বলে ফেললুম: তোমার এ-লেখা সম্পাদকরা কেউ ছাপবে না।

—কেন ? নির্মলা যেন শতখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

—কেনই বা ছাপবে বলো ? তোমার মেয়ে মরেছে তাতে বাংলা দেশের পাঠকদের কী এসে গেল ? তাকে কে চিনবে ?

নির্মলা প্রখর, ঝাঁঝালো গলায় বললে,—তবে এতো যে রাশি-রাশি প্রেমের কবিতা বেরোয় মাসে মাসে, তাতেই বা আমাদের, পাঠকদের কী এসে যায় ? তাদের মধ্যে কাকে আমরা চিনি ? সব তো আগাগোড়া মিথ্যে কথা, কেবল কতোগুলি কথার মার-প্যাচ।

হেসে বললুম,— কিন্তু ওগুলোর মাঝে ব্যক্তিক সীমা পেরিয়ে একটা বিশ্বলৌকিক আবেদন থাকে।

নির্মলা আমার দিকে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল।

বললুম বুঝিয়ে : ওগুলো এমনভাবে লেখা হয় যাতে পাঠকরা সবাই লেখকের সঙ্গে সমান অনুভব করতে পারে।

নির্মলা ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল ; বললে,—আমারটাও তো তাই। এমন কোন বাড়ি পাবে তুমি বাঙলা দেশে, যেখানে কোনো না কোন মার বুক খালি করে তার শিশু গেছে না পালিয়ে ? আমার কবিতা পড়ে সে-সব মেয়েরা নিশ্চয় তাদের দুঃখে সান্ত্বনা পাবে।

তর্ক করা বৃথা। কাগজের টুকরোগুলির উপর একটা বই চাপা দিয়ে রেখে বললুম,—ও থাক। আমি তোমাকে আরেকটা নতুন কবিতা লিখে দেব।

নির্মলা পাংশু মুখে বললে—সে কবিতায় তুমি আমার এতো কথা কখনোই লিখে দেবে না।

—তা একটু ছোট হবে বৈ কি। কিন্তু আশা করি, কবিতা হবে।

—থাক আমার সে কবিতা। যে কবিতায় আমার 'বুড়ি' নেই, আমি তা দিয়ে কী করব ? বলে ক্ষিপ্র হাতে কাগজের টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে নির্মলা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হাসলুম, মনে মনে হাসলুম। নির্মলা তার বাড়ি ফিরে গেলে, সবাইর সঙ্গে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চগ্রামে গলা

ছেড়ে দিলুম। ঠাট্টায় আর-সবাইও শানিয়ে উঠল। ভাগ্যিস তার মেয়ে মরেছিল, তাই তো নির্মলা মাসান্তে এমন একটি জলজ্যান্ত কবি হয়ে উঠতে পেরেছে। সেই নির্মলা, নিজের নামের বানান করতে পর্যন্ত যে হোঁচট খায়। বাঙলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য বলতে হবে।

সবাই মত স্থির করলে এই বলে যে এটা ভীষণ বাড়াবাড়ি: শোচনীয় প্রায় হাস্যাস্পদের কোঠায় এসে পড়েছে। অল্প জলের পুঁটিমাছই বেশি ফরফর করে,—এ হচ্চে এক রকমের ঢঙ। দুঃখটা সত্যিকারের হলে তা নিয়ে আর এমন সে জাঁক করে বেড়াত না, চুপ করে যেত। যেখানে যতো বেশি ফাঁপা, সেইখানেই ততো বেশি বাজনা বাজে। যেখানে যতো বেশি কথা, সেখানে ততো কম গভীরতা! কেউ চলে গেলে নাকি তার জন্যে কবিতা করে কাঁদতে হয়!

তারপর অনেক দিন নির্মলার সঙ্গে দেখা নেই।

একদিন বিকালের দিকে ও পাড়ায় গিয়ে পড়েছিলুম বলে নির্মলাকে একবার দেখে যেতে ইচ্ছে হল। বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই, তার স্বামী নারায়ণের তখনো বাড়ি ফেরবার সময় হয় নি। এজমালি ঝি নিচে কাজ করছিল, দরজাটা খোলা। সটান উপরেই উঠে গেলুম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ হাতি নির্মলার ঘর। এ-পাশে ও-পাশে অন্যান্য ভাড়াটেদের এলেকা, পরদা ও পার্টিশনে খণ্ড-বিখণ্ড। যে দুয়েকবার এসেছি তাতে ওদের বাড়ির চৌহদ্দিটা আমার মুখস্থ।

দরজার সামনে সম্মোহিতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। নিচে, মেঝের উপর দরজার দিকে পিঠ করে, উবু হয়ে আধখানা শুয়ে নির্মলা গভীর অতন্দ্র মনোযোগে কী যেন একটা সূক্ষ্মতাসূচক কাজ করছে। পিঠময় চুল রয়েছে ব্যস্ততায় এলোমেলো, বিপর্যস্ত শাড়িতে কী যেন তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণুতা। যেন আর অপেক্ষা করা যাচ্ছে না—তার সমস্ত ভঙ্গিতে সেই দুঃসহ ঔৎসুক্য।

ডাকলুম: নির্মলা।

যেন কতোগুলি শিহরায়মাণ, বিশীর্ণ রেখা নির্মলার সারা শরীরে ছিটিয়ে পড়ল। এ কদিনে তার চেহারার যে এতোটা পরিবর্তন হবে আশা করতে পারিনি। আমাকে দেখে সে সহজ সৌজন্যে হেসে উঠল বটে, কিন্তু সেই হাসি ধুয়ে দিতে পারল না তার চোখের অনিদ্রা, তার শরীরের ক্লান্তি, তার পরিপার্শ্বের এই গুমোট নির্জনতা।

সে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—বোসো।

বললুম,—কী করছিলে বসে-বসে ?

অসঙ্কোচ হাসিমুখে সে বললে,—ছবি আঁকছিলুম !

—ছবি আঁকছিলে ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—কার ?

—কার আবার ! দেয়ালের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে সগর্বে বললে,—দেখছ না, এরি মধ্যে একা-একা কতো ছবি এঁকে ফেলেছি।

চারদিকের দেয়ালে অগুন্তি ছবি টাঙানো। তার চোখ অনুসরণ করে বললুম,—অনেক রকম ছবি আঁকতে শিখেছ যে। একটা খরগোস, একটা ইঁদুর—ক্যাঙ্গারুর ছবিটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।

অনর্গল কণ্ঠে নির্মলা খিলখিল করে হেসে উঠল ; বললে—কোনোটাই খরগোস ইঁদুরের নয় !

—নয় ?

—না, সব আমার সেই খুকির ছবি। নির্মলার মুখে সেই হাসি কিন্তু এখনো অস্ত যায় নি : তার নানা ধাঁচের নানা ভঙ্গির ছবি ওগুলো, —কোনোটা বসে, কোনোটায় হামাগুড়ি দিচ্ছে, কোনোটায় বা চিত হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে ! ওর কোনো ফটোগ্রাফ তুলে রাখি নি কি না, বড়ো অসুবিধে হয়। কোনোটা হয় খরগোস, কোনোটা হয় ক্যাঙ্গারু। নির্মলা আরেক পশলা হাসল।

অপ্রতিভ হয়ে বললুম,—না, না, মন্দ হয়েছে কী !

—মন থেকে আঁকতে হয়, অথচ মন হাতড়ে দেখি তার চেহারার এক কণাও আর মনে নেই। নির্মলা স্নিগ্ধ গলায় বললে,—তার কপালটা চওড়া ছিল না ছোট ছিল মনে করতে পারি না। নাকটা চোখা করব না দুপাশে একটু ফুলিয়ে দেবো ভেবে-ভেবে আমার দিন

কেটে যায়। তার পায়ের গোড়ালি দুটোর গড়ন শত মাথা খুঁড়লেও মনে আসে না। মহা মুশকিলেই পড়া গেছে।

বললুম,—অনেক ছবিই তো আঁকলে, আর কেন?

—তবু একটাও মনের মতো হচ্ছে না। নির্মলা হাসিতে ঝিলিক দিলে, তুমিও তো গল্প-কবিতা আর কম লেখো নি, তবু থামতে পাচ্ছ কই? জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লিখেই যেতে হবে—কী বলো?—বাঁচতে হবে তো?

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালুম: তোমার সেই কবিতাটা কী করলে?

—ছাপিয়ে তো আর দিলে না, তাই, মুচকে হেসে নির্মলা বললে,—তাই ওটাকে বাঁধিয়ে দেয়ালের ঐখানটায় টাঙিয়ে রেখেছি। আমি একাই পড়ি, কী আর করব বল, আমার দুঃখ তো আর পৃথিবীর সন্তানহারা মায়েরা কেউ বুঝল না, আমিই ওটা পড়ে-পড়ে তাদের সবাইকার দুঃখ বুঝি।

বিতৃষ্ণ গলায় বললুম—মিছিমিছি তুমি এ-সব করছ কেন?

—বললুম না, বাঁচতে হবে তো?

তার মুখের উপর কটাক্ষের তীব্র একটা প্রহার করলুম: বাঁচতে গিয়ে শরীরের যা হাল করেছ, নমুনাখানা একবার চেয়ে দেখেছ আয়নায়?

নির্মলা তেমনি দুঃখলেশহীন, প্রশান্ত মুখে হেসে উঠল। বললে,—আমি গেলে যাব, কিন্তু আমার খুকি তো বাঁচবে। অন্তত আর সব লেখক বা শিল্পীর মতো আমিও তো এই স্পর্ধা নিয়ে মরতে পারব।

এবার আরো অন্তরঙ্গ হয়ে এলুম। আর্দ্র, নিম্ন স্বরে বললুম,—যে সারা জীবনের মতো চলে গেছে তার ছায়া আঁকড়ে থাকবার এই আড়ম্বরে লাভ কী, নির্মলা?

—চলে গেছে বলছ কী! নির্মলা রৌদ্রঝলকিত অসির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: তাকে আমি যেতে দিলুম কই? এখন সে দিব্যি ভাঙা-ভাঙা পায়ে হাঁটতে শিখেছে, আধো-আধো গলায় স্পষ্ট সে আমাকে এখন 'মা' বলে ডাকে। তার জন্যে এখন দস্তুরমতো আমি ফ্রক সেলাই

করছি। ঐ দেখ, রাত্তির বেলা সে আমার কাছে এসে শোয়। বলে খাটের পাতা বিছানাটার দিকে ইশারা করে সে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল।

দেখলুম ছোট একটা বালিসে মাথা দিয়ে বড়ো একটা ডল শুয়ে আছে, গলা পর্যন্ত তার একটা কাঁথা টানা। শিয়রের কাছে ছোট-ছোট কতকগুলি কাঁথার স্তূপ। খাট থেকে যাতে না পড়ে যায় সেই জন্যে মোটা একটা পাশ-বালিশের ভার চাপিয়ে তাকে নির্জীব, আবৃত করে রাখা হয়েছে।

চমকে উঠলুম: এ কী?

নির্মলা আরেক চোট হেসে উঠল: বুঝছ না? ও আমার খুকি। একা-একা শুলে কিছুতেই আমার ঘুম আসে না।

নির্মলার শাশুড়ীর সঙ্গে কথা হল। তিনি নির্মলাকে ব্যঙ্গে ও ভর্ৎসনায় জর্জর করে তুললেন। লক্ষ্য করলুম নির্মলার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, ফিকে-হয়ে-আসা দিনের আলোয় একমনে তার ছবি এঁকে চলেছে। এদিকে সংসার গেল উচ্ছন্নে, শাশুড়ী বকে যেতে লাগলেন: আর উনি কিনা হাতা-খুন্তি ফেলে রঙ আর তুলি নিয়ে বসেছেন! সমস্ত-কিছুরই একটা সীমা আছে, শ্রী আছে—তা সুখই বলো, আর শোকই বলো। তোমার কিসের দুঃখ জিজ্ঞেস করি? এই উজ্জোন বয়েস, একটা ছেড়ে কতো ছেলের তুমি মা হবে, পা ছড়িয়ে কাঁদবার তোমার সময় কোথায়? যার জন্যে শোক করছ তার জন্যে তো দুঃখ পায় না, পায় যে শোক করছে তাকে দেখে হাসি। যাও, উনুনে এবার আগুন দাও গে যাও।

—এই যাচ্ছি মা, নির্মলা তার ছবির উপর ঝুঁকে পড়ল: আর একটুখানি শুধু বাকি।

নারায়ণ এল, আফিস ফেরত। দেয়ালের পর দেয়ালের আড়ালে দিন গেছে তখন হারিয়ে। ঘরের মধ্যে অশরীরী অবাস্তবতার একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। সেই সঞ্চরমাণ নিঃশব্দ ধূসরতায় নির্মলাকে যেন আর পৃথিবীর মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না।

নারায়ণ বেশ বিষয়-বুদ্ধিতে আঁটোসাটো, নিরেট ভদ্রলোক। তার

একটা সহজ পরিমিতিবোধ আছে। গোড়ায়-গোড়ায় দুঃখটা তাকেও লেগেছিল প্রচণ্ড, কিন্তু যা পুরুষের ধর্ম, ক্ষতিকে সে বুদ্ধি দিয়ে মীমাংসা করে, হৃদয় দিয়ে নিষ্পরিমাণ করে তোলে না। গোড়ায়-গোড়ায় নির্মলার প্রতি সম-মমতায় সে-ও উচ্ছ্বসিত ছিল, কিন্তু এখন একেবারে বিরক্তির অসহনীয়তার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁচেছে। এখন দুজনেই তারা একা : তাদের শয্যার মাঝখানে খুকির মৃত-মূর্তি।

শেষে, কটূক্তিতে নারায়ণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। আমাকে লক্ষ্য করে নির্মলাকে শুনিয়ে সে বললে,—দিন-রাত কেবল খুকি আর খুকি। খুকি ছাড়া ওর জীবনে যেন আর কোনো জগৎ নেই।

—তা ছাড়া আবার কী। হাওয়ায় বেঁকে-যাওয়া ছবিগুলি দেয়ালের উপর সোজা করে বসাতে-বসাতে নির্মলা বললে,—খুকিকে পাব বলেই তো আমি—আমার সব।

—তাই আমার একেক সময় শখ হয়, পিনুবাবু, নারায়ণ হেসে বললে,—মরে যদি এমনি সেবা পাই। না মরলে তো আর আমরা মূল্যবান হতে পারি না।

সেই ঈষৎ-ঘনিয়ে-আসা থমকে-দাঁড়ানো অন্ধকারে নির্মলা হঠাৎ ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল : তা হলে বলতে চাও খুকিকে আমি একেবারে হারিয়ে যেতে দেব? মেঝে-দেয়ালে কোথাও তার একটা চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না? তা হলে সেই ভীষণ শূন্যতায় আমি বাঁচব কী করে?

নারায়ণ বললে,—কিন্তু সব কিছুরই একটা শেষ আছে। এমন কি সময়ের পর্যন্ত। আতিশয্যকে আমরা কক্ষনো বিশ্বাস করি না। তোমার এই শোকের উৎসব দেখে সবারই সন্দেহ হয়, নির্মলা, সত্যি-সত্যি তুমি এখনো খুকিকেই ভালবাসছ কিনা, না, নিজের এই দম্ভকে।

—না, খুকিকে আমি কোনোদিনই ভালোবাসিনি তো। নির্মলা অন্ধকারে অদ্ভুত করে হেসে উঠল : তুমি তো সে-কথা বলবেই। তাকে হারিয়ে আমার কতো ঐশ্বর্য, কতো সুখ।

অন্ধকারের অবরুদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো নির্মলা ঘর থেকে ধীরে-ধীরে বার হয়ে গেল।

—পাগল! একেবারে ছেলেমানুষ। নারায়ণ অসহায়ের মতো বললে,—কে তাকে বোঝাবে, কে বা করবে বারণ? আমার কাছে পর্যন্ত সে আজকাল প্রচ্ছন্ন। আমাকে মনে করে সে তার খুকির শত্রু, তার খুকির কথা আমি ভুলিয়ে দিতে চাই।

বললুম,—এখান থেকে ওকে নিয়ে যান না-হয়।

—পাগল! কে ওকে সে-কথা বলবে? এই ঘরে ও শেকড় গজিয়ে বসেছে। বাড়ি বদলানোর কথা পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারে না। নারায়ণ গলা নামাল: আর-আর বাসিন্দাদের কাছ থেকে কম গঞ্জনা, কম বিদ্রূপ তো ওর সহ্য করতে হয় না—তাতেও ওর হুঁশ নেই।

যাবার উদ্যোগ করতে-করতে বললুম,—এতো বাড়াবাড়ি দেখলে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবেই।

—বাইরের লোকের কথা ছেড়ে দিন, এমন কি আমার পর্যন্ত আর সহানুভূতি দেখাবার প্রবৃত্তি হয় না। নারায়ণের গলা রুক্ষ হয়ে এল: খানিকক্ষণ পর্যন্ত সহানুভূতি দেখানো যায়, তারপরেই সেটা বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে। নইলে ভাবুন, ঘুমের মধ্যে বারে-বারে উঠে সে পুতুলের কাঁথা বদলায়, সময়মতো রোজ স্নান করায় লুকিয়ে, নিজের খাবার সময় ওটাকে কোলে নিয়ে বসে। পাশের বাড়ির একটা ঘরে ওটাকে এক সময় রেখে এসে বাইরের থেকে দরজায় ঘা মারে: আমার খুকু কি তোমাদের বাড়ি এসেছে? নারায়ণ উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল: কিছু বলতে যান, কেঁদে বাড়ি মাথায় করবে। স্ত্রীর অনেক রকম ফ্যাশান যোগাতে হয় শুনেছি, কিন্তু আমার কপালে হয়েছে এ নতুন রকম।

নামছি, সিঁড়ির উপর নির্মলা আমাকে ধরে ফেলল। বললে—তোমাকে একটা জিনিস কিন্তু এখনো দেখানো হয় নি।

বললুম,—কী?

—একতাল কাদা দিয়ে খুকির একটা মূর্তি গড়ছিলুম। সেটা এখনো শেষ হয় নি। আরেক দিন এসে দেখে যেয়ো।

বাড়িতে ফিরে আত্মীয়-মহলে সবিস্তারে সেই কাহিনী বললুম। খুকি আঁকতে ইঁদুর এঁকেছে, পুতুলের সে কাঁথা বদলায়! হেসে সবাই

কুটপাট। এমন ঢঙের কথা বাপের জন্মে কেউ কোনোদিন শোনেনি।

অথচ এরাই একদিন তার সন্তানবিয়োগে গভীর সান্ত্বনা দিয়েছিল। সেই শোকের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সবাই এখন সন্দিহান হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, তারপর, অনেক দিন পর, একদিন খবর পেলুম নির্মলা শোকের সমস্ত সাজসজ্জা বিসর্জন দিয়ে একান্তরূপে হালকা, সহজ হয়ে উঠেছে। ছিঁড়ে ফেলেছে সে দেয়ালের সব ছবি, পুড়িয়ে দিয়েছে সেই কবিতাটা, পুতুলটা ভেঙে টুকরো-টুকরো। খুকির কথা আজ যে তাকে বলতে আসবে তার উপর সে খড়্গহস্ত। তখুনিই দেবে তাকে আঁচড়ে কামড়ে, ক্ষতবিক্ষত করে। খুকিকে সে আজ নিশ্চিহ্ন ভুলে গেছে।

তাকে দেখতে গিয়েছিলুম। একতাল কাদা দিয়ে সে একদিন খুকির মূর্তি গড়বার কল্পনা করেছিল, গিয়ে দেখি, তাতে সে নিজেরই মূর্তি তৈরি করে বসেছে। ঘরটা বাইরে থেকে শিকল দেয়া। নারায়ণ বললে, এ সময়টা সে কিছু ভালো থাকে, হয়তো আপনাকে চিনতেও পারে বা।

নারায়ণের সঙ্গে পা টিপে-টিপে সেই ঘরে ঢুকলুম। শুভ্রতায় উলঙ্গ সে ঘর। শূন্য মেঝের উপর এক পিণ্ড মাংসের মতো তালগোল পাকিয়ে নির্মলা বসে আছে। আঙুলের সূক্ষ্ম নখ দিয়ে একমনে মেঝেটা চিবে ফেলবার চেষ্টা করছে, আমাদের উপস্থিতিতে তার চারপাশে কোথাও এতোটুকু আবর্ত উঠল না। উদাসীনতায় সেও অখণ্ড।

নারায়ণ বললে,—একে চিনতে পার, নির্মলা? চেয়ে দেখ দিকি।

নির্মলা চোখের একটি পলকও তুলল না। মেঝের দিকে তাকিয়ে আপনমনে নিঃশব্দে হেসে উঠল। তার ঠোঁটের উপর হাসির সেই অশরীরী, বিশীর্ণ রেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভয় করতে লাগল। তবু সাহস করে তার কাছে গিয়ে ডাকলুম : নির্মলা।

এবারো তার সাড়া নেই। শুধু হাসির সেই বঙ্কিম রেখাটি আলস্যে আরো প্রসারিত হয়ে পড়ল। কী ভঙ্গি দেখে নারায়ণ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে,—এবার পালাই চলুন, এখুনি আবার ভায়োলেণ্ট হতে শুরু করবে।

পালিয়ে এলুম। নারায়ণ দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তিরশ্চী

১

সবাইর মুখের উপর সটান বলে বসলুম: বিয়ে যখন আমিই করছি, মেয়েও আমিই দেখতে যাব। তোমরা সব পছন্দ করে এলে পরে আমি গিয়ে হয়কে নয় করে দিয়ে এলুম—সেটা কোনো কাজের কথা নয়। মাথার দিকে হোক, ল্যাজের দিকে হোক, পাঁঠাটা যখন আমার, আমাকেই কাটতে দাও। যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

প্রস্তাবটায় কেউ আপত্তি করলে না। তার প্রধান কারণ আমি চাকরি করছি, আর সেটা বেশ মোটা চাকরি।

বাবা দিন ও সময় দেখে দিলেন, আমার মামাতো ভাই রাধেশ আমার সঙ্গে চলল।

বলা বহুলতরো হবে, সেদিনের সাজগোজের ঘটাটা আমার পক্ষে একটু প্রশস্তই হয়ে পড়েছিল। ইদানীং বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল বলে আমি আমার কোঁচার ঝুলটা পঞ্চাশ-ইঞ্চিতে নামিয়ে এনেছিলুম, কিন্তু সেদিন যেন পঞ্চাশ ইঞ্চিতেও আমার পায়ের পাতা ঢাকা পড়ছিল না। চাকরকে বিশ্বাস নেই, জুতোয় নিজেই বুরুশ করতে বসলুম। এবং রাধেশ যখন আমাকে তাড়া দিতে এল, দেখলুম মুখটা নির্মূল নির্মল করে এক মুঠো কিউটিকুরা ঘষে আমি তার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারি নি।

ব্যাপারটা নির্জলা ব্যবসাদারি, তবু মনে নতুন একটা নেশার আবেশ আসছিল। বলতে গেলে, বইয়ের থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম

বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে-মনে এত সচেতন হয়ে জীবনে এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিয়ে করব এই ঘটনাটার মধ্যে তত চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হাঁ' বললেই এত বড়ো পৃথিবীর কে-একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমেষে আমার একান্ত হয়ে উঠবে—এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি, কিন্তু সাহস করে একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।

গ্রহ-নক্ষত্রদের চক্রান্তে অন্ধ, অভিভূত হয়ে রাধেশের সঙ্গে কালী ঘাটের ট্র্যাম ধরলুম।

ভাগ্যিস রাধেশ গোড়াতেই আমাকে কন্যাপক্ষীয়দের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছিল, নইলে, তার সাজগোজের যে বহর, তাকেই তাঁরা পাত্র বলে মনে করতেন, অন্তত মনে করতে পারলে সুখী যে হতেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুরুষের শোভাই নাকি তার চাকরি, সেই ভরসায় রাধেশের ভ্রাতৃভক্তিকে ভূয়সী স্তুতি করতে-করতে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এলুম।

যবনিকা কখন উঠে গেছে, রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব হল। প্রকাণ্ড ঘরটা যেন রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দতায় পাথর হয়ে আছে। মেঝের উপর ঢালা ফরাস, তারই মাঝখানে ছোট একটি চেয়ার। টিপয়ের উপর কড়া ইস্ত্রির ফর্সা একটি ঢাকনি: একপাশে দোয়াত-দানিতে কালি-কলম, অন্যদিকে স্তূপীকৃত কতকগুলো বই। অদূরে ছোট একটি অর্গ্যান। সেটিংটা নিখুঁত। ওধারে লম্বাটে একটা খালি টেবিলের দুধারে যে অবস্থায় মুখোমুখি কখানা চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হল, ওখানে উঠে গিয়েই আমাদের মিষ্টিমুখ করবার অবশ্যকর্তব্যটা পালন করতে হবে। মনে হল, রিহার্স্যাল দিয়ে-দিয়ে ভদ্রলোকদের পার্টগুলি আগাগোড়া মুখস্থ।

টিপয়টার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দুখানা চেয়ারে দুজন বসলুম।

অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের, সত্যি করে বলা যাক, দর্শিকার অভাব দেখলুম না। জানলার আনাচে-কানাচে মেয়েদের চোখের ও আঙুলের সঙ্কেতগুলি রাধেশের প্রতি এমন অজস্র ও অবারিত হয়ে উঠতে লাগল যে হাতে নেহাত চাকরিটা না থাকলে তাকে জায়গা ছেড়ে সটান বাড়ি চলে যেতুম। রাধেশ যে বছর দুয়েক ধরে বি-এ পরীক্ষায় খাবি খাচ্ছে সেইটেই আমার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাঁচোয়া।

হ্যাঁ, মেয়েটি তো এখন এসে গেলেই পারে। ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি।

চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কাজ করছে। অস্পষ্ট করে অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে—বিস্তৃত শাড়ির খশখশ ও চুড়ির টুকরো-টুকরো টুং-টাং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দের মতো বিবশ একটা তন্দ্রার কুয়াশা এনে দিচ্ছিল। তার সঙ্গে অনেকগুলো চাপা কণ্ঠের অনুনয় ও তারো অনুচ্চারিত গভীরে কার যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেই লজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মতো স্পষ্ট টের পেলুম।

রাধেশের কনুইয়ের উপর অলক্ষ্যে একটা চিমটি কাটতে হল।

কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে রাধেশ বললে—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে নটা পর্যন্ত ভালো সময়।

তাড়া খেয়ে ভদ্রলোকদের একজন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ফিরতে তাঁর দেরি হল না; বললেন: এই আসছে।

এবং নতুন করে প্রস্তুত হবার আগেই মেয়েটি ঢুকে পড়ল। ঠিক এল বলতে পারি না, যেন উদয় হল। অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্যে ভঙ্গিটা শিথিল, ক্লান্ত হয়ে এসেছিল, তাকে যথেষ্ট রকম ভদ্র করে তোলবার পর্যন্ত সময় পেলুম না। সবিস্ময়ে রাধেশের মুখের দিকে তাকালুম।

দেখলুম রাধেশের মুখ প্রসন্নতায় বিশেষ কোমল হয়ে আসে নি। তা না আসুক, আমি কিন্তু এক বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হলুম। আর

যাই হোক, মেয়েটি রাধেশের যোগ্য নয়। আর যাই থাক বা না-থাক, মেয়েটির বয়েস আছে।

টিপয়ের সামনের চেয়ারটা একেবারে লক্ষ্যই না করে মেয়েটি ফরাসের এককোণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। তার আসা ও বসার এই ত্বরাটা একটা দেখবার জিনিস। তার শরীরে লজ্জার এতটুকু একটা দুর্বল আঁচড় কোথাও দেখলুম না। প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, চঞ্চল সেই শরীর একপাত নিষ্ঠুর ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে। কোনো কিছুকেই যেন সে আমলে আনছে না, সব কিছুর উপরেই সে সমান উদাসীন।

বৃথাই এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে তার সাজগোজের শব্দ শুনছিলুম, আমার জীবনের আজকের ভোরবেলাটির মতোই মেয়েটি একান্ত পরিচ্ছন্ন, বোধহয় বা বিষাদে একটু ধূসর। পরনে আটপৌরে একখানি শাড়ি, খাটো আঁচলে দুই কাঁধ ঢাকা, হাতে দু-এক টুকরো ঘরোয়া গয়না, কালকের রাতের শুকনো খোঁপাটা ঘাড়ের উপর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই তো তাকে দেখবার। এড়িয়ে এসেছে সে সব আয়োজন, ঠেলে ফেলে দিয়েছে সব উপকরণের বোঝা : সে যা, তাই সে হতে পারলে যে বাঁচে। কিন্তু কেন এই ঔদাস্য? মনে-মনে হাসলুম। আমি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে তার এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তাকে লোলুপদৃষ্টি পুরুষের সামনে রূপের পরীক্ষা দিতে এসে ক্লান্ত, বিরক্ত, কলুষিত হতে হয় না।

গায়ের রঙটা যে রাধেশের পছন্দ হয় নি তা প্রথমেই তার মুখ দেখে অনুমান করেছিলুম। বিনয় করে লাভ নেই, মেয়েটি দস্তুরমতে কালো। চামড়ার তারতম্য-বিচারের বেলায় এমন রঙকে আমর সাধারণত কালোই বলে থাকি। শুদ্ধ ভাষায় শ্যামবর্ণ বলতে পারে বটে, কিন্তু টুইডলডাম ও টুইডলডিতে কোনো তফাত নেই।

ভদ্রলোকের পাট সব মুখস্থ। একজন অযাচিত বলে বসলেন : এমনিতে গায়ের রঙ ওর বেশ ফর্সা, কিন্তু পুরীতে চেঞ্জে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে-করে এমনি কালো হয়ে এসেছে।

কিন্তু, মনে-মনে ভাবলুম, এর জন্যে এত জবাবদিহি কেন? মেয়েরা যেমন শুধু আমাদের অর্থোপার্জনের দৌড় দেখছে, তাদের বেলায় আমারও কি তেমনি শুধু তাদের চামড়ার বুনট দেখব।

ভদ্রলোকের একজন আমাকে অনুরোধ করলেন: কিছু জিগ্‌গেস করুন না।

একেবারে অথই জলে পড়লুম। এমন একখানা ভাব করলুম যেন আমাকেই যদি আলাপ করতে হয় তবে ঘরে রাজ্যের এত লোক কেন?

ভদ্রলোকদের আরেকজন টিপয় থেকে একটা বই তুলে বললেন—কিছু পড়ে শোনাবে?

আমার কিছু বলবার আগেই রাধেশ এগিয়ে এল: না। ফার্সট ডিভিশনে যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাকে পড়াশুনার বিষয় কিছু প্রশ্ন করাটাই অবান্তর হবে। চেয়ারের মধ্যে রাধেশ উশখুশ করে উঠল, গলাটা খাঁখরে মেয়েটিকে জিগ্‌গেস করলে: তোমার নাম কি?

কী আশ্চর্য প্রশ্ন! ম্যাট্রিক পাশের খবর পেয়েও তার নামটা কিনা সে জেনে রাখে নি।

দেয়ালের দিকে মুখ করে মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় বললে,—সুমিতা ঘোষ।

মনের মধ্যে যুগপৎ দুটো ভাব খেলে গেল। প্রথমত, দিন কয়েক পরে নাম বলতে গিয়ে দেখবে তার ঘোষ কখন আমারই মিত্র হয়ে উঠেছে—দেহ-মনে এমন কি নামে পর্যন্ত তার সে কী অদ্ভুত পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, রাধেশের এই ইয়াকি আমি বার করব। তার মাস্টারের এই সম্মানিত, উদ্ধত ভঙ্গিটা যদি সুমিতার পায়ের কাছে প্রণামে না নরম করে আনতে পারি তো কী বলেছি!

আলাপের দরজা খোলা পেয়ে রাধেশের সাহস যেন আরো বেড়ে গেল। বললে,—খবরের কাগজ পড়?

সুমিতা চোখ নামিয়ে গম্ভীর গলায় বললে—মাঝে-মাঝে।

তবু রাধেশের নির্লজ্জতার সীমা নেই। জিগ্‌গেস করলে: বাঙলা গভর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারির নাম বলতে পার?

ভুরু দুটি কুটিল করে সুমিতা বললে,—না।

—উনিশ শো বাইশে গয়ায় যে কংগ্রেস হয়েছিল তার প্রেসিডেণ্ট কে ছিল?

সুমিতা স্পষ্ট বললে,—জানি না।

রাধেশের তবু কী নিদারুণ আস্পর্ধা! জিগ্‌গেস করলে: আন্না-মালায়ে যে একটা নতুন ইউনিভার্সিটি হয়েছে তার খবর রাখো? জায়গাটা কোথায়?

সুমিতা বললে,—কী করে বলব?

রাধেশ যেন তার দু-বছরের পরীক্ষা-পাশের অক্ষমতার শোধ নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে বসে তার কান মলে দেয়া সম্ভব ছিল না, গোপনে আরেকটা চিমটি কেটে তাকে নিরস্ত করলুম।

সত্যিকারের দেখাটা মানুষের সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে। সুমিতাকে তাই লক্ষ্য করে বললুম,—এবার তুমি যেতে পার।

যা ভেবেছিলুম তাই, তার সেই শরীরের নির্ঝরিণীতে ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কটি রেখা মুক্তির চঞ্চলতায় ঝিকমিক করে উঠল। বসার থেকে তার সেই হঠাৎ দাঁড়ানোর মাঝে গতির যে তীক্ষ্ণ একটা দ্যুতি ছিল তা নিমেষে আমার দুচোখকে যেন পিপাসিত করে তুললে। সুমিতা আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না, যেন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, এমনি তাড়াতাড়ি পিঠের সংক্ষিপ্ত আঁচলটা মুক্তিতে আলুলায়িত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিক চলে গেল বলতে পারি না, যেন গেল নিবে, গেল হারিয়ে।

মনে মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাত আগে হয়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মতো মুক্তিতে বিস্ফারিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতুম, কিংবা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু-পিছু। আজ যে এত বিমুখ, সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হয়ে উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন

আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ দুটিকে শিথিল করতে চাইবে না।

আমি যেন ঠিক তাকে চলে যেতে বললুম না, তাড়িয়ে দিলুম—ভদ্রলোকের দল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন,—অন্তত গানটা ওর শুনতেন। স্কুলে ও উপাধি পেয়েছে গীতোর্মিমালিনী।

আরেকজন বললেন,—এই দেখুন ওর সব সেলাই। স্কার্ফ, মাফলার, টেপেস্ট্রি—যা চান।

আরেকজন যোগ করে দিলেন: অন্তত ওর হাতের লেখার নমুনাটা একবার—

রুমাল দিয়ে ঘাড়টা সবলে রগড়াতে-রগড়াতে বললুম,—কোনো দরকার নেই। এমনিতেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

রাধেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চেয়ে তার পিঠে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেও যেন সে বেশি আরাম পেত।

পুরাঙ্গনারা, যারা এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, সমমুহূর্তে সবাই কলধ্বনিত হয়ে উঠল। তার মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলুম একজনের সুন্দর স্তব্ধতা।

তারপর শুরু হল ভোজনের বিরাট রাজসূয়। এতো বড়ো একটা ভোজের চেহারা দেখেও রাধেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না।

২

আমি যে কী ভীষণ উজবুক ও আনাড়ি, বাড়িতে ফিরে রাধেশ সেইটেই সাব্যস্ত করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। এক কথায় মেয়ে পছন্দ করে এলুম, অথচ খোঁপা খুলে না দেখলুম তার চুলের দীর্ঘতা, না বা দেখলুম হাঁটিয়ে তার লীলা-চাপল্য। সামান্য একটা হাতের লেখা পর্যন্ত তার নিয়ে আসি নি।

—তারপর, রাধেশ মুখ টিপে হাসতে লাগল: এমন তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলে যে মেয়েটার চোখ দুটো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পেলুম না। দেখবার মধ্যে দেখলুম শুধু একখানা গায়ের রঙ।

বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: কী রকম? আমাদের মিনির মতো হবে?

রাধেশের একবিন্দু মায়া-দয়া নেই, অভদ্র, রূঢ় গলায় বললে,—apologeticallyও নয়।—আমাদের মিনি তো তার তুলনায় দেবী।

আমার রুচিকে কেউ প্রশংসা করতে পারল না। বাড়ির মহিলারা, যাঁরা তাঁদের যৌবদশায় এমনি বহুতর পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে আমাদের বাড়িতে এসে বহাল হয়েছেন, টিপ্পনি কাটতে লাগলেন: এমন মেয়ে-কাঙাল পুরুষ তো কখনো দেখি নি বাপু। এমন কী দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে খাদ্যাখাদ্যের আর বাছবিচার করতে হবে না। সাধে কি আর পাত্রকে গিয়ে নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে দেয়া হয় না? ডবকা বয়সের একটা যেমন-তেমন মেয়ে দেখলেই কি এমনিধারা রাশ ছেড়ে দিতে হয় গা?

প্রশ্রয় পেয়ে রাধেশ তার রসনাকে আরো খানিকটা আলগা করে দিল: মা হয়তো বা কোনোরকমে পার হলেন, কিন্তু তাঁর মেয়েদের আর গতি হচ্ছে না, এ আমি তোমাদের আগে থাকতে বলে রাখছি।

সে অপরিচিতা মেয়েটির হয়ে শুধু আমি একা লড়াই করতে লাগলুম। তাকে পছন্দ না করে যে আর কী করতে পারি কিছুই আমি ভেবে পেলুম না। আমার চোখ না থাক, অন্তত চক্ষুলজ্জা তো আছে।

মা প্রবল প্রতিবাদ শুরু করলেন: কালো বলেই ওরা অতো টাকা দিতে চায়। কিন্তু তোর টাকার কী ভাবনা? আমি তোর জন্যে টুকটুকে বৌ এনে দেব।

হেসে বললুম,—টাকা অবিশ্যি আমি ছেড়ে দেব, মা, কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়তে পারব না। তাকে যখন আমি দেখতে গেছলুম, তখন তাকে বিয়ে করব বলেই দেখতে গেছলুম। একটি মেয়েকে তেমন আত্মীয়তার চোখে একবার দেখে তাকে আমি কিছুতেই আর ফেরাতে পারব না। তোমরা তাকে পরীক্ষা করতে পার, কিন্তু আমার শুধু পছন্দ করবার কথা।

এই যে আমার কী এক অন্যায় খেয়াল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা

সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠল। কিন্তু বাবা আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন: ওর যখন ওখানেই মত হয়েছে, তখন ওখানেই ওর বিয়ে হবে।

তোমরা ঠাট্টা করতে পার, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সুমিতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কথাটা একটু হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু ভালো লাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এতো ভালো লেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?

সুমিতা কালো, এবং তারি জন্যে সমস্ত সংসার প্রতিকূলতা করছে, মনে হল, এ-ব্যাপারে সেইটেই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ। সুমিতাকে যে আমি এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারব, সেইটেই আমার পুরুষত্ব।

বাবা দিন-ক্ষণ ঠিক করে ওদের চিঠি লিখে দিলেন।

পাশাপাশি সে কটা দিন-রাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারি বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্তগুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তার জীবনের এতোগুলি দিন শুধু আমারই জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে তার শরীরে-মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিত, তখনো সে ভাবে নি তীরে তার জন্যে কে বসে আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতোই ফেনিল করে তুলতে চাইলুম, ততোই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।

হয়তো সুমিতারো মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমেষে তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়তো সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে-ক্ষণে

লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়তো আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমন্তরেখাটির দিকে চেয়ে সে একটি নিশ্বাস ফেলছে, হয়তো আমারি মতো রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না।

৩

বলা বাহুল্য, নইলে এ কাহিনী লেখার কোনো দরকার হত না, সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে নি।

কেন ওঠে নি, সেইটেই এখন বলতে হবে।

বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মেয়েকে পাকা দেখতে বেরোবেন, সকাল-বেলার ডাক এসে হাজির। আমারই নামে খামে মোটা একটা চিঠি। মোড়কটা ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেলে নিচে নাম দেখলুম : সুমিতা।

বলতে বাধা নেই, সেই মুহূর্তটা আনন্দে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলুম। বিয়ের আগে এমন একখানি চিঠি যেন বিধাতার আশীর্বাদ।

তারপরে লুকিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে গেলুম চিঠিটা পড়তে। মেয়ের চিঠি, তাই চিঠিটা একটু বিস্তারিত। সুমিতা লিখছে :

মান্যবরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন, কিন্তু চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যি আর আমার কোনো উপায় নেই। রূঢ়তা মার্জনা করবেন এই আশা করেই চিঠি লিখছি।

আপনি যে আমাকে পছন্দ করবেন, কেউই যে আমাকে এইভাবে পছন্দ করতে পারে, একথা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি। আপনার আগে আরো অনেকের কাছে আমাকে রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কিন্তু সব জায়গাতেই আমি সসম্মানে ফেল করে বেঁচে গিয়েছিলুম। শুধু আপনিই আমাকে এই অভাবনীয় বিপদে ফেললেন। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভয়াবহ একটা টাকা পর্যন্ত দাবি করলেন না। সব দিক থেকেই আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এর আগে আর

কাউকে চিঠি লেখার আমার দরকার হয় নি, একমাত্র আপনাকে লিখতে হল। জানি আপনি মহানুভব, তাই আমি এতো সাহস দেখাতে সাহস পেলুম।

আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে নয়, বিয়ে না করে। পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে-করে আমি ক্লান্ত, প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছি—কী যে আমি করতে পারি, কোনোদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। জানি, এই ক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই কোনোদিকে না চেয়ে শেষকালে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি।

কেন বিয়ে করতে চাই না, তার একটা স্থূল, স্পর্শসহ কারণ না পেলে আপনি আশ্বস্ত হবেন না জানি। সে কারণ আপনাকে জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই।

আমি একজনকে ভালোবাসি—কথাটা মাত্র লিখে আমি তার গভীরতা বোঝাতে পারব না। তার জন্যে আমাকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে, যতোদিন না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, ততোদিন, তারি জন্যে, আমাকে নানা কৌশল করে এই সব ষড়যন্ত্র পার হতে হচ্ছে। রূপের পরীক্ষার চাইতেও সে কী কঠিনতর সাধনা।

আশা করি, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছে আমি সহানুভূতি না পেলেও করুণা পাব। আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালী মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমের পরমায়ু ভিক্ষা করছে।

তবু এতোতেও যদি আপনি নিরস্ত না হন তো আমার পরিণাম যে কী হবে আমি ভাবতে পারছি না। ইতি। বিনীতা

সুমিতা

চিঠি পড়ে প্রথম কিন্তু মনে হল সুমিতার হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর, লাইন কটি সোজা ও পাশাপাশি দুটো লাইনের অন্তরালগুলি

সমান। বানানগুলি নির্ভুল, এবং দস্তুরমতো কমা, দাঁড়ি ও প্যারাগ্রাফ বজায় রেখে চিঠি লেখে। তার উপর শ্রদ্ধা আমার চতুর্গুণ বেড়ে গেল এবং যে-পাত্রী আমি মনোনীত করেছি সে যে নেহাত একটা যা-তা মেয়ে নয়, সে-কথাটা বাড়ির মহিলাদের কাছে সদ্য-সদ্য প্রমাণ করতে এ-চিঠিটা তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, তার চিঠির কথা নয়, চিঠির ভিতরকার কথা। সুখ হল না দুঃখ হল চেতনাটার ঠিক স্বাদ বুঝলুম না। খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ওদিকে বাবা দলবল নিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ-কান বুজে তাঁর কাছে ছুটে গেলুম। বললুম,—থাক, ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। ও-মেয়ে আমি বিয়ে করব না।

বাবা তো প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: সে কী কথা?

—হ্যাঁ, আমি আমার মত বদলেছি।

সে একটা বীভৎস কেলেঙ্কারিই হল বলতে হবে, কিন্তু সুমিতার জন্যে সব আমি অক্লেশে সহ্য করতে পারব।

কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আমাকে আষ্টেপৃষ্টে ছেঁকে ধরলে: মত বদলাবার কারণ কী?

হাসবে না কাঁদবে কেউ কিছু ভেবে পেল না। বললে,—বা, এই কালো জেনেই তো এতো তড়পেছিলি! এই কালোই তো ছিল ওর বিশেষণ!

কী যুক্তি দেব ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম,—বিয়েতে আমার টাকা চাই।

—বেশ ছেলে যা হোক বাবা। তুইই না বলতিস বিয়েতে টাকা নেয়ার চাইতে গণিকাবৃত্তিতে বেশি সাধুতা আছে। ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এখন পিছিয়ে যাবার মানে কী?

বললুম,—বেশ তো, তাঁদের অকারণ মনস্তাপের দরুন না হয় যথাযোগ্য খেসারত দেয়া যাবে।

সবাই বিদ্রূপ করে উঠল: এদিকে পণ নিয়ে বিয়ে করবার মতলব, ওদিকে গরচা খেসারেত দেয়া হচ্ছে। মাথা তোর বিগড়ে গেল নাকি ?

কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে বোঝাই ? শুধু নিজের মনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি: সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি।

সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি, নিশ্চয়, ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই, তাকে অপমান করি, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এতো পছন্দ হয়েছিল, এ কথা এখন কে বুঝবে ?

আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্বনাশ করছি বলে চারিদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠল, কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্মবিলোপের অন্তরালে কার একখানি বেদনায় সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাউকে ভালো না বাসলে আমরা কখনো এতোখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এতো ভালোবেসে-ছিলুম বলেই তার জন্যে নিজের এতো বড ঐশ্বর্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার ত্যাগ তার প্রেমের মতোই মহান হয়ে উঠুক।

প্রাগবিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হতে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্যের কাছে দেয়াশলাইর একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোটো সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।

৪

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে, আমি বারাসত থেকে হবরাজপুরে বদলি হয়ে এসেছি।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার বৈবাহিক ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে গেছে, এবং এবার অতি নির্বিঘ্নে। বলা বাহুল্য, এবার আমি নিজে আর মেয়ে দেখতে যাই নি, মা তাঁর কথামতো দিব্যি একটি টুকটুকে বৌ

এনে দিয়েছেন। নিতান্ত স্ত্রী বলেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছি না।

আমার স্ত্রী তখন তাঁর বাপের বাড়ি, আসন্নসন্তানসম্ভবা। আমার কোয়ার্টারে আমি একা, নথি-নজির নিয়ে মশগুল।

এর মধ্যে যে কোনো উপন্যাসের অবকাশ ছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

সেরেস্তাদার তাঁর এক অধীন কেরানির নামে আমার কাছে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করলেন। পশুপতির চুরিটা অবিশ্যি আমিই ধরে ফেলেছিলুম। আমারই শাসনে এতোদিনে সেরেস্তাদারের যা-হোক ঘুম ভাঙল।

নতুন হাকিম, মেজাজটা সাধারণতই একটু ঝাঁঝালো, পশুপতিকে আমি ক্ষমা করলুম না।

আমারই খাসকামরায় পশুপতি দুহাতে আমার পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললে—হুজুর মা-বাপ, আমার চাকরিটা নেবেন না। এমন কাজ আর আমি কক্ষনো করব না—এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।

পা দুটো তেমনি অবিচল কঠিন রেখে রুক্ষ গলায় বললুম,—তুমি যে-কাজ করেছ, আর শত করবে না বললেও তার মাপ নেই।

পশুপতি আমাকে গলাবার আরেকবার চেষ্টা করল: ভয়ানক গরিব হুজুর, তারি জন্যে ভুল হয়ে গেছে।

আমারো উত্তর তৈরি: ভুল যখন করেছ, তখন ভয়ানক গরিবই থাকতে হবে।

কিন্তু পশুপতি আরো যে কতো ভুল করতে পারে তা তখনো ভেবে দেখে নি।

রাত্রে শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোতে খুব বড়ো একটা মোকদ্দমার যোজনব্যাপী রায় লিখছি, এমন সময় দরজায় অস্পষ্ট কার ছায়া পড়ল, স্ত্রীলোকের মতো চেহারা। অকুণ্ঠ পায়ে ঘরের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়েছে।

কোনো অফিসারের স্ত্রী বেড়াতে এসেছেন ভেবে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হয়ে বললুম—আমার স্ত্রী তো এখানে নেই—

স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার গলায় বললে,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

লণ্ঠনের শিখাটা তাড়াতাড়ি উস্কে দিলুম। গলা থেকে আওয়াজটা খানিক আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল: এ কী? তুমি, সুমিতা? তুমি এখানে কী করে এলে?

তাকে চিনতে পেরেছি দেখে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুমিতা সামনের একটা চেয়ারে বসল। ঘরের চারদিকে বিষণ্ণ চোখে তাকাতে লাগল যেখানে খাটে পাতা রয়েছে আমার বিছানা, যেখানে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আমার স্ত্রীর ফোটো।

আবার জিগগেস করলুম: তুমি এখানে কি করে এলে?

সুমিতা আগের মতো তেমনি চোখ নামিয়ে বললে,—ভাসতে-ভাসতে!

তার এই কথায় চারপাশে মুহূর্তে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠল তারই ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকালুম। দেখলুম সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিলো তা-ও যেন খসে শিথিল হয়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দুখানি দুটি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

গলা থেকে হাকিমি স্বর বার করলুম: আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ম্রিয়মাণ দুটি চোখ তুলে সুমিতা বললে,—আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন।

মনে মনে হাসলুম। একবার তাকে রক্ষা করেছিলুম, এবার তার স্বামীকে রক্ষা করতে হবে। আদালত সাক্ষীকে যেমন প্রশ্ন করে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় জিগগেস করলুম: তোমার স্বামী কে?

সুমিতা স্বামীর নাম মুখে আনতে পারে না, চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল।

শেষে নিজেকেই অনুমান করতে হল : তোমার স্বামীর নাম কি পশুপতি ?

—হ্যাঁ।

চিত্রার্পিতের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই। হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা, রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্নতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগল।

জিগগেস করলুম : কদ্দিন তোমরা বিয়ে করেছ ?

যেন বহুদূর কোনো সময়ের পার হতে উত্তর হল : এই তিন বছর।

কথাটার বলবার ধরনে চমকে উঠলুম,—শেষ পর্যন্ত তোমার সেই নির্বাচিতকেই পেলে ?

—না।

—না ? তবে পশুপতি তোমার কে ?

সুমিতার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। বললে,—আমার স্বামী।

—হুঁ। একটা ঢোঁক গিলে ফের প্রশ্ন করলুম : ওকে বিয়ে করলে কেন ?

—না করে পারলুম না।

—ওকেও চিঠি লিখেছিলে ?

—লিখেছিলুম, কিন্তু শুনলেন না।

—শুনলেন না ?

—না।

চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বালা করে উঠল : শুনলেন না কেন ?

সুমিতা বললে—তাঁর দৃষ্টি ছিলো তাঁর নিজের সুখের দিকে।

—নিজের সুখ ?

—হ্যাঁ, টাকা। বিয়ে করে কিছু তিনি টাকা পেয়েছিলেন।

রুক্ষ গলায় বললুম—তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গলে ওকে বিয়ে করতে?

—পারলুম না, হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে আর পারে না। ়মিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়াল।

বললুম—আমার বেলায় তো মরবার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন রলে না কেন?

হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে সুমিতা বললে,—মরতে আর কি াকি আছে!

—না, না, তোমার এই ফ্যাশানেবল মরা নয়, সত্যি-সত্যি মরে াওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতে।

রূঢ় আঘাতে সুমিতা যেন আমূল নড়ে উঠল। কথার থেকে যেন নেক দূরে সরে এসেছে এমনি একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে সে বললে, —কিন্তু সে-কথা থাক, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান।

—তোমার স্বামীকে বাঁচাব? তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ!

তবু কী আশ্চর্য। সুমিতা হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বললে,—অবস্থার দোষেই এমন করে ফেলেছেন। বারটি তাঁকে মাপ করুন। তাঁর চাকরি গেলে আমরা একেবারে পথে ভাসব। জলে ভরা চোখ দুটি সে আমার মুখের দিকে তুলে ধরল।

নথির দিকে চোখ নিবিষ্ট করে বললুম—তোমার মতো আমারো র মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি আর তেমন উদার ও হানুভব নই।

—না, না, আপনি মুখ তুলে না চাইলে—

বাধা দিয়ে বললুম,—কার দিকে আর মুখ তুলে চাইব বল? তুমি আমাকে যে অপমান করলে—

—অপমান? সুমিতা যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এতোদিন অন্য সংজ্ঞা দিয়েছিলুম, কিন্তু একে অপমান ছাড়া আর কী বলব? তোমার জন্যে, তোমার প্রেমের জন্যে, আমি যে

স্বার্থ ত্যাগ করলুম তুমি তার এতোটুকু সুবিচার করলে না, এতোটুকু সম্মান রাখলে না। শেষকালে পশুপতি কিনা তোমার স্বামী। তোমার স্বামী কিনা শেষকালে পশুপতি! এরপর তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পার?

—কিন্তু, সুমিতা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল: তবু, আপনি দয়া না করলে—

চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,—কেন দয়া করতে যাব? তুমি আমার কে?

—কেউ না হলে কি আর দয়া করা যায় না?

—না। তুমিই বল না, কী দেখে আমার আজ দয়া হবে? কঠিন কটু গলায় বললুম—তোমার মাঝে দেখবার মতো আর কী আছে?

সুমিতা উঠে দাঁড়াল। আজ তার বসার থেকে এই দাঁড়ানোর মাঝে কোনো দীপ্তি নেই। সঙ্কোচে নিতান্ত ম্লান হয়ে প্রায় ভয়ে ভয়ে বললে,—সেদিনই বা কী দেখেছিলেন?

উত্তপ্ত গলায় বললুম—সেদিন দেখেছিলুম তোমার প্রেম।

নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে যাবার আগে একটা হাকিমি ডাক ছাড়লুম: নগেন।

নগেন আমার পিওন।

বললুম,—এঁকে আলো দিয়ে পশুপতিবাবুর ওখানে পৌঁছে দিয়ে এস। দেরি কোরো না।

মুমূর্ষু দীপশিখার মতো সুমিতা একবার কেঁপে উঠল। কী কথা বলতে গিয়ে চমকে বলে ফেললে,—না, আলোর দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারব।

দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থামল। ঘরের চারদিকে মৃত, শূন্য চোখে চেয়ে একবার চোখ বুজল। কী যেন আরো তার বলবার ছিল, কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারল না।

তার সঙ্গে অস্পষ্ট চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

ন যযৌ ন তস্থৌ

হঠাৎ সেদিন সকাল-বেলায়ই শচীনের নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির।

মা শুকনো মুখে শুধোলেন: কে করলে টেলি? কার কী হল?

শচীন পিওনের হাতের কাগজে নম্বর মিলিয়ে সই করে দিতেই পিওন সাইক্লে করে অন্তর্হিত হল—মাতা-পুত্রের কাছে সে কী হৃদয়-বিদারক দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে তা জানবার জন্যে সেখানে সে আর দাঁড়াল না।

টেলির মোড়কটা খুলতে গিয়ে শচীনের হাত কাঁপছে। মার মুখ ব্লটিং-কাগজের মতো সাদা। খবরটা শোনবার অধীর আগ্রহে দুচোখ তাঁর ঠিকরে পড়ছে।

টেলিটা পড়ে শচীন একেবারে পাথর হয়ে গেল। একবার—দুবার, তিনবার সে পড়লে—কথাটার ঠিক অর্থবোধ হচ্ছে কি না সন্দেহ হওয়াতে আরো একবার। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আরো একবার।

মা ব্যস্ত হয়ে জিগ্‌গেস করলেন,—কী খবর? বলছিস না কেন কিছু?

কী যে বলবে, কেমন করে যে বলা যায়, শচীন কিছুই ভেবে পেল না। বলতে গিয়ে টের পেল গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না, মাথা কেমন ঘুরতে শুরু করেছে,—অথচ পৃথিবীর কোথাও একটু পরিবর্তন হচ্ছে না।

তাকে তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা শোকাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন: শিগগির বল, কোথায় কী সর্বনাশ হল—

শচীনের এতক্ষণে হয়তো হুঁশ হল। তাড়াতাড়ি সে সদর দরজার কাছে এসে রাস্তায় উঁকি মেরে বললে—পিওনটা বেরিয়ে গেল বুঝি ?

মা বললেন—আমাদের বাড়ির টেলি নয় ?

শচীনের বুক কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি আবার সে টেলিটা পড়লে, মোড়কের গায়ে পেন্সিলের লেখাটুকুও—না, না, পিওন ভুল করে নি। নিশ্চয় নয়। ভুল অমনি করলেই হল !

মা ছেলের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন, বললেন,—আমাকে কিছু বলছিস না কেন ? তোর দিদির টেলি নাকি ? কেন পিওনকে খুঁজছিস—

শচীন বললে,—কাছাকাছি দেখতে পেলে কিছু বকশিশ দিতাম।

মা অবাক হয়ে বললেন,—বকশিশ !

—হ্যাঁ। শচীন আরেকবার অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিলে: আমার চাকরি হল, মা। দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সেই চাকরিটা।

খবরটা শচীন নিতান্তই সহজ, সাদা গলায়, অনুচ্ছ্বসিত, উদাসীন কণ্ঠে মাকে জানালে। এ খবরে বিশেষ যেন উৎসাহিত হবার কিছু নেই। এ সংবাদ যেন তার জীবনের খবরের কাগজে পৃষ্ঠা-জোড়া প্রকাণ্ড হেড-লাইন নয়, স্মল-পাইকায় ছাপা নিতান্তই মামুলি একটা ছোট খবর,—পৃষ্ঠা উলটে গেলেও চোখে পড়বে না। এ-চাকরি পেয়ে সে যে বাবার ঋণ শোধ করে বাড়িটাকে মুক্ত করতে পারবে, ছোট ভাইটাকে স্কুলে ও বোনটাকে সৎপাত্রে দিতে পারবে, আসন্ন অনশন থেকে এতগুলি গ্রাসকে স্বচ্ছন্দে রক্ষা করতে পারবে—খবরটা পেয়ে আনন্দে সে একটা আর্তনাদ করে উঠল না। চোখ কচলে আবার সে টেলিটা পড়ল। রাস্তার দিকে একবারটি শুধু দেখল—পৃথিবীর কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে না।

অথচ এই একটা চাকরির জন্যে সে অন্ধের মতো স্বর্গ-পাতাল অন্বেষণ করেছে। উত্তরমেরু-আবিষ্কারের একাদিক্রম বৈফল্যের চেয়ে তার পরাজয় কম মহত্তর ছিল না। দরখাস্ত টাইপ করে-করে সে

এখন দস্তুরমতো টাইপিস্ট-এর কাজের জন্যে দরখাস্ত করতে পারে—এত তার স্পিড! চাকরির জন্যে কী না করেছে সে! দেবত্বপ্রাপ্ত কোনো বটের ঝুরিতে সে কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে সুতো বেঁধে দিয়েছে, শেঁকড় বেটে খেয়েছে, গলায় মাদুলি ধারণ করে ত্রিসন্ধ্যা ছেড়ে বাকি তিরিশ বছরই হয়তো তাকে সেই মাদুলি-ধোয়া জল খেতে হত। করতলের ভাগ্যরেখাটা গ্রহবৈগুণ্যে নিস্তেজ, রুদ্ধবৃদ্ধি হয়ে আছে, কোনো সুগোপন শুভলগ্নে সেটা ঊর্ধ্বমুখে অভিযান করল কি না দেখবার জন্যে সেই করতলের উপর কম অত্যাচার হয় নি—মাঝে-মাঝে কপালকেও সেই অত্যাচার ভাগ করে নিতে হত।

সেই চাকরি! সেই চাকরি আজ এলো—একেবারে অনায়াসে, হাতের মুঠোর মধ্যে, রূঢ়, প্রত্যক্ষ দিনের আলোয়।

অথচ সে কি না পাথরের মতো নিশ্চল, গলা দিয়ে তার স্বর ফুটছে না।

আশ্চর্য,—শচীন পরম উদাসীনের মতো, রুগীর শয্যাপার্শ্বে বিচক্ষণ ডাক্তারের মতো, পরিষ্কার থরথরে গলায় বলে যাচ্ছে:

—সেই যে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের কেরানির চাকরিটা, মা। পঞ্চাশ টাকায় শুরু,—বছরে দু-টাকা করে বেড়ে চুয়াত্তর টাকা পর্যন্ত। মনে নেই? সেই দিন অনুকূল-দাদা যে-খবরটা দিলেন—তোমার কিছু মনে থাকে না, মা।

আশ্চর্য! মার-ও সে-কথা মনে নেই।

বিপুলা পৃথ্বী নিরবধি কাল ধরে অচলা থাকুন ক্ষতি নেই, কিন্তু মার মুখ—আমাদের মার মুখ—যে-মুখ ছাইয়ের মতো সাদা ছিল, সহসা আগুনের মতো দীপ্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তিনি ছেলের একান্ত কাছে সরে এসে চীৎকার করতে গিয়ে শিশুর মতো হেসে উঠলেন: সেই চাকরিটা? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি বৈ কি! পঞ্চাশ টাকা মাইনে? তারা টেলি করে জানিয়েছে বুঝি! দেখি—দেখি টেলিটা।

বলে মা টেলিটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আঁকাবাঁকা

অক্ষরগুলির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বললেন,—কোত্থেকে না এসেছে বললি টেলিটা ?

শচীন বললে,—দিনাজপুর থেকে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিনাজপুর থেকেই তো। পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেবে তো—সত্যি ?

শচীন গম্ভীর হয়ে বললে,—বি-এটা তো যে-করে-হোক পাশ করেছিলুম—কি বল ?

—না, না, তা তো করেছিলি। আর কী লিখেছে তারা ? তর্জমা করে বল না আমাকে।

টেলিটা হাতে নিয়ে ফের আরেকবার পড়ে শচীন মানেটা মাকে বুঝিয়ে দিলে। মা ততক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত উৎকর্ণ করে সে-ব্যাখ্যা আয়ত্ত করলেন। পরেই দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে নিমেষে তাঁর শরীর বন্ধনমুক্ত হল—পাখির ডানার মতো হালকা হয়ে গেল।

শচীন বললে,—কিন্তু আজ রাত্রের ট্রেনেই রওনা হতে হবে। পরশু গিয়ে জয়েন করা চাই-ই !

যেন তাতে কত অসুবিধে ! দাঁড়াও, সে-সব ব্যবস্থা পরে হবে। এখন তো মোটে সকাল। মা হাত বাড়িয়ে বললেন, দে, দে, টেলিটা আমার হাতে দে—তোর পিসিমাকে শুনিয়ে দিয়ে আসি—

টেলিটা মার হাতে ছাড়বার আগে শচীন আরেকবার পড়ে নিল। মা একটু থামলেন। না, ঠিকই আছে—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

মা ঘরের মধ্যে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন : শাঁক বাজাও, ঠাকুরঝি, খোকার চাকরি হয়েছে। বলেই তিনি ছোট খুকির মতো কলকল করে উলু দিয়ে উঠলেন।

পিসিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন : কী হল, বৌঠান ?

টেলিটা শূন্যে নাড়তে-নাড়তে মা বললেন, আমার খোকা গো খোকা—

আনন্দে কথাটা আর তিনি শেষ করতে পারলেন না।

পিসিমা উঠোনে নেমে এসে বললেন,—কি হল? অ্যাদ্দিনে বিয়ে করবে বলে মত দিলে বুঝি?

—না গো না, খোকার চাকরি হয়েছে। এই টেলি এসেছে দেখ।

—হয়েছে? দেখি, দেখি—

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে পিসিমাও উলু দিয়ে উঠলেন।

মা বললেন,—সত্যনারায়ণকে সিন্নি দেবার ব্যবস্থা কর আজ।

পিসিমা বললেন,—তুমিও এবারে বৌ ঘরে আনবার বন্দোবস্ত কর।

সকাল বেলায় শচীন যে টিউশানিটা করে, আজ সেখানে যাবার প্রয়োজন নেই। খানিকটা সময় সে একেবারেই কিছু করলে না—ক্লান্তের মতো তক্তাপোশটার উপর শুয়ে রইল।

খানিকক্ষণ। মনে হল আজ থেকে তার ছুটি।

এখুনি উঠে পড়ে, দিনাজপুর যাবার সব বন্দোবস্ত তার ঠিক করতে হবে। তার এখনো দেরি আছে। আরো খানিকক্ষণ সে বিশ্রাম নিতে পারে। খানিকক্ষণ চোখ বুজে থেকে পরে চোখ চাইলেই সে-খবর আর মিথ্যা হয়ে যাবে না।

বাইরে বারান্দায় ননদ-ভাজে তখনো 'জটলা করছে। উনুন বসে আছে, তরকারি কোটা হয় নি। হোক না একটু দেরি।

শচীন এসে বললে,—মা, কিছু টাকা লাগবে যে। ট্রেন-ভাড়া, জিনিস-পত্রও তো কিনতে হবে কিছু। টাকা এখন পাই কোথায়?

মা ম্লানমুখে বললেন—তুই আজই যাবি নাকি?

—বা, আজই না গেলে পরশু চাকরিতে গিয়ে জয়েন করব কী করে?

—তাই একেবারে আজই যেতে হবে? কিছুই তোর তৈরি নেই। গিয়ে উঠবি কোথায়?

শচীন বললে—ও পরের কথা। এখন আপাতত কিছু টাকা চাই তো। কে দেবে!

মা ঘরের মধ্যে এসে বললেন,—আমার কাছে একখানা গিনি ছিল। সেইটেই বেচতে হবে দেখছি। উপায় নেই। পারবি নে? এখন সোনার দর কত?

মা তাঁর ট্রাঙ্ক খুলে বহুদিনকার পুরোনো একটি কাঠের বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে থেকে বেরুল সিঁদুর-কৌটো—তার ভেতরে ময়লা ন্যাকড়ার একটা থলি—তাতে চকচকে একখানি গিনি—ভিক্টোরিয়ার আমলের। আজকে মার আনন্দের মতোই ঝকঝক করছে।

মা বললেন,—ট্রেন-ভাড়া বাবদ রেখে বাকিটায় দরকারি যা দু-একটা লাগে কিনে ফ্যাল। এই নে।

এই গিনি দিয়ে বিয়ের সময় মাকে আশীর্বাদ করা হয়েছিল। জীবনের প্রথম যৌবন-স্বপ্নটিকে মা এ-যাবৎ সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন।

—দিনাজপুরের ভাড়া কত? কি-কি তোর কিনতে হবে?

—তাই ভাবছি।

—এক জোড়া জুতো কেন, ধুতি, জামা—

—না, না, ও সব যা আছে তাতেই চলবে। তুমি কেচে একবারটি ফরসা করে দিলেই চলে যাবে। জামাগুলোর বোতাম লাগিয়ে দিয়ো। জুতো একজোড়া নেহাত না হলেই নয়।

মা আশ্বাস দিয়ে বললেন,—না, কিনবি বৈ কি। ফিতে-বাঁধা জুতো কিনিস বাপু, ও-সব শুঁড়-তোলা জুতোয় দুমাসও চলে না। একটা মশারি নিবি নে?

—মশারি দিয়ে কী হবে?

—কি-জানি, যদি ম্যালেরিয়া ধরে। তা, আমাদের ঘরেরটাই দিয়ে দেবখন। চাল-এর ওপরে একটা কাপড় ঝুলিয়ে নিলেই চলবে। সেলাই করবার পথ নেই।

শচীন বললে,—মশারি লাগবে না।

—না, না, একটি মোটে মাস তো, তার পরেই তো মাইনে পাবি—আমরা কাটিয়ে দিতে পারব। তোশকই নেই—ছোট লেপখানা পেতে শুতে পারবি নে?

—স্বচ্ছন্দে। শোবার আবার কী ভাবনা।

মা বললেন,—তবে ঐ লেপখানাই দিয়ে দেব। গায়ে দেবার জন্যে একখানা চাদর নিস।

—ও-সব বাবুগিরি করে লাভ কী?

—না, না, গায়েও দেওয়া যাবে, দরকার হলে বিছানায়ও পাততে পারবি। একটা ছাতা নিস কিন্তু। নতুন রোদ—জ্বর-জারি হতে পারে। যা তোমার স্বাস্থ্য। টোটকা-টাটকি যা দু-চারটে ওষুধ লাগে—নিস মনে করে। একটা ফর্দ করে ফ্যাল।

পেন্সিল-কাগজ আনবার কথা মনে হতেই মা সহসা চোখ-মুখ বিবর্ণ করে—গভীর অরণ্যের পুঞ্জীকৃত বিপুল অন্ধকার দেখে অসহায় কণ্ঠে বলে উঠলেন : অ্যাঁ, টেলিটা কোথায় ফেলে এলাম!

বলেই ছুটে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। মাটির উপর নিতান্ত অবহেলায় সেটা পড়ে আছে। দূর থেকে মনে হয় সামান্য একটুকরো কাগজ।

টেলিগ্রামটার থেকে কাল্পনিক ধুলো মুছতে-মুছতে মা বললেন,—ভাগ্যিস হাওয়ায় উড়ে যায় নি। লালাদের গরুটাও আবার উঠোনে ঢুকেছে—খেয়ে ফেলতেও পারত। ভাগ্যিস। ট্রাঙ্কেই রেখে দি—বাবা।

ট্রাঙ্কে রাখবার আগে শচীন আরেকবার খবরটা পড়লে। মা আবার একটু থামলেন। না, খবরটা অতি-মাত্রায় সত্য—কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই।

লালাদের গরুটা যে উঠোনের এক কোণে পালং শাকের ক্ষেতটা সাবাড় করছে, সে দিকে মার পরে নজর দিলেও চলবে।

টেলিটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে রেখে মা বললেন,—কোন বাক্সটা নিবি? আছেই তো মাত্র দুটো—ওটা তো একেবারে ভাঙা। আমার বড়োটাই তা হলে নিস।

শচীন বললে,—দরকার কী? ভাঙাটাতেই চলবে। কিন্তু আর কী কেনা যায় বল দেখি।

—তুইই ভেবে ছাখ না কী আর লাগবে।

—আমার আবার কী লাগবে! আমি ভাবছি তোমার জন্যে এক জোড়া কাপড়—পিসিমাকে না-হয় একখানা দিয়ো—আর ঘুনি সেদিন আমার কাছে চাকরি হলে একখানা বাগেরহাটি শাড়ি নেবে বলে বায়না ধরেছিল—ওর জন্যে—

মা ধমক দিয়ে উঠলেন: দূর পাগল! এ-সব এখন থাক। দু মাস হোক আগে চাকরি। আমার এত কষ্টের গিনি ভাঙিয়ে কাপড় কিনতে হবে! শোন কথা!

ছেলের সঙ্গে দু-পা এগিয়ে এসে ফের বললেন,—একটা ছাতা আনিস কিন্তু অবিশ্যি। একটা লণ্ঠন লাগবে না? ছাখ ভেবে। রাত্রে আলো চাই তো।

শচীন বললে,—কী হবে!

শচীন এগোচ্ছিল, মা কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন,—চাকরির কথা সবাইকে যেন বলে বেড়াস নে। কে জানে কে কোথা থেকে ভাংচি দিয়ে বসবে। আমাদের শত্রুর তো আর অভাব নেই—

শচীন আমতা-আমতা করে বললে,—অনুকূল-দাদাকে তো অন্তত বলতে হবে।

—হ্যাঁ, অনুকূলকে বলবি বৈ কি। আর পারিস তো কামিনী-ডাক্তারকেও বলে আসিস। তোকে সেই মস্ত অসুখটা থেকে ভালো করলে। আর—আর, হ্যাঁ, সে আমিই গিয়ে বলতে পারব।

বাজার করে শচীন যখন বাড়ি ফিরলে, মা তখন ঘরে নেই। ঘুনি বললে, পিসিমাকে সঙ্গে করে কেদারবাবুর বাড়ি গেছেন, সেখান থেকে যাবেন চণ্ডী-দাদামশায়ের বাড়ি। অনুকূল আর কামিনী-ডাক্তারকে তো শচীনই খবর দেবে।

ঘুনি দাদার বাক্স গুছিয়ে দিতে বসল।

মা উঠোনে ঢুকে বললেন,—ওদের সবাইর আক্কেলটা একবার দেখলে, ঠাকুরঝি। পরের ভালো চোখ মেলে কেউ সইতে পারে না। চাকরিটা পেতে-না-পেতেই সবাই ধুয়ো ধরেছে—পাকা বাড়ি তুলছ কবে, খোকার মা! তুলব বৈ কি—একশো বার তুলব। রাজলক্ষ্মী বৌ ঘরে আনব। দেখতে-দেখতে পায়ের তলার কাঁচা মাটি সোনা হয়ে উঠবে।

পরে শচীনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি এগিয়ে এলেন, প্রসন্ন মুখে বললেন,—এসেছিস? কত দর পেলি গিনিটার? কই, ছাতা আনিস নি?

শচীন বললে,—ছাতা দিয়ে কী হবে? এই এক বাক্স সাবান এনেছি, মা।

—তা বেশ করেছিস। লণ্ঠন?

—লণ্ঠন লাগবে কিসে? তোমারো সব যেমন! আর, এই একটা হাফ্-প্যাণ্ট।

মা অনায়াসে সায় দিলেন : হাফ-প্যাণ্ট! তা মন্দ নয়।

শচীন বললে,—এই সাবানের বাক্সটা ঘুনির, আর—এই টুনু, তোর জন্য খাকির এই হাফ-প্যাণ্ট এনেছি ছাখ। ইস্কুলে যাবি নে?

ধনুক-বাণ ছেড়ে টুনু লাফিয়ে এল। মালকোঁচা মেরে কাপড়ের উপর দিয়েই প্যাণ্টটা চালিয়ে দিলে। আর সাবানের বাক্স খুলে নতুন টাটকা গন্ধে ঘুনি বিভোর হয়ে গেল।

মা বললেন,—ছালায় বেঁধে কিছু বাসন দিই সঙ্গে। যদি দরকার হয়—বলা যায় না।

শচীন বললে,—একা মানুষ, থাকব গিয়ে মেস্-এ, বাসন দিয়ে কী হবে?

পিসিমা বললেন,—হ্যাঁ, বিয়ে করে নতুন যখন সংসার পাতবে, তখন ও-সব বেঁধে-ছেঁদে দিয়ো।

ভাবতে গিয়ে মার চোখ ছলছল করে উঠল। ভারাতুর কণ্ঠে

বললেন,—তুজনকেই ছেড়ে দিয়ে একলা আমি তখন থাকব কী করে ?

ঘুনি সাবানের ঘ্রাণ নিতে-নিতে বললে,—আমরাও থাকব গিয়ে।

পিসিমা বললেন,—তুই তো যাবি শ্বশুরবাড়ি।

টুনু লাফিয়ে বললে,—আর আমি থাকব ইস্কুলে।

চোখের জল মুছে মা বললেন,—এই ভিটে-কোঠা ছেড়ে যেতেও যে বুকটা ফেটে যাবে, ঠাকুরঝি।

শচীন বললে,—সেজন্য এখন থেকেই ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। সেরটাক মাংস এনেছিলাম, মা। রান্নাঘরে রেখে এসেছি। কি রে টুনু, মাংস খাবি নে ?

টুনুকে তখন দেখে কে !

আর ঘুনি গেল আলু কুটতে।

যতই বেলা পড়তে লাগল মার মন ততই অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তাঁর খোকা আজ চলে যাবে—নির্বান্ধব, অপরিচিত জায়গায়—কোলাহলাকীর্ণ বৃহৎ জনতার মধ্যে। এই ঘর-বাড়ি, মাঠ-আকাশ তাঁর খোকার বিরহে নিমেষে শূন্য হয়ে যাবে। আজ মাঝরাতে উঠে ঠাণ্ডার ভয়ে খোকার শিয়রের জানলাটা চুপি-চুপি আর তাঁর বন্ধ করে দিতে হবে না।

মা বললেন,—আজকে তোর না গেলেই নয় ? এক দিন দেরি করে গেলেই কি চাকরিটা ফসকে যেত ? শেষের কথাটা বলে ফেলেই মা তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন : খবর পেয়েই তো আর দৌড়োনো যায় না ! এটুকু ওরা বুঝবে।

শচীন হেসে বললে,—ওরা বুঝলেও আমি-তুমি কী করে বুঝি বলো!

বিকেল হতেই মেঘ করে এল—তারপর এল বৃষ্টি। গাছপালা অন্ধকার করে—আকাশ আচ্ছন্ন করে প্রবল, প্রগাঢ় বৃষ্টি।

আর বৃষ্টি নিয়ে এল মার মনে অসীম ব্যাকুলতা।

মা বললেন,—ওই বৃষ্টি মাথায় করেই যাবি ?

শচীন বললে—আমি তো নৌকো নিচ্ছি না, যাব ট্রেনে। ট্রেন সেই রাত বারোটায়। ততক্ষণ ফরসা হয়ে যাবে।

—গাড়ি বলেছিস ?

—গাড়ি লাগবে কী করতে ? মিছামিছি খরচ করে লাভ কী ! একটা ট্রাঙ্ক আর বিছানা—হরলাল স্টেশনে পৌছে দিয়ে আসতে পারবে না ? খুব পারবে। ওকে বলে রাখ আগে থাকতে। আর জল না ধরলে তখন দেখা যাবে। গাড়ি করলেই বারো গণ্ডা পয়সা।

মা ছেলেকে কাছে নিয়ে বসলেন। বৃষ্টিতে সান্নিধ্যটি আরো করুণ ও শোকাবহ হয়ে উঠেছে। শচীন মার কোল ঘেঁসে শুয়েছে অসহায় শিশুর মতো, আর মা তার চুলে হাত বুলুচ্ছেন ও নতুন জায়গায় কেমন সে থাকবে বা থাকবে না, কার সঙ্গে মিশবে বা মিশবে না, আফিস থেকে ফিরে কী সে খাবে বা খাবে না—এই নিয়ে অসংখ্য উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে শচীন মার কথা শুনছে।

যাবার সময় কাছে এল। মেঘ কেটে গিয়ে ফিকে একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। হরলাল লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে তৈরী। মোট-ঘাট প্রস্তুত।

অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

মা সন্তর্পণে শচীনের হাতে টেলিটা তুলে দিয়ে বললেন,—কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দে। বারে-বারে নাড়াচাড়া করিস নে।

কোটের ভেতরের পকেটে রাখবার আগে শচীন আরেকবার টেলিটা পড়লে।

তারপর মাকে প্রণাম করল। পিসিমাকে প্রণাম করল। ঘুনি উঠে দাদাকে প্রণাম করতে এসে প্রায় কেঁদে ফেললে। টুনু ঘুমিয়ে পড়েছিল—কান্না থামাতে গিয়ে ঘুনি তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলে। আড়মোড়া ভেঙে ছুটো কাঁইকুঁই করে টুনুও এসে দাদাকে প্রণাম করলে।

মা ধরা গলায় বললেন,—পৌছেই কিন্তু চিঠি দিস।

—নিশ্চয়।

শচীন রাস্তায় নামল—হরলাল চলেছে আগে-আগে, কাঁধের উপর লাঠির ডগায় লণ্ঠন বেঁধে। চারদিক নিঝুম—ঝিঁঝিঁর ডাকে সেই নিঃশব্দতা আরো বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছে।

লণ্ঠনটা আর দেখা গেল না। এতক্ষণে মাঠ পেরিয়ে ওরা স্টেশনের রাস্তা নিয়েছে।

পথে জল আর কাদা। সোঁ-সোঁ করে হাওয়া বইছে। স্টেশনে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ না-জানি লাগবে!

ঘরের অন্ধকারে এসে মা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। ঘুনিও বালিশের কোণে চোখ মুছছে। পিসিমা কাছে এসে বসলেন।

মা বললেন,—কী বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়েছে দেখেছ! কোটের ওপর চাদর কিছুতেই জড়িয়ে নিলে না। যা কিছু জিনিস-পত্র—সব আমাদের জন্যেই রেখে যাবে। এখন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর-জারি না হলে হয়—

পিসিমা বললেন,—ছেলের যা স্বাস্থ্য!

—এই স্বাস্থ্য নিয়েই এত বড়ো হল! আবার মেঘ করল বুঝি? স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই বৃষ্টি এসে যাবে নাকি?

পিসিমা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন,—না, আসতে আসতে ঘণ্টাখানেক।

—ও! ততক্ষণে পৌঁছে যাবে। কি বল? বাইরে অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মা বললেন,—ছাতা একটা কিছুতেই কিনলে না—নিয়ে এল কি না টুনুর জন্যে একটা হাফপ্যাণ্ট! নিজের জন্যে পারতপক্ষে একটা আধলাও খরচ করবে না—তুমি তো তা নিজ চোখে দেখছ ঠাকুরঝি, যা-কিছু কুড়িয়ে-মুড়িয়ে পায় সব ঢালবে এনে এই সংসারে।

পিসিমা বললেন,—সত্যনারায়ণের কৃপায় দিন তো এবার ফিরতে চলল।

মা মনে-মনে প্রণাম করে বললেন,—ঠাকুরের কৃপায় শরীরটা ভালো থাকে—শুভে-লাভে গিয়ে পৌঁছতে পারে—পথ তো আর একটুখানি

নয়! তুমি শুয়ে পড়ো—হ্যাঁ, তুমি আর জেগো না—রাত কিন্তু কম হয় নি। আমার এখুনি ঘুম আসবে না। খোকার ট্রেনটা আগে ছাড়ুক।

রাত্রির বিস্তীর্ণ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে বহু দূর হতে কখন এঞ্জিনের বাঁশি বাজবে তা শোনবার জন্যে মা কান পেতে বসে রইলেন। এতো দূর থেকে শোনা অবশ্যি যায় না, কিন্তু মা শুনতে পান।

পিসিমা শুয়ে পড়লেন। মা তখনো তাঁর খোকার কথাই বলে চলেছেন—একেবারে ওর সেই ছেলেবেলাকার কথা,—যখন ও হয়, যখন ও নতুন কথা বলতে শেখে, যখন ও প্রথম প্রাইজ পায়।

মা হঠাৎ পিসিমার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললেন,—ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, ঠাকুরঝি? শুনতে পাচ্ছ না, এতোক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ঘুমোবার একটু জায়গা পেয়েছে কি না কে জানে!

শচীন যদি ঘুমোবার জায়গা না পায়, তবে বিছানায় গা ছড়িয়ে মা-ই বা কী করে ঘুমোন?

মেঘ ডাকছে—আসুক এবার বৃষ্টি। শচীন নিশ্চয়ই গাড়িতে জানলা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে—গোয়ালন্দের স্টীমার তো সেই সকালে। স্টীমারে ওঠবার পথটুকু পেরবার সময় বৃষ্টি না হলেই হয়।

না, মার জন্যে, ছোট ভাই-বোনের জন্যে কষ্ট কিসের! চাকরি করে সবাইকে সে কাছে নেবে—একদিন এ-শহরেও তো বদলি হতে পারে, পারে না? এখন একটু ঘুমা, খোকা। আজকে আর রাত জাগিস নি।

মার একটু তন্দ্রা এসেছিল,—দরজায় কে যেন ধাক্কা মারছে, ডাকছে: মা, মা, ওঠ, দরজা খোল।

মা ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

গাছপালা কাঁপিয়ে সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে।

স্বপ্নের মধ্যেও মা শচীনের ডাক শুনছেন। জানতেন ও কিছু নয়—তবু মা দরজা খুললেন।

এবং দরজা খুলতেই দেখতে পেলেন—চোখের সামনে অবারিত শূন্য মাঠ নয়, সশরীরে শচীন দাঁড়িয়ে। পেছনে মোট-মাথায় হরলাল, হাতের

লণ্ঠনটা তার নিবে গেছে। আলোটাকে এতোটা সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবার জন্মে পর্যাপ্ত তেল ছিল না।

শচীন কেমন ম্লান, অপরাধী। গলা দিয়ে তার স্বর ফুটছে না।

মা-র সমস্ত শরীর কাঁপতে লেগেছে—চেঁচিয়ে উঠলেন: কী হল? ফিরে এলি যে?

শচীন বললে,—ট্রেনটা মিস করলাম। স্টেশনে যেতে-যেতেই চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—সে কি? মা বসে পড়লেন: এতো আগে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলি নে? তখন বললাম গাড়ি নিতে—মার কথা তো গ্রাহ্য করিস নে তোরা।

ঘরে ঢুকে ভিজে কোটটা ছাড়তে-ছাড়তে শচীন বললে,—সে জন্মে নয়, মা। এই মে-মাস থেকে ট্রেনের সময় বদলে দিয়েছে। গাড়ি আজকাল ছাড়ছে সাড়ে-এগারোটায়। অনেকেই খবর পায় নি, অনেকেই ফিরে এসেছে।

মা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললেন,—ওরা তো সব আর চাকরি করতে যাচ্ছিল না। কিন্তু কী হবে?

শচীন অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগল।

মা আর্তনাদ করে বললেন,—চাকরিটা তা হলে গেল?

শচীন থমকে দাঁড়াল। বললে,—না, না, যাবে কেন? গেলেই হল আর কি! কাল যাব। খবর পেয়েই তক্ষুনি যাওয়া যায় নাকি? ওরা তা বুঝবে না? ওরা চাকরি করছে না?

মা বললেন,—আজ রাত্রে আর কোনো ট্রেন নেই?

—আজ আর আবার ট্রেন কোথায়? কাল আবার সেই রাত বারোটায়।

মা ধমকে উঠলেন: বারোটায়?

—না, সাড়ে-এগারোটায়। কাল ঠিক মনে থাকবে। কিন্তু স্টেশন থেকে ফিরে আসতে জলে কাপড়-জামা প্রায় ভিজে গেছে। বাইরে যা জোলো হাওয়া!

মা অবুঝের মতো বললেন,—আজ রাত্রেই কোনো উপায়ে আর যাওয়া যায় না ?

শচীন বললে,—তুমি যে এখন আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচো।

—ও দিকে সব যে গেল—

মার অস্ফুট আর্তনাদ শুনে শচীনের গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। সব সত্যি গেল নাকি ? বাড়িটাকে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করা যাবে না, ছোট ভাই-বোন দুটো শীতের পাতার মতো শুকিয়ে মরবে, মা বুড়ো বয়সেও দুবেলা হাঁড়ি ঠেলবেন—আর, আর শচীনের কল্পনাতীত নববধূটি আরো বহুদিন অপরিচয়ের কুজ্ঝটিকার আড়ালে অজ্ঞাতবাস করবে !

শচীন দীর্ঘ নিশ্বাসে বুকের পাথরটা নামিয়ে দিয়ে বললে,—না, চাকরি যাবে কী করে ? তা কি কখনো হয় ?

মা অসহায়ের মতো বলে উঠলেন : পরশু কাজে যেতে না পারলে যদি তারা অন্য লোক নিয়ে নেয় ?

—নিলেই তো আর হল না।

—হল না কী ! যদি নেয়, তুই কী করতে পারিস ?

শচীন বললে—সে পরে দেখা যাবে, তুমি এখন আমাকে একখানা শুকনো কাপড় দাও দিকি। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মা বললেন—আর কোনো ট্রেনে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না ? সত্যি ?

—জানি না। গেলে হয়তো দুদিন পরে গিয়ে পৌছুতে হবে।

মা দুই হাতে মুখ ঢেকে বললেন,—তবে আর কি ওরা তোকে নেবে ? ওদের কথামতো পৌছুতে পারলি না—ওরা কড়া লোক নিশ্চয়ই—কথার একটুমাত্র নড়-চড় হলে কাজ ছাড়িয়ে দেয়। যে দিনকাল পড়েছে—কাজ ছাড়াবার ছুতো একবার ওদের পেলেই হল। আর,—আর কোনো উপায়েই যাওয়া যায় না আজ ? ছাখ না ভেবে। অনুকূলকে একবার ডেকে পাঠাব ?

শচীন বললে,—কাজ ছাড়াবে কী ! দস্তুরমতো টেলি করেছে না ?

মা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বললেন,—হ্যাঁ, টেলি—আছে তো ওটা পকেটে?

শচীন তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়াতে লাগল।

মা শুকনো গলায়—বিশাল সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে বললেন,—কী? নেই?

—কী যে বল তুমি, মা। আছে বৈ কি। কোথায় যাবে? দস্তুরমতো ভেতরের পকেটে রেখেছি। আলোটা জ্বাল।

মা বালিসের তলা থেকে দেশলাই বার করে কুপিটা জ্বালালেন।

শচীন বললে—এগিয়ে আন আলোটা।

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বেরুল। সামান্য খানিকটা ভিজে কাগজটা একটু নরম হয়েছে বটে। মোড়ক থেকে টেলিটা বার করে শচীন আরেকবার পড়ল—আরো একবার।

মা নিশ্বাস বন্ধ করে বললেন,—ঠিক আছে তো? দে আমার কাছে দে—ট্রাঙ্কে রেখে দি। দেখিস, ঠিক আছে তো?

বলে মা নিজেই কুপির আলোতে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে টেলিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

শচীন বললে—হ্যাঁ, ঠিক আছে বৈ কি। খবর কি আর মিথ্যে হতে পারে?

মা বললেন—পরশুই ঠিক হাজিরা দিতে বলেছে?

—তা বলুক। দেখি আরেকবার। বলে শচীন টেলিটা আরো একবার পড়লে।

হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কোথাও এতোটুকু ভুলচুক নেই।

রি

আমি যে কেন এখনো বিয়ে করি নি তার একটা খুব সহজ কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, যতোই আয়ু যাচ্ছে পিছিয়ে, মেয়েরা ততোই যাচ্ছে এগিয়ে। আর আমি উচ্চতম মুহূর্তে অগ্রসরতম মেয়ে চাই।

কাজে-কাজেই ঘূর্ণমান পৃথিবীতে বিয়েটা ঘটে ওঠে নি। সমস্ত কুমারিত্বের উপর একাধিপত্য করছি এমনি একটা গর্বে মনে-মনে বিস্ফারিত ছিলুম। মানে যে-কাউকে যে-কোনো মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি এই যে একটা দিগন্তবিস্তৃত সুখ এটা পুরাকালের বহুপত্নিত্বের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই পর্যন্ত যতো জায়গায় বদলি হয়ে গেছি, কতো যে মেয়ে দেখে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য, আমার চাকরিটা মেয়ে দেখে বেড়ানোর পক্ষে ভারি অনুকূল ছিল। আর সেটা এমন চাকরি, যেখানে আমার মতটাই প্রথম ও আমার মতটাই শেষ। তাই যেখানে পা দিয়েছি সেখানেই কন্যা-কণ্টকিত বাপের দল অনর্গল আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। বিয়ে করব না আমার এমন কোন নীচ প্রতিজ্ঞা ছিল না। তাই বহু মেয়েই আমাকে দেখতে হয়েছে। এবং আশ্চর্য, সবাইকেই আমি অকায়ক্লেশে একে-একে পছন্দ করে এসেছি।

প্রশস্ত রাস্তাটা যদি আমার মনঃপূত না হয় সেই জন্যে অনেক মেয়ে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ পথে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবিশ্যি তাদের মায়েদের মত নিয়ে। কিন্তু নির্ভুল বিয়েই যখন করব তখন

কাকে ভালোবাসলুম কি বাসলুম না, কবিত্ব করলুম কি করলুম না, বিপদ ঘটালুম কি ঘটালুম না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তাপোশ হয়ে উঠল আর প্রকাণ্ড আকাশটা হয়ে দাঁড়াল একটা মশারি।

এই চমৎকার আছি—আমি আর আমার সাইকেল।

কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম, যেখানে পাট-শাক আর তামাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাথার উপর আকাশ নেই তা আমি বরং কল্পনা করতে পারতুম, কিন্তু দিন-রাত্রে ঘুণাক্ষরেও একটি তরুণীর দেহ-রেখা দেখতে পাব না এ একেবারে দুঃসহ দুর্দিনেও ধারণার অতীত ছিল। জায়গাটা এমন বিশ্ববহির্ভূত যে মাইনর-ইস্কুলের উপর মেয়েদের এখানে ক্লাশ নেই। এমন একটা কোনো হল্লা বা হুজুগ নেই যে শাড়ির দুটো চঞ্চল খসখসানি অন্তত শোনা যায়। স্টেশনে যেতে হলে ঘোড়ার গাড়িটা এদের কাঠের একটা সিন্দুক হয়ে ওঠে। কারু বাড়ি থেকে কারু বাড়িতে বেড়াতে যাবার যে এদের রাস্তা সে আর-কারুরই বাড়ির ভিতর দিয়ে। এখানে এখনো এমন একটা ঝড় উঠল না যে মেয়েরা ত্রস্ত হয়ে দ্রুত হাতে ঘরের জানলাগুলো বা বন্ধ করে দেবে। এখানকার অফিসারগুলোও এমন প্রাদেশিক, সস্ত্রীক বেড়াতে বেরুবার পর্যন্ত কারু সাহস নেই। রোদ্দুরে হলদে-হয়ে-যাওয়া শুকনো মাঠের উপর দিয়ে কেবল সাইকেল চালিয়ে চলেছি।

এমন যে মহিমাময় সূর্যোদয়, জীবনে তা কখনো দেখি নি: তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় নি। কিন্তু আজ তিন মাস এই মহকুমায় এসেছি, সাইকেলে করে কত চক্র আবর্তন করলুম, কিন্তু ঘাটে, জানলায় বা উঠানে এমন একটি মেয়ে দেখলুম না যাকে ক্ষণকালের জন্যেও তার ইহজন্মের ঘোরতর দুর্ভাগ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি। কেননা এমন মেয়ে দেখতেই আমার ভালো লাগবে যে সঙ্গোপনে একবার ভাববে, অন্তত আমি ভাবব সে ভাবছে, এর যদি মিসেস হতে পারতাম—এবং তখুনিই সচেতন হয়ে ভাববে

অন্তত আমি বুঝব সে ভাবছে, এখনো তো তার সময় যায় নি! আমি যে হব না, কিন্তু আমি যে হতে পারি—এই দর্পণের ভিতর দিয়ে একটি সাধারণ মেয়েকেও আমি আজ অপরূপ সুন্দর করে দেখতে পারতুম, কিন্তু মুখোমুখি না হলে সেই বা ভাববে কী, আর আমিই বা বুঝব কী!

লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইলগুলো অনিদ্রাক্রান্ত রাত্রির কদর্য ক্লেদের মতো অসহ্য হয়ে উঠল, বৈকালিক ক্লাবটা একটা পিঞ্জরাবদ্ধ চিড়িয়াখানা, সাইকেল-ঘূর্ণিত রাস্তাগুলি একটা ক্রমান্বিত কর্তব্য। এমন যে এখানে প্রসারিত প্রকৃতি, নীলে আর শ্যামলে, তাতে পর্যন্ত এতটুকু প্রাণ নেই। কেননা, আমি ভেবে দেখেছি, অনুচ্চারিত মনে কোনো রমণীর স্মৃতির সুষমা না থাকলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ সম্ভোগ করা যায় না, সে নিতান্তই তখন একটা মানচিত্র হয়ে ওঠে।

এমনি যখন কচুরিপানাধ্বংস ও পাটচাষনিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘোরতর ব্যাপৃত আছি, হঠাৎ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল। হ্যাঁ, সেটাকে ঘটনাই বলতে হয়। অবাক হয়ে ভাবলুম, এ আমি এতদিন ছিলুম কোথায়!

রেলওয়ে স্টেশনটা শহর থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। বসতি-বিরল ক্ষেতের উপর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সুরকির রাস্তাটা স্টেশন ছুঁয়ে লোকাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা হয়ে গ্রামের মধ্যে চলে গেছে। সেই সন্ধিস্থলের কাছাকাছি ছোট একটা মুদি-দোকান। দোকানটা এর আগে কোনোদিন আমার চোখে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলুম না, যদিও টুর শেষ করে বহুদিন এরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ হঠাৎ সেই দোকানটা চৌরঙ্গির শো-কেসের চেয়েও জাঁকালো মনে হল।

নিচু দোচালায় বাঁশের মাচা বেঁধে এই দোকান—ভিতরের দিকে দরজা দেখে বোঝা যায় অন্তরালে দোকানির অন্তঃপুর আছে। মাচার উপরে কতকগুলি মাটির গামলায় নানারকমের ডাল, নুন, শুকনো লঙ্কা, আদা-হলুদ থেকে এলাচ, সুপারি, জাপানি কিছু খেলনা, গৃহস্থালির

টুকিটাকি জিনিস, গ্রাম্য প্রসাধনের সস্তা সাজ-সরঞ্জাম। দোকানের লাগোয়া খানিকটা জমিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল, সন্ধের ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে বলে কোচোয়ান গাড়ি জুতছে।

দোকানে ভিড় দেখে হিসেব করে দেখলুম আজ হাট-বার। পসারিরা শহরের বাজারে কেনা-বেচা করে বাড়ি ফেরবার মুখে এখান থেকে কেউ রানী-মার্কা তেল, কেউ বা কড়াইয়ের ডাল কেউ বা এটা-সেটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এত সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না দেখে আমার উপায় ছিল না, যদিও দৃশ্যত সেখানে আমি নেমে পড়েছিলুম কাউকে দিয়ে একটা দেশলাই কেনাবার জন্যে।

এই ছোঁড়া, শোন। রাস্তার একটা ছোকরাকে ডাকলুম।

আমার ডাক শুনে গ্রামিক ক্রেতার দল ত্রস্ত হয়ে উঠল। নিরুপায় স্তব্ধ হয়ে গিয়ে এ ওর গা-টেপাটেপি করে নিম্ন ভীত কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগল : সাহেব, বড়ো সাহেব।

বড়ো ভালো লাগে নির্বোধ জনতার এই সভক্তি ভীতি দেখে। কিন্তু মাচার উপর বসে কালো ফিতেয় কেশমূল দৃঢ় আবদ্ধ করে যে মেয়েটি আনত আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে ক্ষিপ্র আঙুলে বেণী বাঁধছে, তার ভঙ্গিতে এতটুকু একটু ত্বরা বা কুণ্ঠা এল না। শুধু কটাক্ষকুটিল কালো দুটি আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার কেশ-রচনায় মনোনিবেশ করলে।

ছোকরাটা কাছে এলে তার হাতে একটা পয়সা দিলুম। বললুম, একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো। বলে কেস থেকে একটা সিগরেট বের করে বুড়ো আঙুলের নখের উপর ঠুকতে লাগলুম।

মেয়েটি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে, মুখ না তুলে, তেমনি অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোকরাকে বললে, এ দুকানে দিশালাই নেই।

ছেলেটা পয়সা ফিরিয়ে দিল।

হঠাৎ মনে হল, সাইকেলের শেকল বা ব্রেক কোথায় যেন কী বিগড়েছে। তাই এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে ওটাকে মিথ্যে সজুত করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দেখলুম এর মধ্যে মেয়েটি একবারো

আয়নার থেকে চোখ তুলল না, অমনি নির্লিপ্ত বসে-বসে হালকা হাসির ফোড়ন দিয়ে কারু-কারু সঙ্গে পরোক্ষে ফষ্টি-নষ্টি করছে। শুনলুম, স্পষ্ট শুনতে পেলুম, কোচোয়ানকে সম্বোধন করে ও বললে, এই জামাল, সাহেবের কল খারাপ হয়ে গেছে, গাড়ি করে কুঠিতে পৌছে দিয়ে আয় না। বলেই দীর্ঘপক্ষ্মজাল তুলে ও আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করল।

এর পর আর সাইক্লে করে ফেরা যায় না। তাই গম্ভীর মুখে কোচোয়ানকে উদ্দেশ করে বললুম, এই লাও গাড়ি।

হুকুম শুনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। সাইকেলটা নিজেই ছাদে তুলে দিলুম। গাড়িতে গিয়ে বসতেই সিগারেট ধরালুম। নিজের চার পাশে একটু নিভৃতি খুঁজে পেয়ে সন্তর্পণে তাকালুম মেয়েটি যদি একবার দেখে। কিন্তু তার অবজ্ঞাটা চমৎকার।

সেদিন কী ভাগ্যিস, ক্লাবে যেতে হল না, আটটার আগেই ডিনার খেয়ে বাইরে লনে, ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লুম। দুই চোখ ভরে একসঙ্গে কত যে তারা দেখলুম, কত যে আশা আর ব্যর্থতা, তার ইয়ত্তা নেই। ভাবলুম, এ কী করে সম্ভব হতে পারে।

মেয়েটি হিন্দুস্থানি, বয়েস আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গায়ে পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ-তোলা ফুরফুরে পাতলা একটা শাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে শুরু করে রৌদ্রঝলকিত নিষ্কাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেখেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিময় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মানুষের ভাষায় তৈরি হয় নি। ওর সমস্ত অসাধারণত্ব ছিল ওর দুই চোখে—সে কী আশ্চর্য চোখ—যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে হাড় পর্যন্ত এসে বিদ্ধ করে। সেই চোখে এতটুকু সুকোমল মোহ নেই, যেন কঠিন নিষ্ঠুর একটা বিদ্রূপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোখ শানিত সঙ্কেত করে : ধরা পড়ে গেছ।

তারপর আরো দু-তিন দিন নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে দোকানের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আমাকে এটা-ওটা ফরমাজ করতে হয়েছে, কিন্তু

ততোবারই মেয়েটি অস্বাভাবিক নির্লিপ্ততায় গম্ভীর খবর পাঠিয়েছে— এ দোকানে তা পাওয়া যাবে না।

দোকানের ধারে ছোট পঙ্কিল একটা ডোবা ছিল। সেদিন সর্টস পরে হাণ্টার হাতে নিয়ে অনাবশ্যক প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখি, মেয়েটি একটা গুঁড়ির উপর বসে এক পাঁজা বাসি বাসন মাজছে। আস্কন্ধ অনাবৃত দুই বাহু, মাথার ঘোমটাটা পিঠের উপর বিশৃঙ্খল, সমস্ত ভঙ্গিটা কেমন যেন অসহায়।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্যে ও ডেকে উঠল: ও লখনা রে।

ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোত্থেকে এল ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি-একটা ইসারা করতেই দুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে তুলে দিল। বাহু দিয়ে টেনে টেনে সেটাকে সুসঙ্গত করে মেয়েটি তার বসায় একটা কাঠিন্য আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধত প্রহরীর মতো। মনে-মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।

অথচ তার সাধারণ যা হাব-ভাব তাতে তার এই কঠিন গাম্ভীর্যের কোথাও কোনো সমর্থন পাওয়া যেত না। তাকে যখন প্রথম দেখেছি, দেখেছি তরল হাসির ঢেউয়ে উছলে পিছলে পড়ছে, এর-ওর সঙ্গে হালকা চটুলতায় মুখর হয়ে উঠছে, ওর বসা ও দাঁড়ানো, ভেতরে চলে যাওয়া ও দোকানে মাচার উপরে উঠে বসা ছোটখাটো সমস্ত ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপল্য ছিল যেটা সাদা চোখে ঠিক সুচারুসঙ্গত মনে হবার মতো হয়তো নয়, অথচ আমাকে দেখেই কিনা সে গাম্ভীর্যে নিটোল বা বিদ্রূপে ধারালো হয়ে ওঠে। হতে পারে, আমাকে সে ভয় করে; কিন্তু তার দোকান থেকে অপ্রাপ্য জিনিস কেনবার অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখে আমাকে আর তার ভয় করা উচিত ছিল না। এবং, আমি যে কত বড়ো অনুগ্রাহক এ-কথা তার অজানা নেই। সার্কেল-ইনস্পেকটারকে গোপনে ডেকে জিগগেস করলেই ওর এই দোকান সম্বন্ধে অনেক রোমহর্ষক ইতিহাস হয়তো শোনা যায়; অন্তত

কতবার ও-দোকান সার্চ হয়েছে এবং কত রাতে ওখানে 'বি-এল' কেস-এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এ-দোকান যে কিসের দোকান তা বুঝতে সামান্যতম কৌতূহলেরও হয়তো অবকাশ ছিল না। দোকানের এই পরিবেশ, মেয়েটির এই সাজ-গোজ, ছলা-কলা, চাল-চলতি, সব চেয়ে তার এই অদ্ভুত একাকিত্ব—সব কিছুতেই সে অতিমাত্রায় স্পষ্ট ও উদ্ঘাটিত। বলতে গেলে, এ-জানাটাই কিন্তু আমাকে সব চেয়ে বিঁধেছে! অথচ তার দুই চোখের সেই অদৃশ্য রহস্যের সঙ্গে তার এই বিলসিত দেহসজ্জার কোনো সঙ্গতি পেতুম না। মনে হত কোথাও একটা মস্ত বড়ো ভুল করে বসেছি।

ভাবলুম, দূত পাঠাই। নির্জন রাতে অন্ধকার বাঙলোয় বসে তাকে অভিসারিণী করে তুলি। কিন্তু পাঠাই কাকে? যে আজ আমার অনুচর, আমি বদলি হয়ে গেলে সে-ই আবার আমার গুপ্তচর হয়ে উঠবে, অতএব কাউকে বিশ্বাস নেই। আমরা সব হারাতে পারি, খ্যাতি হারাতে পারিনে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নয়, যদি খ্যাতি থাকে অব্যাহত। আর, এই খ্যাতি হচ্ছে আমাদের কাঁটার মুকুট। যতো সে শোভা ততো সে প্রতিবন্ধক।

অর্ডারলিকে বললুল, পায়ের রগে কেমন-একটা ব্যথা হয়েছে, সাইক্লে যেতে পারব না। একটা গাড়ি চাই।

অর্ডারলি জিগগেস করলে: ইস্টিশান?

না, চালনায় যাবো। মাইল আষ্টেকের পথ। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা রাস্তা আছে।

নিয়ে আসি।

আর, শোনো। তাকে বাধা দিলুম: জামালের গাড়িতে নতুন রং করেছে, নতুন টায়ার বসিয়েছে চাকায়। ওটা আনতে পারবে না?

পারব।

অর্ডারলি জামালের গাড়িই হাজির করলে। একটা পোর্টফোলিও নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে কাউকে নিলুম না।

জামালকে যদি ভিতরে বসিয়ে গল্প করি তবে গাড়ি চলে না, অতএব

শহরের সীমানা পেরিয়ে যেতে আমিই কোচবাক্সে উঠে বসলুম। খুব একটা মজা হচ্ছে এমনি একখানা ছেলেমানষি ভাব দেখিয়ে লাগামটা তুলে নিলুম। জামাল পাশে বসে পরম আপ্যায়িত বোধ করতে লাগল।

জিগগেস করলুম, গাড়িটা বুঝি তোমার?

জামাল কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আমার নয়। গৌরীয়ার গাড়ি।

কে গৌরীয়া? ঐ যার মুদি-দোকান?

হুঁ। আমি ঠিকে খাটি। মাইনে পাই। পনেরো টাকা মাইনে।

বটে। ওর তো তা হলে অনেক পয়সা!

তা হয়েছে অল্প-বিস্তর। আগে ছাগলের দুধ বেচত, কিছু-দিন ইষ্টিশানে ঝাড়াপোঁছারো নাকি কাজ করেছে।

জিগগেস করলুম: ওর বাড়ি কোথায়?

ফয়জাবাদ না মজঃফরপুরে।

এখানে এসেছে কেন?

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে।

বলো কি, ওর বিয়ে হয়েছিল নাকি?

আজ দু বছর। স্বামী ওকে একদিন নাকি খুব মেরেছিল উনুনে রান্না বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে। তাই সে রাগ করে পালিয়ে এসেছে।

আর ফিরে যাবে না?

তা একবার দেখুন না বলে। মারতে আসবে।

ঠিকই তো। কেনই বা ফিরে যাবে বলো, যখন এখানে ওর কোনো দুঃখ নেই। ঘোড়ার পিঠে টেনে একটা চাবুক কসলুম, বললুম, কিন্তু ওর স্বামী ওকে নিতে আসে না?

পাছে সে আসে সেই জন্যে বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।

একটু ভয় পেলুম বোধ হয়। বললুম, অন্যের বেলায় সে-ছুরি বুঝি তার চোখের তারায় ঝিলকিয়ে ওঠে।

কথাটা আস্বাদ করবার মতো জামালের ততো সূক্ষ্মতা ছিল না। তাই ফের বললুম, ভেতরে তো ছোট্ট একটুখানি খোপরি, ঐখানে তোমাদের জায়গা হয় কি করে ?

কী সর্বনাশ, জামাল সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল : আমি থাকব ও-ঘরে ? বলেন কি বাবুসাব, আমি যে ওর চাকর, মাইনে খাই।

অনুভব করলুম যুবক জামালের বলদৃপ্ত কঠিন শরীর যেন মুহূর্তে সঙ্কুচিত, পাংশু হয়ে উঠল।

তবে ওখানে থাকে কে ?

ওর দেশের বুড়ো এক ঝি আর ওর ঐ ছুরি।

আর কেউ না ?

আমি তো কখনো দেখি নি। বলে জামাল আমার হাত থেকে লাগাম তুলে নিল। আমি পরাভূতের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলুম।

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই ঘোরতর মেঘ করে এল। কলেজ ছাড়বার পর সেই প্রথম সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলুম। অমাবস্যা বলতে যেমন অন্ধকার, আমাকে বলতেও তেমনি হ্যাট-কোট বোঝাত। চিতেবাঘ যদি তার দাগগুলো মুছে ফেলে, সে একটা শেয়াল হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি টাই-ট্রাউজার্স ফেলে মফস্বলে শ্বশুরবাড়ি-করতে-আসা শহরের ফুলবাবুটি হয়ে উঠলুম। নিজেকে চিনতে নিজেরই অত্যন্ত দেরি হয়ে যাচ্ছে, অন্যে পরে কা কথা !

ঈশ্বর সদয় ছিলেন, তাই তখুনিই বৃষ্টি নামল যখন প্রায় দোকানটার কাছে এসে পড়েছি। বৃষ্টির থেকে ক্ষণিক পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যেন আশ্রয়ের বাছ-বিচার না করে দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দেখলুম, আগেই দেখেছিলুম, ঝোলানো লণ্ঠনের আলোতে গৌরীয়া মাচার উপরে পা টান করে বসে সুর করে কী পড়ছে। বুড়ো-মতন কে-একটা স্ত্রীলোক, বোধহয় ওর দেশের সেই ঝি হবে, মাটিতে বসে তাই শুনছে গদগদ হয়ে।

আমাকে দেখে গৌরীয়া থামল, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও চমৎকৃত

হল না। ঝি-কে শুধু বললে, মাচার তলা থেকে মোড়াটা বার করে দে।

মোড়া বার করে দিল। ছাতাটা মাচার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওয়াটার-প্রুফটা কোলে নিয়ে বসলুম। কিন্তু কী বলি ওকে? আমাকে দেখে কোথায় ও অভ্যর্থনায় অজস্র হয়ে উঠবে, তার বদলে এমন একখানা মুখ করে আছে যেন আমি মধু-উৎসবে উদ্যত একটা মৃত্যু-দণ্ডের মতো এসে বসেছি। কোথায় বা তার সেই ছলনা, কোথায় তার সেই ছুরি!

ঝি-কে ও ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললে, তুই ভেতরে যা, বাবুর সঙ্গে আমার কথা আছে।

নামের আগে বা পিছে বাবু-শব্দটা যে মোটেই পছন্দ করি না। বাঙলাভাবানভিজ্ঞ গৌরীয়ার তা জানবার কথা নয়, তবু মনে হল ও-কথাটার মধ্যে ও যেন ইচ্ছে করেই একটু অবজ্ঞা মিশিয়েছে। তবু বৃষ্টিমুখর মুহূর্তে ক্ষণিক একটু নিভৃতির সূচনা হল মনে করে খুশী হলুম।

কিন্তু গৌরীয়ার কথা গৌরীয়াই জানে। রাস্তার দুপাশের নালাগুলি জলে ভরতি হয়ে গেল। গৌরীয়া একমনে রামায়ণের পৃষ্ঠা উলটোচ্ছে।

শেষকালে আমিই কথা কইলুম। বললুম, সত্যি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বলব?

আনত চোখে কঠিন গলায় গৌরীয়া বললে, যদি অন্যায় না হয়, বলুন।

না, সে কি কথা, অন্যায় আবার কী বলতে পারি আমি, তাই শুকনো একটা ঢোঁক গিলে বললুম, এত রাতে, এখনো তোমার দোকান খুলে রেখেছ যে?

ও চোখ তুলে একটু হাসল। বললে, খোলা না রাখলে বৃষ্টিতে ভিজে লোক এসে দাঁড়াবে কোথায়?

কথাটা ঠিক আমাকেই নিক্ষেপ করেছে দেখলুম।

ঠিক সেই সময়টাতে কে-একজন বৃষ্টিতে গান ভাঁজতে-ভাঁজতে

দোকানে এসে দাঁড়াল। দোকানে ঢুকে সেই গানটা সাড়ম্বর নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে লোকটা হঠাৎ জিভ কেটে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তাকের উপর থেকে একটা শিশি টেনে এনে গৌরীয়া বললে, এই তোমার তেল, আরেকটা পুঁটলি বের করে: এই তোমার নুন। বলেই ঝিকে হাঁক দিলে। বললে, ঘরে একটা ছাতা আছে না? ওকে দিয়ে দে, ক্রোশ তিনেক দূরে ওর গাঁ, ও বাড়ি চলে যাক।

ঝি ছাতাটা বার করে আনল। গৌরীয়া লোকটাকে বললে, শিগগির পালা। এখুনি আবার চেপে আসবে।

গৌরীয়া আমার দিকে ব্যথিত চোখে তাকাল। বললে, আপনিও এবার বাড়ি যান, বাবুসাহেব। নইলে, এরপর আবার কোনো লোক যদি আসে, তবে তাকে তাড়াবার জন্যে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হবে। সেটা ভালো হবে না। আপনি বাড়ি যান।

কথার চেয়ে কথার স্বরটি ভারি ভালো লাগল। বললুম, বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এখানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে?

আছে। গৌরীয়া নিষ্প্রাণ গলায় বললে, জায়গাটা ভালো নয়।

তাতে আমার কী! বাইরে জল পড়ছে, তাই এখানে আমি একটু বসে যাচ্ছি বই তো নয়।

কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তার হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল বলেই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব! গৌরীয়ার সমস্ত ভঙ্গিটি বেদনায় যেন নম্র হয়ে এল: তাতে গরিব আরো গরিব হয়, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।

বা, বিপদে পড়ে তোমার এখানে এসে কেউ দাঁড়াতে পাবে না?

কিন্তু আমার ভয় হয় বাবুসাহেব, এখানে এসে না তুমি বিপদে পড়। গৌরীয়া ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠল: এখনো অনেক পয়সার সওদা নিয়ে যেতে বাকি। বৃষ্টির জন্যে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি

নিয়ে মোড়ার ওপর শুকনো মুখে বসে আছ, এ আমি কিছুতেই দেখতে পারব না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হবে এ দেখতে বুক আমার ফেটে যাবে, বাবুসাহেব।

বলেই সে ঝি-কে ডাকলে; বললে, ডোঙাটা মাথায় করে জামালকে ডেকে নিয়ে আয় তার বাড়ি থেকে। গাড়িটা বার করতে হবে। বাবুসাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আসবে তাঁর কুঠি।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, না, গাড়ি কেন? হেঁটেই চলে যেতে পারব।

রেইন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে আসছি, পিছন থেকে গৌরীয়া বললে, নমস্কার।

তাকালুম না পর্যন্ত। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এলুম। কুঠিতে গিয়ে কতক্ষণে যে এই ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আবার পরিচিত শার্ট-ট্রাউজার্সে উপনীত হব তারি জন্যে হাঁফিয়ে উঠলুম। মনে হল একটা অতলান্ত অপমৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে কি ঈশ্বর?

শুধু ঐ দোকান নয়, এই শহরই আমাকে ছাড়তে হবে। ড্যালহৌসি স্কোয়ারে তাই অনেক সই-সুপারিশ করে মাস তিনেক পর বদলি পেলুম।

মাল-পত্র আগেই রওনা হয়ে গেছে; পরে আমি, একা; বলা বাহুল্য, জামালের গাড়িতে নয়। স্টেশনে ছোটোখাটো একটা ভিড় হবে ও বহু লোকের সঙ্গে অনেক মুখস্থ-করা মামুলি কথা বলতে হবে, সেই ভয়ে ট্রেনের খুব সঙ্কীর্ণ সময় রেখেই আমি বেরুলুম।

গৌরীয়ার সেই দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দেখলুম, মাচার উপরে গৌরীয়া নেই। গামলাগুলি খালি, এ কদিনে দোকানের শ্রী অনেক কমে গেছে মনে হল। ভাবলুম, যাবার সময় ওকে একটিবার দেখে গেলে ভালো লাগত।

দেখলুম, পাশের সেই পুকুরধারে শাখাবাহুল্যবর্জিত কী একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে অল্প একটুখানি হাসল। সে অল্প একটুখানি

হাসা যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতোই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। দুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শূন্যতাকে সামান্য হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল-মার্ক পেয়েছে। একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে ও কোনোদিন আমার দিকে তাকায় নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি!

গাড়িটা খানিক দূর চলে এসেছে। বললুম, চললুম, গৌরীয়া।

গৌরীয়া হয়তো শুনতে পেল না, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলে গেছি মনে করে সে আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

এত দিনে মনে হল বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।

অকারণ

অফিসার ও অফিসারিকা-মহলে ঢি ঢি পড়ে গেল।

স্পর্ধিত স্ত্রী-প্রত্যয় করলুম। আর এমন কী কথা আছে যা দিয়ে এক কথায় বোঝানো যায়? স্ত্রী-অফিসার বলতে পারেন না, কেননা কথাটা সত্যি নয়; আর অফিসারের স্ত্রী যদি বলেন তবে আমার-আপনার পাড়ার পাঁচজনের স্ত্রীর মতোই কথাটা অর্থহীন হবে। তাই অফিসারের স্ত্রী-লিঙ্গে অফিসারিকা।

চটের ইজিচেয়ারে আলোয়ানে পা ঢেকে বসে যোগেন্দ্র রায় অমৃতবাজারে ক্যালকাটা গেজেট পড়ছিল, দর্পিত জুতোর শব্দে চেয়ে দেখল, স্ত্রী। খুব যেন ব্যস্ত, উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ঢুকছে। নিচের ঘরেই স্বামীকে দেখতে পেয়ে যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সামনের একটা চেয়ারে সে বসে পড়ল, তপ্ত ক্ষুব্ধ গলায় বললে, যত সব নীচ ছোটলোক ইতর কোথাকার!

যোগেন্দ্র চমকে উঠল। দুই হাতের থাবড়ায় একটা মশা মেরে সে জিগগেস করলে: হল কী?

সর্বাণী বললে, সেই সেদিন দাস-সাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে ক্যাম্প করতে গিয়েছিলুম, তাতে সব অফিসারনিদের চোখ টাটিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

ঢোঁক গিলে কথাটা যোগেন্দ্র হজম করে নিল। বোকার মতো বললে, তাতে দোষের কী হয়েছে?

দোষের হয় নি? সর্বাণী চুড়ি বাজিয়ে ঝাঁজিয়ে উঠল: ওঁদের

কাউকেও নেমন্তন্ন করে নি যে। সইবে কেন? এত বড় একেকটা রাঘব বোয়াল ছেড়ে পুঁচকে একটা পুঁটিমাছের ডাক পড়ল, গায়ে লাগবে না তাতে? তাই দুর্নাম করে শুধু গায়ের ঝাল মিটানো হচ্ছে। কাওয়ার্ডস!

গাল চুলকোতে-চুলকোতে যোগেন্দ্র বললে, দুর্নাম—দুর্নাম কিসে?

বা, পরপুরুষের সঙ্গে দুদিন পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটিয়ে দিয়ে এলুম, দুর্নাম করবে না?

ছি ছি ছি, লজ্জায় যোগেন্দ্র যেন কালো হয়ে গেল: সঙ্গে মিসেস দাস ছিলেন, তাঁর মেয়ে ছিল—এমনি একটুখানি আউটিং করে আসা—।

সে-কথা শোনে কে? অশোকবনেও তো মন্দোদরী ছিল, সরমা ছিল, তবু কি এঁরা সীতাকে রেহাই দিয়েছেন নাকি? আগুনে ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছেন।

তুমি বললে না কেন, আমার স্বামী রামচরিত্র নন। নেহাতই প্র্যাকটিক্যাল র‍্যাশন্যাল মানুষ, তাঁর এতে অমত ছিল না।

সে-কথা বলে আমি ছাড়া পেতে যাব কেন? সর্বাণী বিষিয়ে উঠল। গায়ের স্কার্ফটা দিয়ে গীতিমান, উড্ডীয়মান, অপস্রিয়মাণ মশা তাড়িয়ে বললে, শুধু স্বামীর দোহাই দিয়ে যারা কাজের ভালো-মন্দ দেখে, সে-সব মেয়েমানুষকে আমি মানুষ বলি না। এটাতে স্বামীর মত আছে অতএব এ কাজটা ভালো—এ একটা অসার যুক্তি; এ-কাজটা মন্দ নয় বলেই স্বামীর অমত নেই, এইটেই হচ্ছে কাজের আসল নিরিখ।

তোমার এই ফিলজফি তারা বুঝবে কিসে? শুধু মোটা জিনিস দেখে—মোটা মাইনে, মোটা শরীর আর মোটা বুদ্ধি। যোগেন্দ্র সূক্ষ্ম করে হাসল: তাই এ-জিনিসটাও কিঞ্চিৎ মোটা করে দেখেছে। ওদেরকে কৃপা করো, ক্রোধ কোরো না।

পায়ের সঙ্গে পা ঘসতে-ঘসতে সর্বাণী বললে, আর কাউকে না বলে মিসেস দাস আমাকে বলেছেন সেইখেনেই ওদের রাগ। কম মাইনে পেয়েও ওঁর সঙ্গে সমানে-সমানে মিশি তাই হয়েছে চক্ষুশূল।

তুমি কম মাইনে পাও মানে? চশমা বাঁচিয়ে যোগেন্দ্র কপালের উপর একটা চড় মারল।

হা অদৃষ্ট! মাইনে কি তবে অফিসাররা পায় নাকি? তুমি আছ কোথায়? আমাদের শান্ত-দিদি কী বলেন শোনো নি বুঝি?

কী বলেন?

বলেন, যখন আমার চারশো টাকা মাইনে তখন জ্যোৎস্না হয়, সাড়ে-চারশো না হতেই শ্যামু জন্মায়, আর পাঁচশো পেরোলে তবে পরিমল।

যোগেন্দ্র হা-হা করে হেসে উঠল।

সেই হয়েছে রাগ। কম মাইনে পাই অথচ কম মাইনের মতো দেখাই না—সেইটেই আমার অহঙ্কার। সেদিন রলিন্‌সনের স্ত্রী এসেছিলেন গার্লস-স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে—আমি ওঁর সঙ্গে বসে ইংরিজিতে কথা বলেছি, মেয়েদের অভিনয়ের বিষয়গুলি দিয়েছি বুঝিয়ে, সেইটে নাকি আমার বাড়াবাড়ি। সর্বাণী ঘৃণায় বিষাক্ত হয়ে উঠল: আর সেদিন মুখার্জি-সাহেবের বাড়িতে ওদের কথা হচ্ছিল, ছেলে পেটে এলে কার কী রকম বমি উপসর্গ হয়, অপরাধের মধ্যে আমি সরে বসে মিসেস দাসের সঙ্গে তাঁর সিঙ্গাপুর বেড়ানোর একটু গল্প করছিলুম—হয়ে গেল সেটা আমার চাল, সেটা আমার ফুটুনি।

ছেড়ে দাও! আমাদের যা খুশি তা করব, পরে যা খুশি তা বলবে। ছেড়ে দাও! আলোয়ানটা আরো গুটিয়ে গুঁজে নিয়ে যোগেন্দ্র কাগজে মন দিলে।

কিন্তু চরিত্রে কটাক্ষ করবে?

কটাক্ষকুটিল যাদের চোখ, তাদের চরিত্রই বা তুমি শোধরাবে কী করে?

দাঁড়াও না, কথাটা আমি দাস-সাহেবের কানে তুলব।

যাও! যোগেন্দ্র একটা ধমক দিল।

হ্যাঁ, কথাটা তিনি শুনুন।

শুনে তিনি কী করবেন? কমপ্লেনেন্ট তো সব মেয়েরা।

তা জানি। সর্বাণী উঠে পড়ল : রত্নাকরের পাপ না-হয় তার বাপ-মাকে স্পর্শ করে নি, সেটা ছিল রামায়ণের যুগ, এ-কালে আর সে-নিয়ম নেই। তোমার নাগাল না পাই, তোমার বাড়ির কুকুরটাকে দেখে নেব। জুতোর দর্পিত শব্দ করে সর্বাণী অন্তরালে অন্তর্হিত হল।

উদ্যত হাতে কিছুকাল একটা মশার পশ্চাদ্ধাবন করে ব্যর্থ হয়ে যোগেন্দ্র কাগজের পৃষ্ঠা উলটোল।

মিত্র বললে, সঙ্গে স্ত্রী ছিল তো!

সেইটেই তো চালাকি। গাঙ্গুলি ফোড়ন দিল : স্ত্রীরা শিখণ্ডীর পার্টে চমৎকার।

আর এমন জিনিস ইউরোপের সমাজেও পাবেন না মশাই! মহলানবিশ এক পোঁচ রঙ চড়াল।

তাতে আপনার কী আপত্তি? সান্যাল বললে, আমি আমার স্ত্রীকে যদি যেতে দি, তাতে আপনাদের কী মাথা-ব্যথা? আপনাদের সঙ্গে দিই নি, এই তো গ্রিভ্যান্স!

যা বলেছেন দাদা! দত্ত-মজুমদার টেবিলে একটা চড় মারল।

মানে কি না, ফল-মূলের ডালি দেয়া তো উঠে গেছে—রসালো করে গাঙ্গুলি কী বলতে যাচ্ছিল, লাঠি ঘুরোতে-ঘুরোতে ক্লাবে যোগেন্দ্র এসে উপস্থিত।

আজকের স্টেটসম্যানটা কই রে কেশব? গাঙ্গুলি কথাটাকে বেলাইনে নিয়ে গেল।

কি রে, এখনো তোর তামাক সাজা হল না? মহলানবিশ পকেট থেকে পাশিং-শো বার করলে।

নতুন তাস বার কর। বললে দত্ত-মজুমদার।

ওদিকে, দিদিদের ওখানে, যূথিকা বললে, শুনেছেন দিদি, দাস-সাহেবের ওখানে কাল আবার একটা টি-পার্টি হয়ে গেল। হোমরা-চোমরা কে-না-কে এসেছিল তার জন্যে।

সর্বাণীর নেমন্তন্ন হয় নি? কালীতারা চোখের তারাটাকে কাৎ করে জিগগেস করলে।

হয়েছিল বৈ কি। শুনলুম দুখানা গানও নাকি গেয়েছে। যূথিকা বললে।

তুমি জানলে কোত্থেকে? শান্তদিদি প্রশ্ন করলে।

কর্তা গিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছে শুনলুম।

আর কে গিয়েছিল?

গিন্নিদের মধ্যে রলিন্‌সনের স্ত্রী, চূড়ামণির স্ত্রী, আর উনি।

আর ওঁর কর্তা?

সে তো মফস্বলে, টুরে। পাড়ায় থাকেন, তাই হেমনলিনী বললেন।

যূথিকা বেশি খবর রাখে, তাই বললে, না, শুনলুম কোথায় নাকি সাক্ষী দিতে গেছে।

তা, তোমাদের আপত্তি কোথায়? শান্তদিদি জিগগেস করলেন, আপত্তি তো এইখানে যে তোমাদের কাউকে না বলে শুধু ওকে বলেছে? কী বল, কালী?

আমাদের বললেও আমরা যেতে পারতুম না এমন স্বামীছাড়া। কালীতারা বললে।

আর আমরা হয়তো এমন সব দেখতে-শুনতে, স্বামীরা সঙ্গে নিতে আপত্তি করতেন। শান্তদিদি নিজেই হেসে উঠলেন।

কথাটা যূথিকার লাগল। কেননা এখনো সে পিঠের আঁচলটা আগে ঠিক করে নিয়ে শাড়িতে প্যাঁচ দেয়। চোখের পাতার নিচে, কানের পাশে ও কণ্ঠার হাড়ের কাছে একটু-আধটু পাউডারের আভাস লুকিয়ে রাখে। গম্ভীর হয়ে সে বললে, না দিদি, অমন অসভ্যতা আমরা করতে পারব না।

যাই বল, সভ্যতাই বা করব কোত্থেকে? শান্তদিদি কৌটো থেকে জর্দা বার করে মুখের রক্তিম গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন: ওর মতো না পারি গাইতে গান, না পারি না-থেমে ইংরিজি বলতে।

ার আমার শ্যামুর বাপ টাকার জন্মে যেমন বিয়ে করেছিল, পেয়েওছে তেমনি এই শ্যামকান্তি!

যুথিকা ছাড়া আর সবাই হাসল। তার দশ বছরের মেয়ে বিভার এরি মধ্যে পঞ্চাশের উপর গানের স্টক হয়ে গেল তার খবর হয়তো এরা রাখে না।

তার পর শুনি দু-তিনটে কী পাশ করেছে। বললেন হেমনলিনী।

আমাদের পড়ালে আমরাও পাশ করতে পারতুম। কালীতারা চোখ দুটোকে টেরছা করল: সাত-ছেলের মা গদাধর-মাস্টারের বউ, কেমন একবারে ম্যাট্রিক পাশ করে গেল।

যাই বল দিদি, একাধটা পাশ করে রাখলে মন্দ হত না। হেমনলিনী সাংসারিক বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, নইলে তিনটে ছেলে-মেয়ের জন্মে, তিনেকে তিন, তিন দুগুণে ছয়-ছয়টা মাস্টার রাখতে হচ্ছে। যোগেন্দ্রবাবুর ঐ এক ছেলে—ন বচ্ছর বয়স—স্কুলে ক্লাশ ফোরে না ফাইভে না-জানি পড়ছে—একটাও মাস্টার রাখতে হয় নি। সব ওর মা-ই পড়িয়ে নিতে পারছে। বাংলা-ফাংলা যদি বা পারি দিদি, অঙ্কেতে একেবারে গুড়ুম।

নরেন-মাস্টারের স্ত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, হাত ঘুরিয়ে বললেন, আগো, থোন্ ফালাইয়া। জানা আছে ঐ পোলার বিদ্যা। এইবার হাপিয়ালি পরীক্ষায় অঙ্কে পাচ পাইছে। পাচ! বলে তিনি দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করে দেখালেন।

ভর-সন্ধেটার সময়, এমন সময় ভদ্রলোক কেউ বাড়ি থাকে না, নিচে থেকে কে ডাক দিল: ব্যেরা।

সাড়া নেই।

ডাকটা মধ্যবিত্ততায় অবতরণ করলে: ঠাকুর!

সর্বাণী বাইরের ঘরে বেরিয়ে এসে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। করজোড় করে নমস্কার করে বলে, কি আশ্চর্য, বসুন।

বেতের একটা মোটা চেয়ারে বসে পড়ে দাস বললেন, কোথায় ?

সর্বাণী মনে-মনে হাসল। বললে, ক্লাবে।

আর আপনি একা বাড়িতে বসে আছেন? আপনাকে নিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন না ?

কদাচিৎ।

এটা অন্যায়। আপনি জোর করে ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন।

মায়া করে। সর্বাণী চমৎকার করে হাসল: দিনে-রাত্রে আপিস আর সংসারের মাঝে এইটুকু সময় ওঁর ফাঁকা—সন্ধের এ ঘণ্টা তিনেক। এটুকু সময় উনি নিজের খেয়ালে কাটান, চেঁচিয়ে হাসেন, বেফাঁস দু-চারটে কথা বলেন, পরনিন্দা করে আনন্দ পান—এ সময়টায় আমি আর হস্তক্ষেপ করতে চাই না।

কিন্তু আপনার কাটে কী করে—তাঁর তো সেটা দেখা উচিত। দাস পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার করলেন: এ-সময়টায় বেরিয়ে পড়বেন বাড়ি ছেড়ে। ফাঁকায় খুব খানিকটা ঘুরে আসবেন। স্বাস্থ্য—গ্লো, গ্লো—গ্লোর বাঙলা কী ?

আভা। দীপ্তি। সর্বাণী হাসল।

হ্যাঁ, সেই দীপ্তিই হচ্ছে সৌন্দর্য। ইচ্ছে করলে ভালো বাঙলা শিখতে পারতুম। দাস সিগারেটটা মুখে পুরে ফের নামিয়ে রাখলেন, বললেন, একেবারেই বেরোন না নাকি ?

বেরোবার লোক পেলে বেরোই, আবার ঘরে বসে গল্প করবার লোক পেলে ঘরে বসে গল্প করি। সর্বাণী সপ্রতিভের মতো বললে।

বেরোবেন কি বসবেন দাস হঠাৎ ভেবে পেলেন না। বললেন, অসুবিধে না হয় চলুন না, একটু আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

মোটরে ঘুরলে কি স্বাস্থ্যের খুব বেশি উন্নতি হবে ? সর্বাণী সূক্ষ্ম একটু কটাক্ষ করল।

তবু দেয়ালের বাইরে খানিকটা ফ্রি এয়ার—

মুক্ত বাতাস, সর্বাণী ধরিয়ে দিল: আমার আপত্তি নেই, তবে,

বাইরের দিকে চেয়ে বললে, আমার কাছে যেন কে আসছেন। এই যে আসুন, ছোড়দি।

আর কেউ নয়, যুথিকা।

আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দি। ইনি মিসেস্ গাঙ্গুলি—আর ইনি—

দাস উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কপালে হাত ঠেকালেন। যুথিকাকেও প্রত্যুত্তর করতে হল।

ওর ছোট বোন মল্লিকার সঙ্গে পড়তুম আমি কলেজে। সর্বাণী বললে, সেই সুবাদে আমারো ছোড়দি। মল্লিকার স্বামীকে আপনি চিনতে পারেন। নাগপুর না জব্বলপুরের প্রফেসর।

প্রফেসর নয়, পুনার ডাক্তার। এম-আর-সি-পি। ভিয়েনার ট্রেনিং আছে। যুথিকা সংশোধন করল।

কী নাম বলুন তো? চেয়ারে বসে দাস প্রশ্ন করলেন।

অবনী মুখুজ্জে, না? সর্বাণী বললে।

অবনীশ মুখার্জি। যুথিকা সংশোধন করল।

কে, অবু? Good God! বিলেতে যে একসঙ্গে ছিলুম আমরা। কত ইয়ার্কি করেছি—সেই অবনী? ইস, একেবারে অবনীশ হয়ে গেছে? বা, কী আশ্চর্য, বসুন, সেই সম্পর্কে আপনিও যে আমার ছোড়দি হলেন, মিসেস্ গাঙ্গুলি। মানে, এই আর কি, অবুর সম্পর্কে। বসুন। দাস নিজেই একখানা চেয়ার দিলেন এগিয়ে।

যুথিকা বসল।

আপনারা বসুন, আমি চা করে আনছি। সর্বাণী দ্রুত অন্তর্ধান করলে।

বড় জোড় দশ মিনিট লাগবার কথা, কিন্তু আধঘণ্টাতেও সর্বাণীর হয় না। চাকরকে চা করতে বলে সে উপরে উঠে গেল কাপড় বদলাতে। তার পর বিনিয়ে-বিনিয়ে চুল বাঁধা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শাড়ি পরা—একটার পর একটা বেড়েই যাচ্ছে তার শোভাচর্চা।

তার ননদ মুকুলিকা, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে

বললে, এ কী বৌদি, এখনো তোমার হল না? উনি বসে আছেন যে নিচে।

কব্জিতে ও কনুইয়ে, ঘাড়ে ও গলায়, একটু-একটু সেণ্ট বুলিয়ে সর্বাণী বললে, একা নন। সঙ্গিনী আছে কথা বলবার। চা-টা তুমি ততক্ষণ সার্ভ করো না, আমি যাচ্ছি।

আমার বয়ে গেছে। মুকুলিকা ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নিক্ষেপ করে পলায়ন করলে। চাকরের হাতে ট্রে নিয়ে সর্বাণী ড্রইং-রুমে প্রবেশ করল। দেখল যূথিকার আড়ষ্ট ভাব তখনো কাটে নি, তাই আর কিছু না পেয়ে তার বাপের বাড়ির গল্প করছে, আর দাস তাঁর হাতের সিগারেটটা নখে চিরে টুকরো-টুকরো করছেন।

How late! দাস পিঠ বেঁকিয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়তে-পড়তে বললেন।

সর্বাণী মুচকে হেসে বললে, এই সামান্য কথাটারো কি আপনি বাঙলা জানেন না?

I am sorry, কী বিলম্ব! দাস শব্দ করে হেসে উঠলেন।

দরকার নেই আর আপনার ভালো বাঙলা শিখে। সর্বাণী চা ঢালতে-ঢালতে বললে, তবু এইটুকু রক্ষে যে ইংরেজিতে হাসেন না।

চায়ে মাত্র এক চামচ চিনি ঢেলে দাস পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলেন। বললেন, কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?

সর্বাণী বললে, হ্যাঁ, আমরা দুজনে এখন একবার অশান্তদিদির বাড়ি যাব।'

শান্ত-দিদি। যূথিকা সংশোধন করলে।

ঐ, যা বায়ান্ন, তাই তেপ্পান্ন। একবার শান্ত একবার অশান্ত—তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বাণী মিনতির সুরে বললে, আমাদের সেখানে একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন আপনার গাড়িতে?

With pleasure, দাস লাফিয়ে ওঠবার ভঙ্গি করলেন।

বলুন, স্বচ্ছন্দে।

আপনারই ভুল হল। দাস বললেন, With pleasure মানে আনন্দের সঙ্গে, সানন্দে।

কিন্তু চলতি ভাষায় সানন্দে না বলে আমরা স্বচ্ছন্দে বলি।

মরুক গে, কিন্তু আপনার চা কই?

ও খেতে গেলেই আমার মুখের মধ্যে কেমন ফ্রুৎ-ফ্রুৎ শব্দ হয়, তাই সাহেবদের সামনে আমি ও-সব খাই না।

চা মুখে নিয়ে হাসতে গিয়ে দাসের প্রায় বিষম লাগার যোগাড়।

চলুন ছোড়দি, শান্ত-দিদিদের বাড়িটা একটু ঘুরে আসি। নতুন কী সব সস্তায় ফার্নিচার আনিয়েছে, দেখে না এলে দেমাক বলবে।

অগত্যা যূথিকাকেও এসে গাড়িতে উঠতে হল। কিন্তু মুখখানা যেন ল্যাপা একখানা উনুন।

দাস বসল স্টিয়ারিঙে।

শান্ত-দিদিদের বাড়ির গেটের কাছে গাড়ি থামতেই বেয়ারা বললে, বাড়িসুদ্ধ সবাই গিয়েছে সিনেমায়।

তবু, বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে, দরজা খুলে নেমে এল সর্বাণী। বললে, পাশেই আমার পিসিমার বাড়ি, আমি সেখানে একটু যাব। ওঁকে আপনি দয়া করে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন, কিংবা অন্য যেখানে উনি যেতে চান। আমি এখান থেকে কাউকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাড়ি যেতে পারব।

Mind, স্বচ্ছন্দে—সানন্দে নয়। দাস মোটর ছুটিয়ে দিলেন।

তার পরদিন বৈঠক বসল যূথিকার বাড়িতে।

সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে রাগে গজগজ করতে-করতে যূথিকা বললে, জানোয়ার কোথাকার!

কাকে বলছ, বৌদি? যূথিকার নবাগত ননদ সুপ্রভা প্রশ্ন করল।

ঐ সর্বিকে। যূথিকা উঠল ঝঙ্কার দিয়ে: ও বাইরের ঘরে আমাকে বসিয়ে রাখল কেন শুনি?

দেখতে, তোমার গায়ে কত বড় একেকটা ফোস্কা পড়ে। কিন্তু জিগগেস করি, সুপ্রভা ঝাঁজ মিশিয়ে বললে, তুমিই বা বসে রইলে কেন? আচ্ছা, আপনি বলুন—বলে কেন সোজা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলে না?

কিন্তু ওর বাড়িতে গেছে, ওই তো সেধে ভিতরে ডেকে নিয়ে যাবে। হেমনলিনী যূথিকার পক্ষ নিলেন।

বেশ, এতই যখন আপনাদের আত্ম-পর বিবেচনা, এতই যখন মান-অপমান-জ্ঞান, তখন, সুপ্রভা যূথিকার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল: তখন যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলে সেই পথ দিয়ে ফিরে এলে না কেন?

কী করে আসব, যূথিকা নিজের পক্ষে বলবার মতো একটা কথা পেল: আমার সঙ্গের চাকরটাকে সে সর্বাণী আগেই বিদায় করে দিয়েছে।

এতই যখন তুমি নির্বল, নিঃসম্বল, তখন তো মোটরে চলে এসে ভালোই করেছ। সুপ্রভা টিপ্পনি কাটল।

যাই বল বাপু, শান্ত-দিদি হাঁ করে খানিকটা জর্দা গ্রহণ ও খানিকটা জর্দা লেহন করে বললেন, ও যখন পিসির বাড়ি যাব বলে গাড়ি থেকে নেমে গেল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তো নেমে গেলে পারতে।

আমি নামব কোথায়? যূথিকা হাঁসফাঁস করতে লাগল।

কেন, আমার বাড়িতেই যেতে। আমার বুড়ো শাশুড়ি বাড়ি আছে—তা তো তুমি জান, আর এ-ও নিশ্চয় জান যে তিনি সিনেমায় যেতে পারবেন না। তাঁর সঙ্গেই না-হয় গল্প করতে খানিকক্ষণ।

কিন্তু সময় পেলুম কোথায়?

কিন্তু তাঁকে তুমি একবার বলেছিলে যে তুমি আমার বাড়িতেই ঠিক যাবে? শান্ত-দিদি হাকিমি গলায় জেরা করলেন।

সব—সব আগে থাকতে চক্রান্ত করা। কালীতারা বললেন, জাঁহাবাজ মেয়ে, বাবা।

চক্রান্তই হোক, আর উপস্থিত-বুদ্ধিই হোক, ভদ্রমহিলাকে আমি কিন্তু প্রশংসা না করে পারছি না। সুপ্রভা গম্ভীর হয়ে বললে।

প্রশংসা! হেমনলিনী নিজের গালে একটা বিস্ময়সূচক চড় মারলেন: মেয়ে হয়ে এ-প্রশংসা যেন না পেতে হয়!

দস্তুরমতো খারাপ! কালীতারা চোখের তারাদুটোকে যথেষ্ট গোল ও যথেষ্ট ঘোরালো করে তুলল: যে খারাপ, তারই আবার ঝোঁক হয় অন্যকে খারাপ করার।

ঠিক কইছেন। নরেন মাস্টারের স্ত্রী এতক্ষণে উল্লসিত হলেন: আমার যে এউক্কা ছ্যাওর আছে, কোনই কামকাইজ্জ করে না, ক্যাবল সিগারেট ফুইক্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায়। সেদিন দেখি আমার পোলার পকেটে পোড়া একটা সিগারেট। বোঝনের আর বাকি রইল না কার কীর্তি। নিজে তো গেছেই, ছ্যামরার মাথাটাও চাবাইয়া খাইব।

সত্যি, আমাদের সব্বাইর সাবধান হওয়া উচিত। বললেন হেমনলিনী।

অর লগে আমাগ মিশনই উচিত না। নরেন মাস্টারের স্ত্রী ফতোয়া দিলেন।

আর তার খেই ধরে কালীতারা বলে উঠল: বয়কট।

যুথিকা এতক্ষণে আশ্বস্ত হল, কিন্তু সুপ্রভার হাসি সহ্য করতে পারল না, রাগে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: তুমি উকিলের বউ, তুমি এর বুঝবে কী?

অনেক দিন পরে, প্রায় মাসখানেকেরো উপর—সর্বাণী একদিন সন্ধ্যাবেলা দাস-সাহেবের বাড়িতে এসে হাজির। একলা, মানে, শুধু একটা চাকর সঙ্গে।

ড্রয়িং-রুমে দাস, দাস-পত্নী, আর তাঁদের মেয়ে চঞ্চরী।

চঞ্চরী বেহালা বাজাচ্ছে, আর, কিছু হচ্ছে না বলে নাকের ভিতর থেকে বেহালারই আওয়াজ বার করছে। দাস-পত্নী তাকে শাসন

করছেন কিংবা উৎসাহিত করছেন। আর এত বড় মেয়েকে এখনো তিনি ফ্রক পরান কেন—দাস তারি নালিশ জানাচ্ছেন আর পাইপে তামাক ভরছেন।

এমন সময় সর্বাণী এল।

রেহাই পেল ভেবে চঞ্চরী ছুটে পালাল—সাদা মোজা-পরা লিকলিকে বকের ঠ্যাঙে।

কী সৌভাগ্য আমাদের! দাস সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

অনেক দিন অনর্থক প্রতীক্ষা করলুম, শেষকালে বিরক্ত হয়ে নিজেই পড়লুম বেরিয়ে। কুশানটা আরেকটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে সর্বাণী বসল।

এখানে ছিলুম না অনেক দিন। দাস অপ্রস্তুত হবার একটা মোলায়েম ভঙ্গি করলেন: বনে-বাদাড়ে ঘুরতে হয়েছে।

আমিও ছিলুম না। দাস-পত্নী ঠোকর দিলেন।

ক্ষমা করুন, আপনাদের জন্যে অপেক্ষায় ছিলুম না। সর্বাণী মুখে একটি সরল অসঙ্কোচ আনল: ছিলুম আমার মধ্যবিত্ত দিদিদের জন্যে। কিন্তু বহুদিন ধরে তাদের দেখা নেই, আমাকে তারা বর্জন করেছেন।

কেন, কারণ? দাস-পত্নী জিগগেস করলেন।

কারণ, আপনাদের সঙ্গে আমি মিশি সেটা তাঁদের চক্ষুশূল।

মেশেন? কোথায়? হাসলেন দাস-পত্নী।

মেশেন, তাতে harm কী? দাস ঈষৎ উষ্ণ হয়ে উঠলেন: আমরা কি বাঘ না বনমানুষ যে আমাদের সঙ্গে মেশা যায় না?

আপনারা কি জানি না, কিন্তু আমি তো সামান্য একটা *টিকটিকি*! আমার কি শোভা পায় মাটির খুরি হয়ে ডিকেণ্টারের পাশে বসতে? ছ্যাকড়া গাড়ি হয়ে এরোপ্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিতে? কুপিত মুখে আরক্ত হাসি হেসে সর্বাণী বললে।

তাতে ওঁদের কী? দাস-পত্নীও কিঞ্চিৎ তপ্ত হলেন এবং তাঁর চিবুকে দুটি ভাঁজ পড়ল।

ওঁদের কিছু নয় বলেই তো ওঁদের এত মাথাব্যাথা!

Talking about—কিছু বলছে বুঝি? দাস চোখ দুটোকে একটু ছোট করলেন।

ভীষণ বলছে। যা মনে আসে মুখে আসে না তাই বলছে। মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের সম্বন্ধে যা বলতে পারে তাই।

Darned nonsense! দাসের মুখে প্রতিহিংসার কুটিল কয়েকটা রেখা পড়ল: কে-কে বলতে পারেন?

বলব বলেই তো এসেছি!

লোকের কথা শুনে আপনি ভয় পেয়েছেন নাকি? দাস-পত্নী গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

ভয় পাব তো এলুম কেন? আর, সোজা পায়ে হেঁটে এলুম। সর্বাণী বললে।

That's it, দাস উৎফুল্ল হয়ে সোফার পিঠে একটা ছোট্ট দোল খেলেন।

তবে নালিশ করতেই শুধু আসেন নি। দাস-পত্নী কথার সুরে তরল একটি হৃদ্যতা আনলেন: এমনি চলে আসতে আপনার স্বাধীনতা আছে, সাহস আছে, বন্ধুতার অধিকারও বা আছে; পরনিন্দায় আপনি ভয় করেন না, গণ্ডীর ক্ষুদ্রতার আপনি উপরে—এ-সব ব্যক্ত করবার জন্যেই তো তবে এসেছেন। আপনাকে তা হলে ধন্যবাদ।

আমি হাত-তালি দেব উর্মিলা, such a fund of রবীন্দ্রনাথ! দাস আবার দুটো দোল খেলেন; বললেন, চা করতে বল। একটু চা খাও। It's darned thirsty work, speech-making. পরে সর্বাণীর দিকে তাকিয়ে: ঠাকরুনদের নাম বলুন। I shall see.

সে-কথাটাকে ঢাকা দিয়ে উর্মিলা বললেন, তাই বলে আপনাকে সবাই ওঁরা ত্যাগ করলেন?

তাতে কী আসে যায়? সর্বাণী বললে, কে ওঁদের চিনত, কবেই বা ওঁদের সঙ্গে দেখা হবে?

কিন্তু একটাও বা অন্যায় কথা বলবার ওঁদের কী right আছে? Have the cheek to revile a—দাস বাকিটা বিজবিজ করলেন।

ওঁরা আপনাকে ত্যাগ করে থাকেন, আমরা আছি। উর্মিলা অনেকদূর যেন হাত বাড়িয়ে দিলেন : ওঁরা না মেশেন, আমাদের সঙ্গে মিশবেন। বিকেলে চলে আসবেন এ-বাড়ি, বললেই গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তারপর আমরা ঘুরব বেড়াব গল্প করব গান করব—কে ওঁদের তোয়াক্কা রাখে !

দাসের অনেকদিন পরে ইচ্ছে হল উর্মিলাকে ডার্লিং বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু সর্বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু গদগদ গলায় বললেন, Sure.

ঐ কথাটার বাঙলা আপনি জানেন নিশ্চয়। সর্বাণী হেসে উঠল : নিশ্চয়। এইখেনেই আমি আসব আমাকেও আমার সঙ্গী খুঁজে নিতে হবে।

উর্মিলা চায়ের তদারকে ভিতরে অন্তর্হিত হল। দাস বললেন, এবার সূর্পনখাদের নামের লিস্টিটা আমাকে দিন।

দেখতে-দেখতে প্রায় একটা ভোজবাজি হয়ে গেল। কেউ হল কাত, কেউ হল জখম, কেউ খেল গোপ্তা, আর যোগেন্দ্র রায় বসে ছিল এক মাটির ঢিপিতে, চড়ে বসল গিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ায়। আর টেলিগ্রাফে বদলি হয়ে গেল সে মজবুত কোন মহকুমায়।

এত দ্রুত, এতটা যেন দাস-ও ভাবতে পারেন নি !

কেরোসিন কাঠের বড়-বড় সিন্দুক বানানো হচ্ছে, খাট-টেবিল ভেঙে চট মোড়া হচ্ছে, প্রেসে লেবেল পর্যন্ত গেছে ছাপতে—এমনি একটা তছনছ ওলোট-পালোটের দুপুরে সর্বাণী যখন ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, শ্লথায়িত, জিনিসে আর জিনিসে, ঝাঁটায় আর ঝুলে—হঠাৎ তাদের বাড়ির দুয়ারের সামনে মোটর এসে দাঁড়াল।

ব্যোরা। নিচে থেকে দাস ডাকলেন।

চাকরটা ছিল কাছে, সর্বাণী বললে, নিচে গিয়ে বলে আয়, মা-জি এখন দেখা করতে পারবেন না।

চাকর তাই গেল বলতে।

ফের উপরে এসে বললে, ভীষণ জরুরী কথা, আপনাকে একবার নিচে যেতে বলেছেন।

ক্ষিপ্র হাতে টেবিলের পায়া থেকে কাগজের একটা ফালি ছিঁড়ে ও দোয়াত-দানি থেকে ছোট একটুকরো পেন্সিল কুড়িয়ে নিয়ে সর্বাণী বললে, বলগে, জরুরী যদি কিছু কথা থাকে এতে যেন লিখে দেন।

কাগজের ফালি আর পেন্সিলের টুকরোটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে দাস খানিকক্ষণ মূঢ়ের মতো বসে রইলেন। পরে কী ভেবে উঠে পড়ে পরদা সরিয়ে ভিতরের বারান্দায় এলেন চলে।

তারই পর থেকে সিঁড়ি চলে গেছে উপরে, মাঝখানে বাঁক নিয়ে। সর্বাণী যেন আতঙ্কিত কতগুলি পদশব্দ শুনল ; শূন্যে, না ঘরে, না তার বুকের মধ্যে বুঝতে পারল না। তাড়াতাড়ি ছুটে এল সে সিঁড়ির বাঁকের মুখে, দেখল নিচে দাস, ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত।

এ কি, আপনি এ-সময়ে? একেবারে গৃহস্থের অন্তঃপুরে? তির্যক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে সর্বাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

অপ্রতিভ না হয়েই দাস বললেন, আপনারা চলে যাবেন, তাই দেখা করতে এসেছি।

তা এখানে কেন? আমার স্বামী এখন আপিসে আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করুন গে যান। আপনার আপিস নেই?

দাস যেন দু চোখে ধাঁধাঁ দেখলেন ; সব যেন তাঁর কাছে কেমন অলৌকিক মনে হল। এতদিনের আলাপ এত ঘনিষ্ঠতা এত সৌহার্দ্য—সব যেন এক ফুঁয়ে মিথ্যা হয়ে গেল। যেন আর কিছু নয়, রৌদ্রদগ্ধ আদিগন্ত মরুভূমির উপরে ভাসমান একটা রুপালি মরীচিকা!

দাস কষ্টে একটু হাসলেন,। বললেন, কেন, আপনিও তো আমার বন্ধু, আপনার সঙ্গে দেখা করতে কি দোষ আছে?

আছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো স্ত্রী-বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটা আমি শিষ্টাচার মনে করি না। আমাদের সমাজে-সংসারে তার

প্রশ্রয় নেই। সর্বাণী সিঁড়ির বাঁক ঘুরে উঠে দাঁড়াল, রেলিঙে একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, আর বন্ধুতা হয় সমানে-সমানে। বাঘের সঙ্গে গিরগিটির নয়। আচ্ছা, নমস্কার। সাদা দেয়ালগুলি খিল-খিল করে হেসে উঠল।

Darned nonsense. দাস দাঁতে দাঁত চেপে তাঁর মোটরে গিয়ে বসলেন।

হরেন্দ্র

আমার সর্দি শুনে মিস সরকার আমাকে দেখতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপটা তখন বেশ জমে উঠেছে—সর্দির ওষুধের আলোচনায় আমরা তখন অ্যাকোনাইট ছেড়ে র ব্রাণ্ডিতে চলে এসেছি, হঠাৎ নজর পড়ল ঠিক আমাদেরই সামনেকার জানলার ওপারে কার দুটো বড়ো বড়ো হিংস্র চোখ।

বললুম, কে ?

কোনো জবাব পেলুম না। চোখ দুটো বুজে গেল। কিন্তু জলন্ত একটা নিশ্বাস শুনলুম।

আবার বললুম কে ওখানে ?

লোকটা সন্তর্পণে সরে যাচ্ছিল, উঠে পড়লুম আচমকা। বাইরে এসে দাঁড়ালুম, সর্দিতে গলায় যতোটুকু হেঁড়েমি ছিল একত্র করে ফের গর্জন করে উঠলুম : কে ও ?

আমি।

আমি কে ?

আমি হরেন্দ্র।

হরেন্দ্রকে আপনারা চেনেন না। হরেন্দ্র আমার আপিসে পাখা টানে।

আমি অনেক সময় ভেবে দেখেছি এ কেন হয় ? ঠিক যে-সময়টিতে পালে অনুকূল হাওয়া লেগেছে সে-সময়টাতেই স্টীমারের ধাক্কা লেগে নৌকাডুবি হয় কেন ? হয়, হবে, আগেও আরো হয়েছে।

প্রেস্টিজ-হানির ভয়ে মিস্টার সরকার নিম্নস্থ কর্মচারীর বাড়ি আসতে পারেন না বলেই ঈশ্বর হরেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিনাবাক্যে আমি ওকে বরখাস্ত করে দিতে পারতুম, কেননা এই একটিমাত্র লোক যাকে আমরা চাকরিতে বসাতে ও চাকরি থেকে খসাতে পারি। কিন্তু এখুনি ওকে বিদেয় করলে আজকের সংসার তো গেছেই, কালকের সংসারও চলবে না। সংসার মানে উনুন-ধরানো, বাজার-করা, বাসন-ধোয়া, ঘর-ঝাঁট-দেয়া—স্ত্রীদেরকে জিগগেস করে দেখবেন। হরেন্দ্র আমার আধখানা পাখা, বাকি আধখানা চাকা।

মিস সরকার কখন চলে গেছেন, রাত দশটার সময় একাদশতম পেয়ালায় চা খাচ্ছি, হরেন্দ্রকে ডেকে পাঠালুম।

ওকে অন্তত কঠিন তিরস্কার করাও উচিত ছিল, কেন ও আমার ঘরের জানালায় এসে উঁকি দেয়, শুধু উঁকি দেয় না, প্রজ্বলন্ত প্রতীক্ষায় নিষ্পলক চেয়ে থাকে। কিন্তু ভাবলুম, মোটে সাত দিন ও এসেছে, তিরস্কার করবার আগে ওর সঙ্গে প্রথমে আলাপ করা দরকার। স্বপক্ষ-বিপক্ষ সমস্ত এভিডেন্সের মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বিচার করবার অভ্যেস আর নেই।

ডাকলুম হরেন্দ্রকে।

ছ ফুটের উপরে লম্বা, কিন্তু শরীর একেবারে দড়ি পাকিয়ে গেছে। গাল দুটো বসা, গভীর গর্তের মধ্যে থেকে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে উঠেছে উদ্ধত বিকৃতে। গলাটা ঢিলে, নড়বড়ে, দেখলেই কেমন মায়া করে। বুকের জিরজিরে পাঁজর কখানা দেখলে হঠাৎ মুখ দিয়ে কঠিন কথা বেরুতে চায় না। তার দৈন্যদুর্দশার সঙ্গে চেহারার সমস্ত-কিছু অনায়াসে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়, কিন্তু তার চোখ দুটোই মেলানো যায় না। তাতে না আছে একটু বিনয়, না বা কাতরতা। সে দুটো যেমন উগ্র, তেমনি উদভ্রান্ত! আমি পুরুষ বলেই শুধু ভয় পেলুম না।

জিগগেস করলুম: তোর কি কোনো অসুখ?

ম্লান গলায় হরেন্দ্র বললে, হ্যাঁ হুজুর।

কি ?

আজ এগারো বচ্ছর সমানে মাথা-ধরা। রাতের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে, সারা রাত ঘুমুতে পারি না। এই এগারো বচ্ছর।

তোর এখন বয়েস কত ?

আটত্রিশ।

এত দিন ধরে ভুগছিস ? কেন, ওষুধ খেতে পারিস না ?

ওষুধ ! ওষুধ পাব কোথায় ? বিচ্ছিন্নীকৃত বড়ো বড়ো পাঁশুটে দাঁতে হরেন্দ্র হাসল।

বললুম, এই মাথা-ধরা নিয়ে কাজ করিস কী করে ?

নইলে যে পেট চলে না হুজুর। আগে শিরদাঁড়া, তবে তো পায়ের উপর দাঁড়াব।

কত পাস পাখা টেনে ?

ছ টাকা, আর আপনার এখানে দুই। চলে যায়।

চলে যায় ? বাড়িতে ছেলেপুলে নেই ?

হরেন্দ্র আবার হাসল, তেমনি সংক্ষেপে। বললে, বলে, ফুলই নেই তো ফল ধরবে !

কেন, পরিবার মারা গেছে বুঝি ?

পরিবার করি নি, হুজুর।

হরেন্দ্রের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম।

স্ত্রীজাতির প্রতি অমানুষিক এই বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণার কারণ কী ?

কথাটা হরেন্দ্র বুঝল না।

তাই সরাসরি জিগগেস করলুম : করিস নি কেন বিয়ে ?

পাব কোথায় ? কথার শেষে হরেন্দ্রর নিশ্বাস আমার কানে এল।

পাবি কোথায় মানে ? কেন, তোদের জাতের মধ্যে গাঁয়ে কি মেয়ে নেই ?

আছে বৈ কি, কম আছে।

তবে একটা কাউকে জুটিয়ে নে না। মাথা-ধরাটা ছাড়ুক।

হরেন্দ্র হাসল, যে-হাসি প্রায় হতাশার কাছাকাছি। বললে, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি যে।

যে কখনো বিয়ে করে নি, সে কখনো বুড়ো হয়? কেন, তোদের গাঁয়ে বড়ো মেয়ে নেই? সব সরদা-আইনে পার হয়ে গেছে?

আছে বৈ কি, এই তো সন্নেসি বাওয়ালির মেয়ে বেগুনি আছে। হরেন্দ্রর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল।

বয়েস কত?

বাইশের কম হবে না।

তবেই তো দিব্যি মানিয়ে যাবে। ওকেই বিয়ে কর না।

ওর বাপ ছ কুড়ি টাকা চায়।

টাকা, টাকা কিসের?

'পণ' হুজুর।

তোদের দেশে মেয়েরা বুঝি পণ নেয়। উলটো দেখছি। আসলে খতিয়ে দেখলুম সেইটেই ন্যায্য নিয়ম। বললুম, পণ জুটছে না বলে চামার বাপ মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে না? মেয়েটাকে শুকিয়ে মারছে? বেটাকে পুলিশে চালান দেওয়া উচিত।

আমার এই নিষ্ফল আক্রোশে হরেন্দ্র হাসল। বললে, এর জন্যে সন্নেসি-খুড়োকে দোষ দেয়া চলে না, হুজুর। ঐ আমাদের নিয়ম, নড়চড় হবার জো নেই। মেয়েরাই লক্ষ্মী, তাই মেয়েদেরই দাম।

বিরক্ত হয়ে বললুম, সন্নেসি তোর খুড়ো নাকি?

গ্রাম-পরচায় খুড়ো, কোনো কুটুম্বিতে নেই। একালি জমি, বাড়িও নজদিগ। মাঝখানে ছোট একটা জোলা। আমার বয়স যখন বাইশ আর বেগুনির বয়েস যখন ছয়, তখনই বাবা কথা পাড়েন, সন্নেসি-খুড়ো এক ডাকে পঁয়ত্রিশ টাকায় উঠে বসল। মহাজনের দেনা, মালিকের খাজনা, দু-দু বছর অজন্মা, জমিতে বাঁধবন্দি নেই, অত টাকা বাবা পাবে কোথায়? এ-বছর যায়, ও-বছরে জমি লাটে ওঠে, রেহেনদার এসে ডিক্রির টাকা আমানত করে দিয়ে দখল নেয়। অভাবের পর অভাবের তাড়না, টাকা কোথায়? হালের একটা গোরু কিনতে পারি না, তায়

বিয়ে! এদিকে দিন যত গড়িয়ে যায়, সন্নেসি খুড়োর ডাকও তত এক পরদা করে উঁচু হতে থাকে। উঠতে-উঠতে এখন তা ছ-কুড়িতে এসে ঠেকেছে। আমাদের দেশে মেয়ের যত বয়েস তত দাম!

ভূতের দেশ। বুড়ি মেয়েকে টাকা দিয়ে বিয়ে করবে কে?

আমার মতো বুড়োরাই। বুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োও তো গজাচ্ছে।

তবে এক কাজ কর। আট টাকা করে পাচ্ছিস, কিছু-কিছু জমাতে শুরু কর। বেগুনবালার বয়স যখন পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাকে ধরে ফেলতে পারবি।

আট টাকা! সব গিয়ে জমি এখন তিন বিঘেতে এসে ঠেকেছে। ফসল যা ওঠে তাতে সংসারই কুলোনো যায় না। আগে খাব না খাজনা দেব! বাবার বুড়ো ঘাড়ে লাঙল ফেলে দিয়ে আমি এখানে পাখা টানছি, যদি খাজনাটা, সেসটা, গোমস্তার তহুরিটার কিছু অংশও মেটাতে পারি। আমার আবার বিয়ে, আমার আবার ঘর! সেদিন সোজাসুজি বলেছিলুম না বেগুনিকে—হরেন্দ্র ঢোঁক গিলে কথাটা গিলে ফেললে।

কী বলেছিলি? কথাটা ধরিয়ে দিলুম: বিয়ে করতে বলেছিলি?

ঘেমে, দম নিয়ে হরেন্দ্র বললে, বলেছিলুম, কী হবে এমনি বসে থেকে, দিনে-দিনে দুজনেই বুড়িয়ে গিয়ে? টাকা তো আর তুই পাবি না, পাবে ঐ সন্নেসি-খুড়ো। মিছিমিছি সোয়ামির টাকা অপব্যয় করিয়ে লাভ কী? চল আমরা দুজনে চলে যাই।

মুহূর্তে অনেকটা ফাঁকা আকাশ ও অনেকটা ঢালু মাঠ যেন চোখের সামনে দেখতে পেলুম, বেগুনি কী বলল?

ও ঠাট্টা করে উঠল, চোখ টেরিয়ে মাজা বেঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল: কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে!

আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে-সঙ্গে হরেন্দ্রও হাসল। কিন্তু মানুষে এমন ভাবে কেঁদে উঠতে পারে এ কখনো শুনি নি।

যা যা, ঢের হয়েছে। বিয়ে করিস নি, বেঁচে গেছিস। বিয়ে করলেই

পাঁচ শো ঝঞ্ঝাট। ছেলে রে, পুলে রে, আজ এটা, কাল সেটা—একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ত। দিব্যি আছিস বিয়ে না করে, ভারও বোস না, ধারও ধারিস না। এই যে আমি এখনো বিয়ে করি নি, কী হয়েছে? আমার তাতে মাথা ধরে, না চোরের মতো পরের জানলা দিয়ে উঁকি মারি?

সে দিন রাত ভরে বারে-বারে আমারই কথাটা কানের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল: এই তো আমি এখনো বিয়ে করি নি, কী হয়েছে? সে কি কোনো অভাব, না শূন্যতা, না শ্রান্তি, কী হয়েছে? দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না জানি, কিন্তু দুধ টকে গেলে ঘোল হতে আর কতক্ষণ! তৃষ্ণার যখন শেষ নেই, তখন ডিকেণ্টার সাজিয়ে কী দরকার!

একদিন হরেন্দ্রকে জিগগেস করলুম: তোর বাড়ি কোথায়?

কোতলগঞ্জ। হিরণপুর ইস্টিশনে নেমে মাইল দুয়েক।

যাব তোদের গাঁ দেখতে।

হরেন্দ্র বিশ্বাস করতে চায় না।

সামনে এই রথের ছুটি আছে, সেই ছুটিতেই যাব। তুই আমাকে নিয়ে যাবি পথ দেখিয়ে।

রথের ছুটির দিন সত্যিই তাকে স্টেশনে যাবার জন্যে গাড়ি আনতে বললুম দেখে হরেন্দ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে, সত্যিই যাচ্ছেন নাকি, হুজুর?

হ্যাঁ দেখছিস না, সকাল-সকাল খেয়ে নিলুম।

হরেন্দ্র আমতা-আমতা করে বললে, আমাদের ওখানে দেখবার কী আছে?

তোর বেগুনি আছে। দেখি সন্নেসিকে বলে-কয়ে তোর সম্বন্ধটা ঠিক করতে পারি কিনা।

লজ্জায় ও আনন্দে হরেন্দ্রর সমস্ত মুখ ভরে গেল।

বললুম, কি, মাথা-ধরাটা একটু কম বোধ হচ্ছে?

হরেন্দ্র সস্নেহ চোখে বললে, আপনার ভারি কষ্ট হবে, হুজুর।

কিন্তু তোর কষ্ট যে দেখতে পারি না।

কষ্ট কেন, বেগুনিকে বিয়ে করতে পাবো না বলে? হরেন্দ্রের অভিমানে ঘা পড়ল।

না। একদম বিয়ে করতে পাচ্ছিস না বলে। নে, গাড়ি ডেকে নিয়ে আয়। বিকেলের ট্রেনেই ফিরে আসতে পারব।

দুপুর প্রায় দুটো, কোতলগঞ্জে সন্নেসি বাওয়ালির বাড়ি এসে পৌছুলুম। সন্নেসি মাঠে ছিল, হরেন্দ্র ডেকে নিয়ে এল। আমি যে কে সবিস্তারে হরেন্দ্র তার বিজ্ঞাপন দিতে নিশ্চয়ই কোনো ক্রটি করে নি, কিন্তু মনে হল সন্নেসি বিশেষ অভিভূত হল না। মনে হল প্যান্ট-কোট পরে না আসাটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

তবু আমি যে জমিদারের নায়েব-গোমস্তার উপরে এইটুকু সে অবিসম্বাদে বুঝতে পেরেছে। দাওয়ায় উইয়ে-খাওয়া একটা চৌকি ছিল; তাতে তেল-চিটচিটে ছেঁড়া একটা পাটি পেতে আমাকে সে বসতে দিল।

বললুম, তোমার একটি মেয়ে আছে?

সন্নেসি ঘাড় নাড়ল, ব্যাপারটা বুঝতে পারল না।

বিয়ের যুগ্যি?

বউ ছেড়ে শাশুড়ি হবার যুগ্যি। সন্নেসি নিশ্বাস ছাড়ল।

আমাকে একবারটি দেখাতে পার?

এ-প্রশ্ন আরো দুরূহ। সন্নেসি হরেন্দ্রের মুখের দিকে অবোধের মতো তাকিয়ে রইল।

নতুন কিছু নয়, হরেন্দ্রের সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করতে চাই। কি, আপত্তি আছে?

একটুও না। সন্নেসি উৎফুল্ল হয়ে বললে, টাকা পেলেই আমি ছেড়ে দিতে পারি। হরেন্দ্র ছাড়া ও-মেয়ের যুগ্যি পাত্রও সমাজে আর দেখতে পাচ্ছি না।

খুব ভালো কথা। আমি যখন হরেন্দ্রর মুনিব, তখন আমিই ওর বরকর্তা। কি বল, ঠিক কিনা?

ঠিক। সন্নেসী মাথা নাড়ল।

তবে বরকর্তাকে একবার মেয়ে দেখাতে হয়। মেয়ে না দেখলে সে বুঝবে কি করে কত তার দাম হতে পারে।

দাম হুজুর, হাজার টাকা, এক আধলাও কম নয়। এ আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলপ করে বলে আসতে পারি। তবে হরেন্দর গরিব-গুর্বো লোক, রয়ে-সয়ে মোটে ছ-কুড়ি টাকায় রফা করেছি।

সে কথা পরে দেখব। বললুম, মেয়ে তোমার বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখতে হবে নাকি?

কেন, ডাকলেই চলে আসবে এখানে। বলেই সন্নেসি ডাকল: বেগনি! তার পর হাসিমুখে বললে, বাজার-হাট, গোরু-চরানো, মাঠে আমাকে পান্তা দিয়ে আসা, আমার তামাক খাবার ফাঁকে লাঙল-ধরা, সবই তো আমার বেগুনি করে। সংসারে ওর মা নেই, ভাই-বোন নেই, কেউ নেই; আমার ওই সব। বলে আবার ডাকল: বেগনি!

গৌরবে তাকে দরজা বলছি, একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

কী করছিলি এতক্ষণ? সন্নেসি বললে।

হাসতে হাসতে বেগুনি বললে, ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিলাম।

এতদিন মেয়েদেরকে শুধু পোশাকের সংজ্ঞায় দেখে এসেছি, কিন্তু সেই আমার প্রথম দেখা, পোশাকের অতিরিক্ত করে দেখা। কেনন মেয়েটার গায়ে সামান্য একটা সেমিজ পর্যন্ত নেই, মোটা লাল-পাড় কোরা একটা শাড়ি (সন্দেহ হচ্ছিল ইতিমধ্যে সে বেশ-পরিবর্তন করে এসেছে কি না) দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে সমান কুণ্ঠিত, মুখের কাছে আঁচলটা রাশীভূত করে হাসি লুকোতে গিয়ে এখানে-ওখানে কিছু-কিছু সে বঞ্চিত করে এসেছে—কিন্তু মনে হল, দুপুরের রোদে গাছের ছায়াতে এসে যেন বসলুম। ভাবলুম রূপ কী, রূপ কোথায়? দেখতে নির্মল কালো, মুখশ্রী নিখুঁত সরল, বেশভূষার ঐ তো চেহারা, কিন্তু মনে হল, এত সজীবতা, এমন স্বাস্থ্য কোথাও আগে দেখি নি। যেন ও মাটি থেকে উঠে-আসা সতেজ লতা, তাতে রোদ পড়েছে, জ্যোৎস্না

পড়েছে, শিশির পড়েছে, শক্ত তাজা সবুজ—তবু সে একটা লতা, সেতারের তার বা পেটিকোটের দড়ি নয়। ভাবলুম এতদিন ক্রেপ-করা দাঁত, ক্রুসেন সলট্ আর ট্যাঙ্গিকেই সৌন্দর্য বলে এসেছি, কারণ এতদিন বেগুনিকে দেখি নি!

বললুম, কি, হরেন্দ্রকে পছন্দ হয়?

বেগুনি হাসছে, কেবল হাসছে, ঝলকে-ঝলকে হাসছে।

বললুম, টাকা চাই নাকি?

বেগুনির ততোধিক হাসি, থরে-থরে পরতে-পরতে হাসি। আর সে-হাসির জলে উঠেছে লজ্জার তরঙ্গ। সেখানে সে আর দাঁড়াতে পারল না।

সন্নেসিকে বললুম, কত নেবে ঠিক বলে দাও।

আগেই তো বলেছি, ছ-কুড়ির এক আধলাও কম হবে না।

কী বলো যা-তা! টাকা দিয়ে তোমার কী হবে?

ওকে ছেড়ে দিয়েই বা আমার কী হবে? এমন মেয়ে আমি বিনি-পয়সায় বিদেয় করব নাকি? কেউ করে কখনো? সন্নেসি চোখ পাকিয়ে উঠল।

তা করে না। কিন্তু হরেন্দ্র ছাড়া আর পাত্র কোথায়?

আর ও ছাড়াই বা আমার মেয়ে কোথায়?

কোন দিক দিয়ে যে অগ্রসর হব বুঝতে পাচ্ছিলুম না। বললুম, কিন্তু বিয়ে না দিয়ে মেয়ে কি তুমি চিরকাল আইবুড়ো রাখবে নাকি? ওরো তো সাধ-আহ্লাদ আছে।

ওর চেয়ে যার সাধ-আহ্লাদ বেশি দেখা যাচ্ছে, ছ-কুড়ি টাকা সে ফেলে দিক না। তা হলেই তো চুকে যায়।

হরেন্দ্র তা পাবে কোথায়? কর্জে খাজনায় তলিয়ে আছে।

আর আমি সুখের সাগরে সাঁতার কাটছি, না? টাকা কটা পেলে মহাজনের নাকের উপর তা ছুঁড়ে দিয়ে জমিটা আমার ছাড়িয়ে আনতে পারি।

কিন্তু টাকা কদিনের?

বলে, একদিনের জন্যেও পেলুম না, কদিনের! সন্নেসি ভেঙচিয়ে উঠল।

এ-ও ভেবে দেখ, হরেন্দ্রর মতো পাত্র আর দুটি নেই। আজ ও পাখা টানছে, কাল ও আর্দালি হবে, কদিন পরেই আদালতের পেয়াদা। ভেবে দেখ, আদালতের পেয়াদা তোমার জামাই হবে।

তাই বলে বিনা-পণে মেয়ে দেব? সন্নেসী রুখে উঠল: সমাজে আমার একটা সম্মান নেই? লোকে বলবে কী আমাকে? নেমন্তন্ন খেতে ডাকবে না যে। ছি ছি ছি, সমস্ত সংসারে যা কেউ করল না, দাম না নিয়ে মেয়ে ছাড়ব? হরেন্দর না হয়, মহেন্দর আছে, ও-পাড়ার রাইচরণ আছে, দুর্লভ আছে, দ্বারিক আছে—

সব, সব ওরা বয়েসে ছোট, হুজুর। হরেন্দ্র একটা গুহার মধ্যে থেকে আচমকা শব্দ করে উঠল।

তাতে বাধা কী! পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়ো যদি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, তার উলটোটাই বা চলবে না কেন? কী করা যাবে, যদি বয়েস মেপে পাত্র না পাওয়া যায়! ছোট ছেলে বড়ো মেয়ে বিয়ে করেছে, আমাদের অঞ্চলে তা একেবারে অচল নয়। টাকা যার শাঁখা তার।

কিন্তু ছোটরা তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

রাজি না হয়, বিয়ে হবে না। তাই বলে জাত-জন্ম খুইয়ে বিনা-পণে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সমাজের বার হয়ে যেতে পারি না তো।

সবই বুঝলুম, সন্নেসি—কিন্তু বাপ হয়ে মেয়ের কষ্টটা তুমি বুঝলে না সেইটেই বড়ো দুঃখ থেকে গেল।

সন্নেসি পালটা জবাব দিল। বললে, আপনিও বা আপনার চাপরাশির কষ্ট বুঝে ট্যাঁক থেকে টাকা কটা ফেলে দিন না।

এমনি একটা কথায় এসে শেষ হবে আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিলুম। ট্যাঁকে হঠাৎ টান পড়তেই মনে হল এ আমি কী ছেলেমানুষি করছি! কোথাকার কে হরেন্দ্র, তার মাথা ধরেছে বলে আমার মাথা-ব্যথা! এক দিনের জন্যে নয়, সমস্ত জীবনের জন্যে

একটা মেয়ের দাম একশো কুড়ি টাকা! হরেন্দ্রর মাঝে যে প্রসুপ্ত পুরুষত্ব আছে সেই একদিন আমাকে নির্লজ্জ কণ্ঠে অভিশাপ দেবে, তাকে জয়ী না করে ভিক্ষুক করেছি।

উঠে পড়ে বললুম, বাড়ি চল, হরেন্দ্র। গাড়ির সময় হল।

মাঠটা দুজনে নিঃশব্দে পার হয়ে এলুম। হঠাৎ হরেন্দ্র লজ্জিত সৌজন্যে বললে, কোনো বাপই রাজি হয় না হুজুর, যে দেশে যেমন প্রথা। নড়চড় হবার জো নেই।

উত্তর দিলুম না।

বলা যায় না, হরেন্দ্র আবার বলে, হয়তো ঐ মহেন্দ্র কি দ্বারিকই শেষকালে বিয়ে করবে। কিন্তু তাও ঠিক, ওদেরই বা অত পয়সা কোথায়? বলা যায় না কর্জই করে বসবে হয়তো।

করুক গে। ধমকে উঠলুম : ঐ তো রূপের ডালি মেয়ে, তার জন্যে দশ-বিশ নয়, একশো কুড়ি টাকা! একশো কুড়ি টাকায় গ্রিন-ল্যাণ্ডের রানী পাওয়া যায়।

সেটা কি জিনিস—হরেন্দ্র ভেবড়ে গেল।

তারপর অনেক দিন হরেন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখি নি। কিন্তু একদিন রাতে চাকরের ঘর থেকে একটা কান্নার আওয়াজ শুনলুম, ঠিক কুকুরের কান্না। মনে হল যে-কুকুরটা রোজ রাতে খেতে আসে তাকে ঘরের মধ্যে এঁটে বন্ধ করে রেখে ঠাকুর হাওয়া খেতে বেরিয়েছে! কিন্তু কোথাও একটা বন্ধনের চেতনা মনের মধ্যে জেগে বসে থাকলে সারা রাত আমার চোখে ঘুম আসবে না।

উঠোনটুকু পেরিয়ে গিয়ে দরজায় ঠেলা দিলুম। দেখি কপালের উপর দিয়ে শক্ত করে একটা দড়ি বেঁধে হরেন্দ্র দুই হাতে দেয়াল ধরে বসে তাতে মাথা ঠুকছে আর পশুর ভাষায় নির্বোধ আর্তনাদ করছে। মুহূর্তে সমস্তটা শরীর জমে পাথর হয়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে?

হরেন্দ্র মুখ তুলে তাকাল না, বললে, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, ঘুমুতে পাচ্ছি না।

মনে হল ও একটা পরিপূর্ণ অবসাদ চায়, একটা অতলান্ত শান্তি, নিঃস্বপ্ন ঘুম—যে-ঘুমে মৃত্যুর আস্বাদ।

বললুম, আমার ঘরে আয়।

হরেন্দ্র ঘরে এল।

এই পাঁচটা টাকা দিচ্ছি, যা, কোথাও একটু ঘুরে আয়।

হরেন্দ্র ভাবল, আমি বুঝি ওকে বিদায় করে দিলুম।

বললুম, মদ খাস? খেয়েছিস কখনো?

হরেন্দ্র জিভ কেটে কান মলে মুখ-চোখের একটা বিবর্ণ চেহারা করল।

কী হল, না খেয়েই ওক্ করছিস যে? খেলে ঠাণ্ডা হয়ে বিভোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারতিস।

কী সর্বনাশ! মাথা ছেড়ে হরেন্দ্র যেন একেবারে তার বুকের মধ্যে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করলে। বললে, মরে গেলেও ও-জিনিস মুখে তুলতে পারব না, হুজুর। নইলে তো কলেই চাকরি নিতে পারতুম, অনেক মাইনে, অনেক উপরি। কিন্তু সেখানে শুনেছি সবাই ও-জিনিস খায়, সেখানে নাকি কারুরই চরিত্তির ভালো থাকে না।

সাধে আর তোদের চাষা বলে! যা, দেয়ালে মাথা ঠোক গে যা।

হেসে ফেললুম। এবং সে-হাসিতে হরেন্দ্র যেন অনেকখানি অভয় পেল। বললে, আর যাই হোক, হুজুর, চরিত্তির খোয়াতে পারব না।

বললুম, তবে এক কাজ কর, একটা চাঁদার খাতা খুলে ফ্যাল। যেচে-মেগে ছ-কুড়ি টাকা তুলতে চেষ্টা কর ঘুরে ঘুরে। যদ্দিনে পারিস। নে, এই পাঁচ টাকাই আজই তোকে দিতে যাচ্ছিলুম। আমারই এই প্রথম চাঁদা—নে, তুলে রাখ বাক্সোয়।

হরেন্দ্র হাত পেতে টাকা নিল, নোটটা কপালে ঠেকাল ও মুহূর্তে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

তারপর দেখতে দেখতে এসে গেল পূজার ছুটি—পাথার সিজন্ চলে গেল বলে হরেন্দ্র বিদায় নিল।

জিগগেস করলুম : কত জুটল এত দিনে ?

বারো টাকা সাড়ে তিন আনা।

ভ্যাথ বারো বছরে যদি সাধনায় সিদ্ধি মেলে।

এর পর প্রায় ছ মাস হরেন্দ্রের কোনো খবর রাখি নি। কিন্তু ফিরতি মার্চ মাস এসে পড়তেই দেখলুম পাখার উমেদার হয়ে সে উপস্থিত।

যা ছিল তারো আধখানা হয়ে গেছে। চোখ মেলে যেমন তাকানো যায় না, চোখ বুজলেও তেমনি ভয় করে।

পাশে ছাতাটা নামিয়ে রেখে হরেন্দ্র গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করল।

বললুম, কেমন আছিস ?

ভালো নয় হুজুর।

চাঁদার খাতায় কত হল এতদিনে ?

একুশ টাকাটাক হয়েছিল—যেমন জোরালো করে আপনি লিখে দিয়েছিলেন।

হয়েছিল মানে ? টাকাটা কোথায় ?

আর টাকা! মেঝের উপর দুই হাত চেপে রেখে হরেন্দ্র হাঁপ নিল। বললে, বসন্ত হয়ে গোরু একটা মরে গেল, দেখলুম লাঙল চলে না, সেই টাকা দিয়ে বাবাকে গোরু কিনে দিয়েছি।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলুম। বললুম, তবে আর পাখা কেন ? বাপে-পোয়ে মিলে লাঙল ঠেল গে যাও। এবার আমি অন্য লোক নেব—তোমার এখানে পোষাবে না।

কিন্তু সেই দিনই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যাতে হরেন্দ্রকে রাখতে হল।

পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কে একজন এখানে স্বামীজী এসেছেন চাঁদা সংগ্রহ করতে। কি-একটা অবলা-আশ্রম না মাতৃমন্দির জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে।

স্বামীজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক রকম কথা হল। তাঁদের

প্রধান কাজ ও সমস্যা হচ্ছে অভাগিনীদের সমাজে ফের স্থান দেয়া, গৃহ দেয়া, গৃহস্থজীবনের নির্মল পরিবেশ তৈরি করে দেয়া। যার স্বামী ছিল তাকে ফের স্বামীর ঘরে আসন দেয়া, যার ছিল না তাকে দেশের সেবার উপযুক্ত করে তোলা, আর যে কুমারী তাকে সুরক্ষিত পত্নীত্বে নিয়ে যাওয়া।

বললুম, আমাকে একটি পাত্রী দিতে পারেন ?

কার জন্যে ?

আমার পাম্খাপুলারটার জন্যে। বলে হরেন্দ্রের অশ্রুরক্তহীন প্রস্তরীভূত জীবনের কাহিনী বললুম, শেষ পর্যন্ত তার একুশ টাকার চাঁদায় হালের গোরু কেনা অবধি।

এই হিন্দুসমাজ। স্বামীজী বক্তৃতায় বিস্ফারিত হয়ে উঠলেন।

বললুম, নিচু জাতের মেয়ে-টেয়ে আছে ?

তারাই তো বেশি।

তবে দিন একটি যোগাড় করে। আমার হরেন্দ্র খুব ভালো ছেলে। আর যাই হোক, তার চরিত্র সম্বন্ধে ফার্স্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট দিতে পারি।

স্বামীজী হাসলেন। বললেন, খাওয়াতে পারবে তো ?

সেটা আপনার শহরের শিক্ষিত ছেলেদের সমস্যা। হরেন্দ্রের মতো যারা গরিব, তারা স্ত্রীদের খাওয়াবার চিন্তায় ভয় পায় না। সম্পদে-দারিদ্র্যে তাদের সমান সাহস। দিন একটি যোগাড় করে। রানীর মতো সুখে থাকবে।

তবে আমার সঙ্গে চলুন। পছন্দ করে আসবেন।

হাসলুম : এর আবার পছন্দ !

তবু চলুন, কাল রোববার, দেখে আসবেন আমাদের আশ্রম।

হরেন্দ্রকে কিছু বললুম না। শুধু বললুম, পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিস, দুটো দিন এখানে জিরিয়ে নে।

পরদিন স্বামীজীর সঙ্গে রওনা হলুম।

আশ্রম বলতে ভাঙা একটা দোতলা বাড়ি, নিচে আপিস বলতে একটা আলমারি আর গোটা দুই টেবিল-চেয়ার। প্রতিষ্ঠান সবে শুরু

হয়েছে, কিন্তু এরি মধ্যে বাসিন্দা হয়েছে বিস্তর। উপরে গোলমাল, চেঁচামেচি, খানিকটা বা ঝগড়া-ঝাঁটির মতো শুনতে পেলুম।

স্বামীজী উপরে একটা ফাঁকা ঘরে আমাকে নিয়ে এলেন। পর-পর তিনটি মেয়ে এনে হাজির করলেন। বললেন, এরা কেউ বিবাহিতা নয়।

জাত-গোত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার আর দরকার ছিল না, কেননা, বেগুনিকে আমি চিনতে পেরেছি। আমাকে মনে করে রাখবার ওর কথা নয়, কিন্তু দেখলুম, কোথায় তার সেই রূপালি হাসি, কোথায় তার সেই সবুজ স্বাস্থ্য। যেন এক কটাহ কালিতে তাকে আধ-সেদ্ধ করে কে তুলে এনেছে।

ওর ইতিহাস জানতে চাইলুম। স্বামীজী খাতাপত্র বের করে এনে ওর কাহিনী বললেন। সেই মোটা মামুলি কাহিনী, খবরের কাগজ খুললেই যা চোখে পড়ে।

কন্‌ভিক্‌শান হয়েছে?

কয়েকজনের। ছাড়াও পেয়েছে কয়েকজন।

আর কোথাও আশ্রয় মিলল না মেয়েটার?

না। বাপ ছিল, কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি হল না।

ভালো কথা। একেই তবে নির্বাচন করলুম। কিন্তু ওর মত আছে তো বিয়েতে?

এক্ষুনি। স্বামীজী হাসলেন: বিয়েতে আবার কোন মেয়ের মত নেই? পরে স্নিগ্ধস্বরে অদূরবর্তিনী বেগুনিকে সম্বোধন করলেন: কি মা, বিয়েতে মত আছে তো? স্বামী গরিব হোক, কুৎসিত হোক, তার সঙ্গে ঘর করে তাকে সেবা করে তার সঙ্গে সুখ-দুঃখ সয়ে নিজে তুমি সুখী হতে পারবে না?

অশ্রু-ভরভর চোখে বেগুনি ম্লানমধুর গলায় বললে, পারব।

রাত্রেই ফিরে এলুম। ডাকলুম হরেন্দ্রকে।

হাসিমুখে বললুম, কি বেগুনিকে বিয়ে করবি?

হরেন্দ্র নিরবয়ব শূন্যের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললে, কাকে?

বেগুনিকে।

বেগুনিকে? হরেন্দ্র ভীত একটা আর্তনাদ করে উঠল : সে কোথায়? তাকে পাওয়া গেছে?

যেন কিছুই জানি না এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম, কেন, কোথায় যাবে সে?

তাকে হুজুর ধরে নিয়ে গেছল। কত থানা-পুলিশ, কত দাদ-ফরিয়াদ। তারপর বাপ যখন তাকে কিছুতেই ফিরিয়ে নিল না, শুনলুম বিবাগী হয়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না।

ভালোই তো হয়েছে বাপ তাকে নেয় নি। তাই আজ তুই ইচ্ছে করলেই তাকে বিনা-পণে বিয়ে করতে পারিস।

কোথায় সে? হরেন্দ্রের দুই চক্ষু যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

যেখানেই থাক, নিরাপদে আছে। কিন্তু আমার কথার জবাব দে। তাকে তুই বিয়ে করতে রাজি আছিস?

এক্ষুনি।

তার এই অবস্থায়ও?

তার এই অবস্থা কে করেছে, হুজুর?

কে?

তার বাপ, যে ছ-কুড়ি টাকার এক আধলা কমেও মেয়ে ছাড়বে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল; আমি, যে পুরুষ হয়ে জন্মেও এ ক বছরে সামান্য ও-কটা টাকা জোগাড় করতে পারি নি।

বিয়ে যে করবি খাওয়াবি কী?

শাক-ভাত, নুন-আলুনি, ভগবান যা দেবেন।

থাকবি কোথায়?

কেন, গাঁয়ে আমার ঘর নেই, জমি-জমা নেই, হাল-গোরু নেই?

হরেন্দ্রকে মুহূর্তে আজ প্রকাণ্ড বড়োলোক মনে হল।

বললুম, যা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে এখন!

ঘুম! ঘুম কি আমার কোনোদিন আসে? হরেন্দ্র চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল : কিন্তু হুজুর, সে বেশ ভালো আছে তো?

বই একটা টেনে নিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক দেখাবার চেষ্টায় নির্লিপ্তের মতো বললুম, আছে।

হরেন্দ্র আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে সরে গেল। আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করবে কিনা এই যেন সে ভাবছে।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, হরেন্দ্র বাড়ি নেই। ঠাকুর বললে, শিগগিরই নাকি তার বিয়ে, তাই বাড়ি চলে গেছে তোড়জোড় করতে। ট্রেন-ভাড়ার পয়সা নেই, সময়ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তাই রাত থাকতে উঠে পায়ে হেঁটেই সে চলে গেছে। আশ্চর্য, ছাতাটা কিন্তু নেয় নি, ও যে শিগগিরই ফের ফিরে আসবে রেখে গেছে তার নিদর্শন।

কিন্তু সেই যে গেল হরেন্দ্রের আর দেখা নেই।

মাসখানেক পরে এক সন্ধেবেলা বাবার টেলি এসেছে—আসছে একুশে এপ্রিল আমার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে, যেন এখুনি আমি ছুটির জন্যে দরখাস্ত করি—ঘুরে ফিরে বারে-বারে সেই টেলিটাই পড়ছি, এমন সময় হরেন্দ্র এসে হাজির।

একটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে আকুল কেঁদে উঠল।

কী, কী হল আবার ?

কাউকে রাজি করাতে পারলুম না, হুজুর।

কিসের রাজি ?

আমার বিয়ের। বাবা, ভাইরা, সবাই এর বিরুদ্ধে, পাড়া-প্রতিবাসী জ্ঞাতি-কুটুম, স্বজাতি-বিজাতি সবাই। জমিদারের লোক পর্যন্ত খাপ্পা—বলে, ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে দেব। সন্নেসি-খুড়ো শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—বেগনি যদি ফের গাঁয়ে ঢোকে, কেটে কুচি-কুচি করে শেয়ালের মুখে ধরে দিয়ে আসব। পারলুম না, কিছুতেই রাজি করাতে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্বেলিত কান্না।

চুপ করে শুনলুম। আর ভাবলুম।

তার এই অবস্থাতে তার হাতে পাখাটা আবার ছেড়ে দিই—সবাই পিড়াপিড়ি করল। কিন্তু যে যাই বলুক, আমি ওকে কিছুতেই কাজ দিলুম না এবং বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র চলে যেতে বললুম। তার আর কোনোই কারণ নেই, সম্প্রতি আমি বিয়ে করে স্ত্রী ঘরে আনছি, এ-সময়টায় আমারই চারপাশে একটা বুভুক্ষু উপবাসী মানুষের নিরুপায় যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

সাক্ষী

কী বলতে হবে ঠাকুর? বলো দিকি বুঝিয়ে, ভাল করে ঝালিয়ে নি। ট্রেনে ওঠবার আগে দুর্লভ আরেকবার ভটচাযকে জিগগেস করলে।

ভটচায ভারি বিরক্ত হল। আজ প্রায় সাত-আট দিন তাকে সে সমানে বোঝাচ্ছে, কিন্তু এখনো কথাটা তার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু বিরক্তির ভাব সম্পূর্ণ গোপন রেখে বললে, বলবি, একালি জমি, আজ বিশ-তিরিশ বছর ধরে দেখে আসছি ষষ্ঠী ভটচায বর্গায় দখল করছে।

চাষ করে কে জিগগেস করলে কী বলব?

কোনো দিকে না তাকিয়ে ভটচায বললে, সোনাউল্লা।

এই কথা? এ আমার খুব মনে থাকবে। দুর্লভ নির্ভাবনায় ঘাড় হেলাল। বললে, দু-পয়সার পান কিনে দাও, ঠাকুর।

ভটচায পান কিনে দিল। এক মুখ পান চিবোতে-চিবোতে দুর্লভ ট্রেনে উঠল, এমন নির্লিপ্ত, যেন কত সে ট্রেনে উঠেছে।

রাত্রের ট্রেন, ব্রাঞ্চ-লাইন। সকালের দিকে এ-অঞ্চলে আগে একটা ট্রেন ছিল। বছর তিনেক উঠে গেছে। তাই আদালতের প্যাসেঞ্জার এ-ট্রেনেই শহরে যায়, কেউ হোটেলে, কেউ বাজারে, কেউ বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত্রিযাপন করে পরদিন সাড়ে দশটায় গিয়ে হাজিরা ফাইল করে।

বেজায় ভিড় থাকে ট্রেনে, আজকের শেষ ও কালকের প্রথম ট্রেন। সেদিনও ছিল।

গাড়িতে উঠেই দুর্লভ বিরক্ত হয়ে বললে, এ কী একটা জঘন্য গাড়িতে নিয়ে এলে ঠাকুর? গদি নেই যে।

ভটচায বললে, দাঁড়া, আমার কম্বলটা ভাঁজ করে পেতে দিচ্ছি।

তা তো দেবে, কিন্তু জায়গা কোথায়?

এই, তুই ওঠ তো পবন। ভটচায একজনের কাঁধে একটা টোকা মারল: আর, এই নটবর, ওরে সখীচরণ, ওগো বেয়াই মশাই, তোমরা একটু সরে বস, দুর্লভকে বসতে দাও।

পবন উঠে দাঁড়াতেই দুর্লভের কম্বলাস্তৃত জায়গা হল।

কিন্তু তবু তার অস্বস্তি ঘুচল না। বললে, নাঃ, এ ভাবে বসলে জামাটা একেবারে দলামোচা হয়ে যাবে। দাও, ধোঁয়া বার করো, ঠাকুর।

ভটচায পকেট থেকে সাদা সুতোর বিড়ি বার করলে।

কী গুচ্ছের বিড়ি বার করছ? সাক্ষী দিতে যাচ্ছি, একটা সিগারেট খাওয়াও।

ভটচায অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বললে, এখন একটা বিড়িই ধরা, নাগরদ ইস্টিশানে সিগারেট কিনে দেব।

দুর্লভ মুখ ভার করে বললে, দখলের বয়েস তবে তোমার তিন চার বছরে নেমে যাবে, ঠাকুর, বিশ-তিরিশ আমি বলতে পারব না। একটা সিগারেট খাওয়াতে পার না, বর্গা লাগিয়ে দখল কর না-বলে নিজেই হাল চালাও বল না কেন?

আছে নাকি হে সখীচরণ? ভটচায সহযাত্রীদের দিকে ভিক্ষুকের চোখে তাকাতে লাগল।

আছে। নটবর বললে। নটবর যদিও মাসতুত শালা এবং যদিও বয়স্ক ভগ্নীপতির সামনে ধূমপান তার নিষিদ্ধ, তবু এ-যাত্রায় চক্ষু-লজ্জা করলে চলে না। কেননা, দুর্লভই একমাত্র অনাত্মীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সাক্ষী, তাকে চটানো মানেই মামলাটি চটিয়ে দেয়া। আর সব সাক্ষীকে এতটুকু খোঁচা দিলেই রক্ত না হোক রক্তের সম্পর্ক পড়বে বেরিয়ে।

চৌহদ্দিটা শিখিয়ে দিলে হত না? পবন প্রস্তাব করলে।

পুবে ভেটকিমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মণ্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে ছাবেদ আলি—দলের মধ্যে থেকে বুড়ো পতিপ্রসন্ন, মানে গাঁ সম্পর্কে ভটচাযের বেয়াই, বিড়বিড় করে আউড়ে দিলে। এর দাদার নাম ছিল সতীপ্রসন্ন, মিলিয়ে নাম রাখতে গিয়ে এ হয়েছে পতিপ্রসন্ন।

ভেটকিমারি না বোয়ালমারি ও-সব আমি বলতে পারব না, ভটচায। দুর্লভ সিগারেটে লম্বা টান দিলে। বললে, পাশের জমি ঠাকুরদার দখল ছিল বলে দলিলে লেখা আছে বলছ, সেই জোরে সাক্ষী দিতে যাচ্ছি। নইলে কাংলামাড়ি কি চিংড়িমাড়ি—ও-সবের আমি ধার ধারি না।

দরকার নেই। ভটচায সায় দিল, একালি জমি, তাই বললেই যথেষ্ট। আর বিশ-তিরিশ বছর ধরে ষষ্ঠী ভটচায দখল করছে বর্গায়। বর্গাদার কে মনে আছে তো?

সে যেই হক, শহরে গিয়ে টকি দেখাতে হবে, ভটচায। দুর্লভ চোখ বড় করে বললে।

কিন্তু বল আগে, বর্গা করত কে?

দাঁড়াও, ভেবে নি, সিগারেটে জলন্ত টান দিয়ে দুর্লভ চোখ বুজল।

কাটল কতক্ষণ।

কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ভটচায তাঁর হাঁটুতে ঠেলা মারল।

ও, হ্যাঁ—দুর্লভ উঠল হকচকিয়ে: ছোট একটা টেপা-বাতি চাই। জামার পকেটে যাতে লুকিয়ে নেওয়া চলে। মুখ-চোখ একেবারে তার ঝলসে দেব না?

ভটচায তিরিক্ষি হয়ে উঠল: দুত্তোর তোর টেপা-বাতি। বর্গাদারের নাম কী

বেফাঁস নাম বলার চেয়ে স্রেফ বলে দেব স্মরণ নেই। তাই না

পতি-ঠাকুর? দুর্লভ পতিপ্রসন্নের দিকে ঝুঁকে এল: তুমি বল নি জেরায় ঠেকে গেলেই বলতে হবে স্মরণ নেই? তবে আর ভাবনা কিসের! বর্গাদার কে মনে না থাকে, পষ্ট বলে দেব, স্মরণ নেই, ধর্মাবতার। হাঁ-ও নয় না-ও নয়, মারে কে শুনি?

না। ভটচায ধমকে উঠল: শুনে রাখ। সোনাউল্লো। সোনাউল্লো বর্গা করে।

সোনাউল্লোও যা, রুপাউল্লোও তাই। আসে নি তো কেউ।

সে জন্যে তোর ভাবতে হবে না। মুহুরিবাবু তাকে ধরে নিয়ে আসবে বলেছে। আসুক আর না-আসুক, নামটা তুই তার ভুলিস নে।

আমি কি তেমনি ছেলে? কিন্তু, যাই বল, টেপা-বাতি চাই একটা। ঠিক গোল হয়ে আলো পড়বে। সমস্তখানা গোল মুখের উপর। সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দুর্লভ শিথিল গলায় বললে, একটু সরু হও পবনচন্দ্র, পা দুটো একটু টান করি।

জায়গা ছেড়ে পবন উঠে দাঁড়াল।

পুঁটলিটা তোর এগিয়ে নিয়ে আয়, নটবর, আমার মাথার নিচে শান্তিতে থাকবে।

ভটচাযের ইসারায় নটবরও উঠে দাঁড়াল, এবং তার জায়গাটা অধিকার করল তার পুঁটলিটা। দুর্লভ স্বচ্ছন্দে তাকে শিরোধার্য করলে।

বাঘ তাড়াবার জন্যে লাইন পেতেছিল বলে নিদারুণ শব্দ হয় এখানকার ট্রেনের চাকায়। কিন্তু দেখা গেল বনের বাঘ তাড়া পেয়ে বাসা নিয়েছে এসে দুর্লভের বিস্ফারিত ও রোমশ নাসারন্ধ্রে।

দু-বেঞ্চির ফাঁকে মেঝের উপর হাঁটু গুটিয়ে নটবর আর পবন বসে, আর দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভটচায।

হোটেলে বেজায় ভিড়, খাওয়া যদি বা মেলে শোয়াই দুষ্কর।

ভটচায নটবরকে বললে, খেয়ে দেয়ে তোরা ইস্টিশানে চলে যা ঘুমুতে। দুর্লভকে নিয়ে আমি এখানে থাকব।

জায়গা কোথায় এখানে ? নটবর আপত্তি করলে।

হোটেলওয়ালা একখানা বেঞ্চি দেবে বলেছে—ছ-পয়সা ভাড়া। ভাবছি দুর্লভকে ওটাতে শুতে দিয়ে আমি নিচে মাটিতে শুয়ে থাকব। গ্রীষ্মকাল, কষ্ট হবে না।

পবন গরম হয়ে উঠল, বললে, দুর্লভ তো নাপিত, ও শোবে বেঞ্চিতে, আর তুমি বামুন হয়ে শোবে মাটিতে ? এ কি অনাচারের কথা !

ভটচায চোখ টিপে বললে, যা আর বকাস নে। দুর্লভই আমাদের ভরসা। ওকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এক রাতের তো মামলা—তাতে কি যায় আসে ! মোকদ্দমাটা তো আগে পাই !

ভিড়টা বেশির ভাগই দেওয়ানি : বোঁচকাতে নথি, কাছায় টাকা আর ললাটে দুর্ভাগ্য। আর কতকগুলি ফড়ে আর দালাল, এর থেকে ওকে কাড়ে, ওকে ভাগিয়ে একে বাগায়।

যা যা, সেদিনের ছোকরা নবকেষ্ট, আইনের ও জানে কি !

আর যত জানে তোমার ঐ বুড়ো-হাবড়া বিপিন হালদার! দু-কথা ইংরিজি বলতে গিয়ে যে ইয়ে-ইয়ে করে কেঁদে ফেলে !

আরে দাদা, উকিল-টুকিলে কিছুই নেই ! ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল : সব এই অদেষ্ট। তুমি বললে এ, সে বললে ও, আর তার বাবা বললে, কিচ্ছু না।

কিচ্ছু না। আরেকজন সায় দিলে : শুধু বাজি খেলা। যেমন আতসবাজি, তেমনি মামলাবাজি। উকিল-হাকিমে করবে কী ?

দুর্লভ এরি মধ্যে চেনা অচেনা অনেকের সঙ্গেই জমিয়ে নিয়েছে।

কত দিয়ে কিনলে এই চাদরখানা ?

হ্যাঁ, সাক্ষী দিতে এসেছি, তায় গাঁটের পয়সা খরচ করে চাদর কিনব !

তবে দিলে কে ? দুর্লভ হাতে করে জমিটা পরখ করতে লাগল।

পার্টি কিনে দিয়েছে।

সে আবার কে ?

যার মামলা, সে। শহরে এসে ভদ্দর-সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দেব, কাঁধে একখানা গামছা ফেলে তো আর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। তাই নায়েবমশাইকে বললাম, গায়ের একখানা কাপড় চাই, বহু মারামারি করে তের আনা দিয়ে এখানা উদ্ধার করেছি।

তুর্লভ সটান ভটচাযের সামনে এসে হাত পাতলে।

না, ছাড়াছাড়ি নেই, গায়ের চাদর দিতে হবে, ঠাকুর।

মামলাটা আগে জিতি, চাদর কেন, তোকে শালদোরোখা দেব দেখিস।

কাজ হাসিল করবার আগে সব শালাই তা বলে থাকে। কাজের পর তখন অষ্টরম্ভা। না, চাদর না দাও, ছিটের অন্তত একটা হাফ-শার্ট দিতে হবে।

তার চেয়ে চুল ছাঁটবার জন্যে একখানা কাঁচি চেয়ে নে না' পতিপ্রসন্নর সহ্য হল না, মুখ বেঁকিয়ে বললে, সাক্ষী দিতে হবে বলে শালা একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছে।

নাপিত বলে হেনস্তা কোরো না, পতিঠাকুর, তুর্লভ চোখ পাকাল: খুরে শান দিয়ে রাখব বলে রাখছি। কই, নিজেদের দিয়ে তো কুলোল না, শেষকালে ডাক পড়ল সোনাউল্লো আর তুর্লভ প্রামানিকের। এতই যখন হেনস্তা তখন পারব না সাক্ষী দিতে তুর্লভ একটা ঘাই মারল।

কেন চটিস, তুর্লভ? আদালতে গিয়েই তোকে শার্ট কিনে দেব।

ভটচায তার পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করলে। আর চোখ মটকে পতিপ্রসন্নকে বললে সরে যেতে।

খেয়ে-দেয়ে সবাই শুয়েছে, তুর্লভ বেঞ্চির উপর আর ভটচায নিচে মাটিতে মাতুর বিছিয়ে। গরম পড়েছে নিদারুণ, কিন্তু দলিল-পত্রের পুঁটলি নিয়ে বাইরে শুতে সাহস হয় না। মশারি নেই, তাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি, কিন্তু রাত একটু ঘন হয়ে আসতেই তুর্লভের কাশি উঠেছে। খুকখুক থেকে খনখনে কাশি—মুখের আর পাতা পড়ে না, চোখের পাতা একত্র করে সাধ্যি কার!

হ্রস্ব আনুনাসিক শব্দে ভটচায কয়েকবার প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। কাশি থামলেই সাক্ষী যায় চটে, আর সাক্ষী চটতেই কাশি আরো প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু কতক্ষণ পরে দেখা গেল কাশি তরল হয়ে এসেছে, আর সেটা বেশ উত্তপ্ত তরলতা।

এতটা ভটচাযের সহ্য হল না। ধড়মড়িয়ে সে উঠে বসল, ধমকে উঠল দিশেহারার মতো: তোর যে দেখছি বড্ড গরম কাশ, দুর্লভ।

দুর্লভও উঠল খাড়া হয়ে দু-হাতে পাঁজরা চেপে। গলায় সাঁই-সাঁই শব্দ করে বললে, যার ঠাণ্ডা কাশ, তার কাছে যাও, আমি পারব না তোমার সাক্ষী দিতে। বলে, আমি মরছি হাঁপানিতে, আর উনি এখানে জমির চৌহদ্দি মেলাচ্ছেন!

সকালবেলা দলবল নিয়ে ভটচায উকিলের বাড়ি এসে হাজির হল। বোসেদের নতুন দালানে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে এসেছিল, সেখান থেকে মুহুরি সোনাউল্লাকে ধরে এনেছে। বলে দিলে সবাইকে, চিনে রাখ এই সোনাউল্লাকে।

উকিল নরহরি বললে, 'বউনি কর। হাকিম বড় কড়া, ইংরেজীতে ছাড়া কথা বলে না, আট টাকার কমে পারব না কাজ করতে।

মুহুরি টিপ্পনি কাটল: আর বিনা গাউনে যদি মামলা চালাতে চাও তবে কম দিলে চলে, কিন্তু জান না তো, গাউন পরে সওয়াল না করলে কোন হাকিমই আর চোখ তুলে চেয়ে দেখে না আজকাল।

না, না, গাউন পরে বই কি। ভটচায ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফি তবে পুরো চাই।

টেনে-বুনে দর কষাকষি করে চার টাকা বার আনায় রফা হল— সায় মুহুরি আট আনা, আর সোনাউল্লার দিনের মজুরি।

নরহরি মুহুরিকে বললে, হাজিরা লিখে ওদের সব টিপটাপ নিয়ে ঠিকমত ফাইল করে দাও গে। তারপর ভটাচাযের দিকে তাকিয়ে: এ-মামলায় তুমি নির্ঘাত ফল পাবে, পুরুতঠাকুর, হাইকোর্ট ছেড়ে

প্রিভিকাউন্সিলও তোমার কিছু করতে পারবে না। খরচ-পত্র করে এত গুচ্ছের সাক্ষী এনেছ কেন? দুর্লভ পরামানিক আর সোনাউল্লো শেখ—ব্যস্, কেল্লা ফতে! লাগোয়া জমি, বিশ-কুড়ি বছর দখল, চাষ আর রোয়া, মাড়াই আর কাটা, আর তোমাকে পায় কে! তার পরে যা করবার করবে আমার এই মুখ! ওদেরকে শুধু চৌহদ্দিটা বার কতক ঝালিয়ে নিতে বল।

ট্যাঁকে টাকা গুঁজে নরহরি বাড়ির ভেতরে উঠে যাচ্ছিল ভটচায শশব্যস্তে বলে উঠল, মামলাটা আর একবার যদি বুঝে নেন—

নরহরি বাধা দিয়ে বললে, বোঝবার কিছুই নেই এতে। বোঝাব কাকে যে নিজে বুঝব? হাকিমরা কি বোঝে মাথামুণ্ডু? সব লবডঙ্কা। কিছু ভেব না তুমি ভটচায, সব ঠিক হয়ে যাবে। চান করে কালীবাড়িতে দুটো ঢিপ করে হোটেল থেকে খেয়ে-দেয়ে কাছারিতে চলে যাও, এক ডাকে যেন হাজির পায় তোমাদের।

এগারোটা বাজতেই ঘণ্টা পড়ল কোর্টে। খেয়ে উঠে আঁচাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতেই নরহরির সমস্ত শরীর একটা রেলগাড়ি হয়ে উঠল। কাপড়ে তাড়াতাড়ি হাত মুছে মালকোঁচা মেরে তার উপর দিয়ে নিজের প্যাণ্ট দিল চাপিয়ে, গলাবন্ধ কালো কোটটাতে কোনরকম গলিয়ে নিল হাত দুটো, জুতোর ফিতে বাঁধবার সময় হল না, গোটা-ছয়েক পান মুখে পুরে দিয়ে সবুজ গাউনের পুঁটলিটা বগলে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে।

হাকিম এজলাসে, চাপরাশি গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, অপর পক্ষ প্রস্তুত, কিন্তু না আছে ভটচায না আছে সাক্ষীরা। পেস্কার বললে, মুহুরি হাজিরা ফাইল করে তাদের খুঁজতে গেছে, তাও প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল।

নরহরি আদালতকে সম্বোধন করে বললে, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন হুজুর, আমি একবার নিজে খুঁজে দেখি। এখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাকিম বললে, পাঁচ মিনিট।

নরহরি ছুটল বার-লাইব্রেরির দিকে। বেশি যেতে হল না, ঐ ভটচাযদের ভিড়। রাস্তার পাশে একটা কাটা-কাপড়ের দোকানের পাশে জটলা করছে।

কী করছ তোমরা? নরহরি ঝাঁজিয়ে উঠল: ওদিকে মামলা যে গেল খারিজ হয়ে।

বিরক্ত হয়ে ভটচায বললে, দুর্লভের জামা আর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না।

কী করে হবে? গায়ে আঁট হলেও নিতে হবে নাকি? দুর্লভ ঘাড় মোটা করে বললে, ছিটই পছন্দ হয় না, তায় সব ঝিনুকের বোতাম-ওলা। আমি চাই ডবল-ঘরের বুক। অনেক বেছে তবে এটা পাওয়া গেল।

নে, নে, চমৎকার হয়েছে। চলে আয় শিগগির। নরহরি তাড়া দিলে।

বা, সুতো-বাঁধা একগাছি হাড়ের বা কাচের বোতাম কিনে নিতে হবে না? হাঁ-করা জামা পরে সাক্ষী দেব নাকি? দুর্লভ ঘাড়টা আরও ছোট করল।

আমার এখানে আছে। পাশেই একটা মাটিতে বিছানো মনিহারি দোকান থেকে কে বলে উঠল: এই যে এই জিনিস। নকল হীরের।

বাঃ, দুর্লভ লাফিয়ে উঠল যখন দেখল ওটা রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে: ঐটেই চাই। সুতো দিয়ে বেঁধে দাও লম্বা করে।

দাম কত? ভটচায জিগগেস করলে।

সাড়ে চার আনা।

দশ পয়সা পাবে, দিয়ে দাও।

নাও আর দরাদরি কোরো না। পান-মুখে নরহরি একটা ঢোক গিলল: এদিকে দু-পয়সা বাঁচাতে গিয়ে ওদিকে তোমার দু-শো

টাকার মামলাটি কুপোকাত হয়ে যাক। এই না হলে কি পুরুতের বুদ্ধি, চুল কেটে টিকি রাখা!

অগত্যা সাড়ে চার আনা পয়সাই ভটচায ফেলে দিল।

কিন্তু আরও বিপদ আছে। দু পা এগোতেই আর একজনের দোকানে দড়িতে টাঙানো রঙবেরঙের পাতলা চাদর ঝুলছে—সব ইটালি থেকে আমদানি। সিল্ক-ফিনিশ।

দুর্লভ বললে, আর এ একখানা। কথা রাখো, ঠাকুর।

নরহরি চমকে উঠল: এই গরমে তোর গায়ের কাপড় দিয়ে কা হবে রে হতভাগা?

এই গরমে তোমাদের গাউন হতে পারে আর আমাদের একখানা উড়ুনি হলেই চোখ টাটায়! দুর্লভ ফোড়ন দিলে।

মুহুরি আত্মনাথ ছুটতে-ছুটতে হাজির।

বেটাদের আমি গোরু-খোঁজা করছি। ওদিকে সাত মিনিট হয়ে গেছে, খারিজ করবার জন্যে হাকিম আছে কলম উঁচিয়ে বসে। নে, চলে এস শিগগির। বলে সে দুর্লভের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

লণ্ঠন, টেপা-বাতি আর ছাতা—কিছুই হল না। দুর্লভ গাঁইগুঁই করতে লাগল।

ওদিকে যে জরিমানা হয়ে যাবে, সে-খেয়াল আছে? আত্মনাথ গোঁফ ফুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল: টিপ-সই করে হাজিরা দিয়েছিস, অথচ আদালতের ডাকে সাড়া দিচ্ছিস না? মারা যাবি, দুর্লভ।

দুর্লভের চেতনা হল। ভটচাযের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, চলো ঠাকুর, চলো—ও সব পরে হবে'খন। পুরুত মানুষ—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। ভয় নেই, আমি কিছু ভুল করব না—পুবে ভেটকিমারির খাল, পশ্চিমে মাদার মণ্ডল, উত্তরে বিষ্টু গোলদার আর দক্ষিণে ছাবেদ আলি—কেমন, ঠিক তো?

ভটচায আশাতিরিক্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠল: তুই সাক্ষীটা আগে দিয়ে আয়, আগে মামলাটা জিতি—সব দেব, যা তুই চাস, যা তোর দরকার।

আবার সেই সুর করে ডাক উঠল চাপরাশির : বাদী ষষ্ঠীচরণ ভটচায, বিবাদী উমেশবালা।

সাক্ষীসাবুদ নিয়ে নরহরি আদালতের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। হোটেল থেকে খেয়ে আসতেই ওদের দেরি হচ্ছিল, বাইকে করে মুহুরিকে পাঠিয়ে তবে ডেকে এনেছি। এই কথাগুলি বলতে-বলতে নরহরি দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে গাউনটা আদালতের সম্মুখেই পরে নিলে। ছ-টা পানের ছ-আনি তখনও মুখের মধ্যে, তাড়াতাড়ি তার চর্বণ-পর্বটা সমাধা করতে-করতে বললে, নাও, ওঠ, ওঠ ষষ্ঠী।

হাকিম বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, পানটা আগে খেয়ে নিন।

নরহরি লজ্জিত হল, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিতে তার যশ আছে। মুখের চর্বিতাবশেষটুকু জিভের এক ঠেলায় দক্ষিণ কোণের মাড়ির উপরে চালান দিয়ে ডান হাতের উলটো পিঠে বোজানো ঠোঁট বার-কতক রগড়ে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে নরহরি ভটচাযকে কাঠগড়ায় তুলে দিল। বললে, নাম বলো।

যথারীতি শুরু হয়ে গেল মামলা। অপর পক্ষে কৈলাসবাবু সিনিয়র উকিল, অগাধ জলের মাছ, ভাব দেখান যেন চুনোপুঁটি। নরহরি একটা প্রশ্ন জিগগেস করছে আর অমনি তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, I object, Sir.

এমনি যখন, 'চিফে'র পব জেরা চলছে, কে আরেকজন উকিল দাঁড়িয়ে পড়েছে কোণের দিকে। পার্শ্ববর্তীকে বললে, এই, তোর গাউনটা দে দিকি, একটা জরুরি পেশ সেরে নি। আমাকে একবার এক্ষুনি সার্টিফিকেট আপিসে যেতে হবে। বলে তাড়াতাড়ি গাউনটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বার-কতক পাঁয়তারা কসে বললে, স্যর এক মিনিট।

আদালত নির্মম গলায় বলল, আড়াইটেয়!

ষষ্ঠীর পালা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল, এমন কি দুর্লভের 'চিফ' পর্যন্ত। ভটচায পর্যন্ত অবাক, সব একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। জমির কোন ধারে 'পাতো' দেওয়া হয়েছিল তাতেও সে ভুল করল না।

ছাটস অল। নরহরি বললে।

চশমার ফাঁকে বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে-করতে কৈলাসবাবু উঠলেন। গলা খাঁখরে বললেন, দুর্লভবাবু, আপনি তো গাঁয়ের একজন মাতব্বর।

প্রথমটা দুর্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল। ঠিক তাকেই জিগগেস করা হচ্ছে কিনা সে ঠিক দিশে পেল না।

কৈলাসবাবু বললেন, হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি—এমন পুলিস-সাহেবের মতো জামা, গাঁয়ের একজন বিশিষ্ট মাতব্বর না হয়ে আপনি পারেন না।

দুর্লভ গলে একেবারে জল হয়ে গেল। তার আপনার লোকেরা তাকে চিরকাল হেনস্তা করেছে, সে যে কত বড় একটা মানুষ এ-কথা কেউ কোনদিন তাকে বুঝতেই দেয় নি, আজ যেন মুহূর্তে তার চোখের সুমুখ থেকে কালো একটা পর্দা উঠে গেল, গাঁয়ের প্রেসিডেণ্টের চেয়েও সে মানী লোক, শহরের সবচেয়ে সেরা উকিল কৈলাসবাবু তাকে 'আপনি' বলে ডেকেছে, এক কথায় চিনে নিয়েছে সে মাতব্বর, রাম-শ্যাম যদু-মধু নয়।

লজ্জিত বিনয়ে দুর্লভ বললে, তা গাঁয়ের লোকে বলে থাকে বটে।

বলতেই হবে। কৈলাসবাবু ফের প্রশ্ন করলেন, মাতব্বরি করতে তো আপনাকে এখানে-সেখানে বেরুতে হয়, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ, কোন সরিকের সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করে দেওয়া, কোন জমির আল-ভাঙার ঝগড়া মিটোনো—এমনি লেগেই আছে তো আপনার কাজ। গাঁয়ের মাতব্বর, বিঘটিত একটা কিছু হলেই তো আপনার ডাক পড়ে।

মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন। দুর্লভ উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত নেই।

মাতব্বর হবার দোষই এই। সাক্ষী পর্যন্ত দিতে হয়।

হয়ই তো। দলিলপত্র কিছু একটা হলেই দুর্লভের ডাক পড়ে। গাঁয়ে আদালতের চাপরাশি গেলেই সব্বাইর আগে আমাকে ডাকে জারি দেখতে।

তা হলে চাষ-আবাদ আর করতে পারেন না! সময় কোথায়?

আমি করব কেন? শীতল করে—ভাগে।

সে তো আপনার ঝিলখালির জমি, মালেক নন্দীবাবুরা। খতিয়ানে বর্গা-দখল শীতল মণ্ডল।

ঐ তো আমার জমি। শীতল চাষ করে।

তা তো ঠিকই। নিজের হাতে লাঙল-ঠেলা আপনাকে মানাবে কেন? আসছে বছরে বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হবার কথা, কত চৌকিদার-দফাদার খাটবে আপনার নিচে—কি, ঠিক বলছি কিনা।

সস্মিত লজ্জার ভান করে দুর্লভ বললে, তেমনিই তো শুনছি কানাঘুষো।

আর ঐ তো আপনার একমাত্র জমা?

একমাত্র। মায় সেস সাড়ে ন টাকা খাজনা।

আর আপনার ভিটে-বাড়িও তো সেই জমার সামিল?

সামিল।

আচ্ছা, এখন বলুন তো, নালিশী জমি থেকে আপনার বাড়ি কত দূর?

নালিশী জমি? দুর্লভের মনের কোণে এতক্ষণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, নালিশী জমির চৌহদ্দি আমি বলে দিতে পারি।

এত বড় মাতব্বর, তা পারবেন বই কি। কিন্তু ও আমি চাই না। কৈলাসবাবু চশমার তলা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে জিগগেস করলেন: আমার প্রশ্ন হচ্ছে নালিশী জমির থেকে আপনার ঝিল-খালির বাড়ি কত দূর? ক-রশি?

রশি আমি বুঝি না।

আচ্ছা, ক মাইল?

লেখাপড়া জানি না বাবু, মাইল কব কী করে?

আচ্ছা, কৈলাসবাবু প্রশ্নটাকে আরেকটু ঘুরিয়ে দিলেন: ঘণ্টা বোঝেন তো? দণ্ড?

তা বুঝি।

বেশ, তবে বলুন দিকি, আপনার বাড়ি থেকে নালিশী জমিতে যেতে কতক্ষণ লাগে? ক ঘণ্টা?

কতক্ষণ? দুর্লভ মনে-মনে কী হিসেব করল। বলল, আচ্ছা, যাব কিসে? তড়ে না নৌকোয়?

ধরুন, নৌকায়।

আচ্ছা, গোনে না বেগোনে?

ধরুন বেগোনে।

উজানে না পিঠামে?

ধরুন পিঠামে।

দিবসে না রজনীতে?

ধরুন রজনীতে।

দুর্লভ মরিয়া হয়ে বলে উঠলে: ও আমি কেন, আমার ঠাকুর্দা এলেও বলতে পারবে না।

তা হলে আপনি বলতে পারেন না জমি সোনাউল্লো করত কি তার চাচা করত।

জমিতে পৌঁছিয়েই দিতে পারলেন না, তায় বলব কি করে, কে করে? করজোড় করে দুর্লভ বললে, এই ধর্মঘরে আছি, একটি কথাও মিথ্যে বলব না হুজুর।

কৈলাসবাবু বললেন, নামো!

আদালত বললে, পরের সাক্ষী।

নরহরি আত্মনাথকে জিগগেস করলে, ষষ্ঠী কোথায়? দেখ আর কাকে সে সাক্ষী দেবে?

চারদিকে চেয়ে ভটচাযকে কোথাও না পেয়ে আত্মনাথ বাইরে বেরিয়ে গেল। ভেণ্ডাররা যেখানে সেই তার বারান্দার কাছে ভটচাযের সঙ্গে তার দেখা, গায়ে তার একখানা রঙীন চাদর।

আত্মনাথ ধমকে উঠল: গেছলে কোথায়?

চাদর কিনতে। নগদ পাঁচ সিকে দাম নিলে। ভটচাযের চোখে তখন প্রায় জল দাঁড়িয়ে গেছে।

ও দিয়ে হবে কী? আত্মনাথ মুখ খিঁচোল।

দুর্লভের চোখের সামনে গায়ে দিয়ে থাকব। ও দেখবে, ওর চাদর কেনা হয়ে গেছে। চাদর দেখলেই ও ধাতে আসবে।

আর দুর্লভ! এখন আর কাকে সাক্ষী দেবে তার নাম কও।

কেন, দুর্লভ নেমে গেছে? হা অদৃষ্ট! ভটচায উদভ্রান্তের মতো আদালতে ছুটে এল।

এসে দেখল তার আসতে দেরি দেখে নরহরি হাজিরায় লিখে দিয়েছে আর সাক্ষী দেবে না এবং অপর পক্ষের উমেশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়।

অস্ফুট কণ্ঠে ভটচায নরহরির কাছে কেঁদে পড়ল, কী হবে বাবু?

নরহরি বললে, ভয় কী, মামলা এখানে না পাও আপিল আছে। সেখানে সাক্ষী খাটবে না, সব আইনের কুস্তি। নাও, আরো গোটা দুই টাকা বার কর, জেরায় সব ফাঁসিয়ে দেব এক্ষুনি, গোন-বেগোন বেরিয়ে যাবে বাছাধনের। আরো দুটো টাকা চাই, নইলে এমন উইক কেস আমি জেতাতে পারব না।

ভটচায তার পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে শেষ দুটো টাকা বার করে দিল।

মাটি

দরজার কাছে কে-একটা লোক ঘুরঘুর করছিল। হেডমাস্টারবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন : কী চাই ?

লোকটা থতমত খেয়ে সরে যাচ্ছিল হেডমাস্টারবাবু তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই তাঁর আজিজুর রহমান। বললেন, দেখো তো লোকটা কে ?

এ সময়টা হেডমাস্টারবাবুর ভয়ের সময়। তিন বছর আগে নরোত্তমপুরে থাকতে তাঁর বাড়ি পুড়ে যায়, ঝাঁকে-ঝাঁকে বেনামী চিঠি তাঁর হাতে আসে। এ জায়গাটা ঠিক পাড়াগাঁ না হলেও বলা যায় না কার কী অভিসন্ধি। দিন-দুপুরে হলেও গা-টা ছমছম করে ওঠা আশ্চর্য নয়।

আমার ফাদার স্যার। আজিজ কুণ্ঠিত মুখে বললে।

এতটা গুরুদয়ালবাবু ভাবতে পারতেন না। যেন থমকে গেলেন।

ছেলের পরিচয়ের সুতো ধরে সাহসে ভয় করে আমানত ঘরে ঢুকল। গুরুদয়ালবাবু যেন ফাঁপরে পড়লেন, আর কোনো কারণে নয়, ছেলের সঙ্গে বাপকে কিছুতেই মেলাতে পাচ্ছেন না বলে। আজিজের পরনে ঢিলে পা-জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে ডোরা-কাটা শার্টের উপর গরম কোট, বুকটা বিস্ফারিত খোলা, শার্টের কলারটা ইস্ত্রির কড়া শাসনে ফণা তুলে আছে। আর, আমানত প্রায় বুড়ো, পরনে খাটো পুরানো লুঙ্গি, গায়ে ছিটের কোরা কুর্তা, কাঁধের উপর জ্যালজেলে একখানা দোলাই।

কেন এসেছে, গুরুদয়ালবাবুর আন্দাজ করতে দেরি হল না। তবু, অভিভাবক যখন, বসতে দিতে হয়।

বসুন।

ফাঁকা চেয়ার ছিল সামনে কিন্তু আমানত দরজার কাছে মেঝের উপরই বসে পড়ল। হাত জোড় করে বললে, ঐ আমার একমাত্র ছেলে। বাবু, আপনি না দয়া করলে—

ছেলেকে কোথাও দেখা গেল না। বাপকে পৌঁছে দিয়েই সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

গুরুদয়ালবাবু বিরক্তমুখে বললেন, আমরা দু সাবজেক্ট পর্যন্ত কনসিডার করেছি, কিন্তু আপনার ছেলে তিন সাবজেক্টে ফেল।

চাষা-ভুষো মানুষ, অতশত বুঝি না বাবু। শুধু কৃপা করে ছেলেটাকে আমার—

কৃপা করে—গুরুদয়ালবাবু হাসলেন : তা হলে ইস্কুলের বেঞ্চি-চেয়ারগুলোই বা কী দোষ করেছিল? আপনার ছেলেকে এলাউ করতে হলে বেঞ্চি-চেয়ারগুলোকেও এলাউ করতে হয়।

ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবু।

এই যুক্তির সামনে গুরুদয়ালবাবু ভারি অসহায় বোধ করলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

আমানত তার পিছু নিল।

কী করেন আপনি?

আমি? গৃহস্থি করি।

গৃহস্থি মানে? চাষবাস?

তা নইলে খাব কী করে বাবু?

প্রজাবিলি আছে? না খাসে রেখে আধি দিয়েছেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে আমানত বললে, জমিই মোটে এখন দশ বিঘেতে দাঁড়িয়েছে। তার আবার প্রজাবিলি না আধি!

জমি তবে নিজেই চাষ করেন নাকি?

আর কে করবে বলুন। দু-চারটে পাইট কখনো খাটে, মাঝে

মাঝে দু-চার বিঘে কখনো ফুরন দিই, নইলে সব আমিই নিজ হাতে কারকিত করি।

চলতে-চলতে গুরুদয়ালবাবু থেমে পড়লেন। কম করে গ্রাম্য একজন গাঁতিদার বা মহাজন ভেবেছিলেন, কিন্তু একেবারে নিজহাতে লাঙল ঠেলে—এটা যেন তাঁকে ঘা মারল। আপাদমস্তক দেখলেন একবার আমানতকে। দেখে তাঁর সন্দেহ রইল না, এ একেবারে একজন খাঁটি মানুষ।

গুরুদয়ালবাবুর গলা থেকে সম্ভ্রমের সুরটুকু উবে গেল। বললেন, তোমার তবে এ ঘোড়ারোগ হল কেন?

আমানত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বলি, ছেলেকে দিয়ে এই ঘোড়দৌড় খেলার শখ হল কেন? হাল ছাড়িয়ে কলম ধরতে দেবার কী দরকার ছিল?

আভাসে মর্মার্থটা বুঝতে পেরেছে আমানত। ম্লান চোখে ঔজ্জ্বল্য আনবার চেষ্টা করে বললে, ও যে বড় হতে চায় বাবু।

যথেষ্ট বড় হয়েছে! গুরুদয়ালবাবুর গলায় একটু শ্লেষ ফুটে উঠল কি না আমানত ধরতে পারল না: চাষার ছেলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে, এতেই গাঁয়ে পণ্ডিতি মিলে যাবে দেখো। নিদেন রেজেস্ট্রি অফিসে ডীড-রাইটার তো হতে পারবে।

না বাবু, অত ছোটতে রাজি নয়। আবার চকচক করে উঠল আমানতের চোখ: ও বলে ও হাকিম হবে, মেম্বর হবে, মন্ত্রী হবে—

কিন্তু অত যে হবে পড়ে না কেন?

পড়বে বাবু, ঠিক পড়বে। আপনি খালি এ-যাত্রা পাশ করিয়ে দিন। আমি ওর জন্যে আলগা মাস্টার রেখে দেব।

তোমার যে দেখছি অনেক পয়সা। গুরুদয়ালবাবু বাঁ চোখের কোণটা একটু কুঞ্চিত করলেন: মহাজনি আছে বুঝি?

হায় রে বরাত! আমানতের মাথাটা ঝুঁকে পড়ল মাটির দিকে হতাশার ভঙ্গিতে।

তবে, দশ বিঘে তো জমি, চালাও কী করে? জমা কত? খানেওলা কজন?

দশ বিঘে তো হালে বাবু, কিন্তু ছিল আমার সত্তর বিঘে। তিন মৌজায় ছড়ানো। বেশির ভাগই তার কান্দর জমি, বিঘেপ্রতি ধান হত দশ-বারো মণ। খলেনে যখন ধান এনে তুলতাম— আমানতের গলা ঝাপসা হয়ে এল।

সে সব গেল কোথায়?

সব এই ছেলের পেছনে। খাই-খালাসী বন্ধক নিয়েছে মহাজন, খতে লিখেছে জায়সুদি। শেষকালে আসল টাকার জন্য ডিক্রিজারি করে নিলেম করে নিয়েছে। হ্যাণ্ডনোটে টিপ দিয়েছি দশ টাকা বলে, পরে শুনি আর্জি করেছে একশো টাকার। দশের পিঠে একটা গোল্লা বসালেই নাকি একশো হয়। লেখাপড়া জানি না বলেই তো এই দশা। তাই মতলব ছিল ছেলে আমার লেখা-পড়া শিখে মানুষ হলে দলিলে-দস্তাবেজে আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। জমি-জিরাত সব সামলাতে পারব।

দলিল পড়তে আর লাগে কী! ঢের হয়েছে তোমার ছেলের বিদ্যে।

আমিও তাই ওকে বলি বাবু, ঢের হয়েছে। কী হবে আর বিদ্যে দিয়ে? তুই চলে আয় আজিজ, বলি ওকে, বাপে-পোয়ে মিলে জমিতে লেগে যাই দুজনে। গোলা ভরে সোনা জমাই। আবার আমার সত্তর বিঘে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। আমানতের দুই চোখ আবার চকচক করে উঠল।

ও কী বলে?

রাজী হয় না বাবু।

তা কী করে হবে? গায়ে তিন তাল্লা উঠেছে। গেঞ্জির উপর শার্ট, শার্টের উপর কোট। বড় যে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছ। অত সব ছাড়ে কী করে? গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।

আমানত এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বললে, তাই আর ওর পাশ করা ছাড়া গতি নেই। দয়া করে দিন না ওকে বেরিয়ে যেতে।

এখন আর আমার হাতে নেই। তলার দিকটা সেক্রেটারিবাবুর হাতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো গে। কী উঠেছে এবার তোমার ক্ষেতে? ছোট্ট ভ্রূকুটি করে গুরুদয়ালবাবু কেটে পড়লেন।

পালানে কিছু ঠাকুরি-কলাই করেছিল আমানত। ঝুড়ি করে তাই নিয়ে দেখা করতে গেল সে সেক্রেটারিবাবুর বাড়ি।

ভুজঙ্গ হালদার শুধু ইস্কুলের সেক্রেটারি নয়, যৌথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তদুপরি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিকল্পে সবাই তাঁকে অনাহারী বলে। সেই কারণে সর্বত্রই তাঁর গ্রাসটা কিছু উদ্যত।

ফেরিওয়ালা ভেবে আমানতকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ভুজঙ্গবাবু, কিন্তু তার বক্তব্য শুনে ঝুড়িটার ওজন আন্দাজ করে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। বললেন, শেষ লিস্টি আমি সকালে টাঙিয়ে দেব। দেখি আর কে-কে আসে।

শহর থেকে আমানতের বাড়ি প্রায় তিন ক্রোশ, দু দুটো খাঁড়ি পেরিয়ে, মরালডাঙার গাঁয়ে। আজিজ থাকে ইস্কুলের হস্টেলে, সানকিতে করে পান্তা আর পেঁয়াজ খেয়ে নিত্যি সে পায়ে হেঁটে ইস্কুল করতে পারে না। আর তার সবে-ধন আজিজ। দু দুটো জোয়ান ছেলে মরেছে জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে, রেখে গেছে কতগুলি মেয়ে, চাষার ঘরে যা অবান্তর। ছেলের জন্যে বুড়ো বয়সে সেও নিকে করেছিল কিন্তু নেকজানের মা কেবল রোগে ভোগে।

সকাল থেকে আমানতের মন খারাপ। আজিজ সব শুষে নিচ্ছে এই বলে নেকজানের মা তাকে সমস্ত রাত গঞ্জনা দিয়েছে। কোথায় ছিল আর কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজিজ। আমানত বলেছে: আর দুটো দিন সবুর করো নেকজানের মা, আজিজ আমাদের আবার সব ফিরিয়ে দেবে।

নেকজানের মা বলেছে: কচু! মান সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হবে সবাইকে।

নেকজানের মার আমলেও সে কম দেখে নি। আগে দলিজ ঘর ছিল, খলট ছিল যেন বেড়াবার মাঠ, দুখানা ছিল গোরুর গাড়ি, সাইকেল

ছিল একটা, তিন তিনটে ছিল হ্যারিকেন। তার গায়েও দু-চার গাছা বাজু-খাড়ু উঠেছে। কিন্তু আজ সে সব কোথায়? ঘরের টিন উড়ে গিয়ে ছন এসেছে, অস্থাবর করে গাড়ি, গোরু, সাইকেল ধরে নিয়ে গেছে মহাজন, খলটের জমি লাগছে এখন খেতির কাজে। গাছ-গাছালিতে বাড়ির সীমানা ছোট হয়ে আসছে দিন-দিন।

কিন্তু আশা ছাড়ে নি আমানত। বাড়ির গায়ে হালটের উপর দাঁড়িয়ে আদিগন্ত তাকিয়ে এখনো সে আন্দাজ করতে পারে কতদূর পর্যন্ত তার জমির সাবেক চৌহদ্দিটা প্রসারিত ছিল। তার ঠাকুর্দা এজারদ্দি শেখ—মুদাফৎ এজারদ্দি শেখ আজো দেখা যাবে জমিদারের চিঠা-খতিয়ানে। ভয় নেই, সব আবার আজিজ ফিরিয়ে আনবে। বিয়ে করে ছেলে এনে দেবে তাকে এক পাল—নাতিতে ঠাকুর্দাতে মিলে তারা চৌপহর আবাদ করবে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবে ঝমঝম। মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাবে এক হাঁটু। মাঠ ছেয়ে তরতাজা ধান উঠবে গজিয়ে।

ভাটিবেলায় আজিজ এসে হাজির।

নাম টাঙিয়ে দিয়েছে বাপজান। এক লক্ষ্মণ মণ্ডলের ছেলেটা পায় নি, লক্ষ্মণ বিনা টাকায় হ্যাণ্ডনোট কাটতে রাজি হয় নি, তাই।

আমানতের খুশী হবারই কথা, কিন্তু কেন কে জানে চোখ দুটো তার চকচক করে উঠল না। ছেলেকে কেমন যেন তার বিদেশী, বেমানান মনে হচ্ছে, যেন বড়ো বেশি এলেম, বড়ো বেশি চটক তার চেহারায়। সব কিছু কেমন বেজুত লাগে তার সামনা-সামনি।

পাশ করলে, এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে না? নেকজানের মা মুখ ঘুরাল।

আমানতের মনে পড়ল এমনি রসগোল্লা আনত সে, শহর থেকে যখন ভালো দর পেত সে ধানের। বলত: খবর জবর ভালো নেকুর মা, সরু-এলাইর দাম চড়েছে। কিনে এনেছি এই রসগোল্লা। আর এই এক গোছা পদ্মপাতা। সবাইকে দাও পাতায় করে।

সে সব দিন কি আর আছে?

চাচা এই তিলকুট দিয়েছে নানী। গুড়ের তিলকুট।

গুড়ের নয় বোকা। আজিজ সংশোধন করে: ওটা চকোলেট। সাহেব-মেমের বাচ্চারা খায়।

তিলকুটের স্বাদ বেড়ে যায়। তারপর তার মোড়কের কাগজ নিয়ে শিশুগুলোর মধ্যে মারামারি হয়।

এলাউ তো হলাম, কিন্তু ফি-টি জড়িয়ে লাগবে এখন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। আজিজ আমানতকে মনে করিয়ে দেয়।

টাকা? আমানত যেন ভিতর থেকে ঝাঁকুনি খায়: এত টাকা মিলবে কোথায়?

না মিললে চলবে কী করে? শেষকালে পাড়ে এসে ভরাডুবি হবে নাকি?

হলেও যেন ভালো ছিল। আমানতের বুকের ভিতরটা হাজা-শুখা জমির মতো খাঁ খাঁ করতে থাকে।

এবার ছাড়ান দে, আজিজ। ঐ দ্যাখ, ঐ নদী পর্যন্ত আমার জমির সীমানা ছিল। দক্ষিণে দূর জলের রেখা যেখানে আকাশের সাদায় গিয়ে মিশেছে সেইদিকে চেয়ে আমানতের চোখ চকচক করে ওঠে: সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। আয়, দুজনে লেগে যাই লাঙল নিয়ে, সব আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসি বুকে করে।

আজিজ হেসে ওঠে: তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি? নিশ্চয় সব আবার ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। আমাকে মানুষ হতে দাও একবার। তুমি ভাবছ কী? থাকবে নাকি আর এই আউরের ঘর? সব পাকা ইমারত হয়ে যাবে দেখো। আর তখন সব মধ্যস্বত্ব কিনব—প্রজা বসিয়ে দেব, রায়ত আর কোলরায়ত—গায়ে মাটি মেখে লাঙল আর বাইতে হবে না তোমাকে। তখন খাজানা নেব—নগদ আর ধানকড়ারি।

গায়ে মাটি মাখব না তবে বাঁচব কী করে?

আজিজ আবার হেসে ওঠে: সাবান মেখেও দিব্যি বাঁচা যায় বাপজান, ভাবনা কী?

না, দরিয়ার পারে এনে না ডুবানো যায় না, কিন্তু কোথায় পাবে

টাকা? মহালের মহাজনরা সব খুতির মুখ দিয়েছে বন্ধ করে, এক পয়সা কেউ কর্জ দেয় না। সাদা খত দূরের কথা, রেহানী খতেও টাকা ছাড়তে কেউ রাজি নয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। রেজাইখানা কাঁধে চাপিয়ে আমানত হাজীসাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হল।

আর্জি শুনেই হাজীসাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল: আবার টাকা ধার করতে এসেছ কোন মুখে হে আমু মিয়া? দুখানা বন্দকী তমসুক—দুবিঘে আর তিন বিঘে—বোর্ডের কারসাজিতে বেমালুম ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে—আবার টাকা কিসের হে? অভ্যেস এখনো শোধরাল না দেখছি।

ছেলের পরীক্ষার ফিস দিতে হবে, গোটা পঞ্চাশ টাকা চাই হাজীসাহেব। খাইখালাসী নিন, কটকবালা নিন—যা আপনার পছন্দ। দুবার করে তো আর বোর্ডে যেতে পারব না।

অত সব ঘোরপ্যাচের মধ্যে নেই বাপ। সোজাসুজি সাফকবলা করতে পার তো দেখতে পারি।

কতখানি চাই কত টাকায়? আমানত আড়ষ্টের মতো জিগগেস করলে।

ঐ পাঁচ বিঘেই আমার চাই—যা তুমি তখন ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছ। ঐ পাঁচ বিঘে আওল জমি বিক্রি কর তো একশো টাকা দিতে পারি।

কিন্তু হালফিল একশো টাকার আমার দরকার নেই। আমানত যেন নিশ্বাস ফেলল।

টাকার আবার দরকার নেই কার? এ যে নতুন বাত শোনাচ্ছ মিয়া। খরচ করতে না চাও দর-পরদা রেখে দাও জমিয়ে।

কিন্তু কান্দর জমি—বিঘে প্রতি দাম মোটে কুড়ি টাকা?

ঢোল-সহরত করে দেখলেই পার। না পোষায় অন্য জায়গায় পথ দেখ। আমি এক কথার গাহেক! খাতিরনাদারৎ।

দু বিঘে নিন না—দু বিঘেতে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিন! ফরমানি করুন, হাজীসাহেব। আমানত মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

বলি, গরজটা কার হে, আমু মিয়া? এক লপ্তে জমি চাই পাঁচ বিঘে—সবই তোমার এক কদরের জমি নয়, কান্দরের সঙ্গে ডাঙ্গাও কিছু আছে—দাগ-খতেন আমার মুখস্ত। তোমার টাকার দরকার কম হতে পারে কিন্তু আমার জমির দরকার কম নয়। রাজি থাক তো কবলার মুসাবিদা করে ফেলি। পরে আধি নিতে চাও তো নিতে পার—ফসল যখন করা হয়ে গেছে। বুঝলে, এর বেশি মহকুফ চলবে না।

কী দমবাজ, কী ফুঁদে—আমানত ভাবে, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারে না।

উপায় কী—কোথায় নইলে টাকা! তার আজিজ নইলে মানুষ হয় কী করে!

সাত দিন পরে ফিস দেবার শেষ তারিখ, আজিজ তাগিদ পাঠিয়েছে। ঘুরঘুট অন্ধকারে আমানত দিকবিদিক দেখতে পায় না, কবালার গায়ে কোণাকুণি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে ফেলে।

ধানের শীষে আগুনের শীষ—সমস্ত মাঠ ভরে গেছে এখন সোনার আমেজে। পাঁচ বিঘে চকবন্দী করে দিয়ে গেছে হাজীসাহেবের জমানবিশ। গা-গতর ঢেলে চাষ করেও ফসলের অর্ধেক শুধু তার।

এই পঞ্চাশ টাকা তোর কাছে রেখে দে, নেকজানের মা।

কী, আমার পৈঁছে হবে নাকি? নেকজানের মা ঘুরে দাঁড়ায়।

ঢামালি করিস নে। মেজাজ আমার আজ রুঠা হয়ে গেছে।

কেন, হয়েছে কী? টাকা পেলে কী করে?

লুটতরাজ করে। নাউড়ে হয়ে এবার ডাকাতি করতে বেরুব।

আমানতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

বলো সত্যি করে, টাকা কে দিল।

আর কে দেবে, নেকজানের মা? আমার এই জমি, আমার এই জায়দাদ ছাড়া আর কে ছিল আমার? আমি একটা আহাম্মক, সব ভুট করে দিলাম।

কী, জমি বিক্রি করেছ বুঝি? কতখানি? এবার কি সব তবে

ভুকসানি হয়ে মারা যাব নাকি? নেকজানের মা চোখে আঁচল চাপা দিল।

ভয় নেই নেকজানের মা, আমাদের আজিজ আছে। রহমান আছে। আবার সব ফিরে পাব।

ধান কেটে খলেনে ভাগ হয়ে গেল। গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল হাজীসাহেবের। আউড়ের কুটোটি পর্যন্ত সে কুড়িয়ে নিলে। আমানতের দেহে যেন আর জোর নেই, জেল্লা নেই, শিটা হয়ে আসছে দিন-দিন।

মজুত পঞ্চাশ টাকা রাখা গেল না সরিয়ে—উড়াল দিয়ে চলে গেল। আজিজ যাবে শহরে পরীক্ষা দিতে। রাহা-খরচ আছে, খোরাকি আছে, জামা-কাপড় আছে—ফরদা সে খরচের ফর্দ। এদিকে ধূলধেকড়া সব ছেলেপিলেদের পরনে। তবু, যতটা পেরেছিল রেখেছিল আমানত হাতের মুঠ আঁট করে, শোনা গেল মাস্টার-সাহেবের ছ্ মাসের পাওনা বাকি আছে কুড়ি টাকা।

ফকির-ফোকরা হয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি শেষকালে? নেকজানের মা ঝামটা দিয়ে ওঠে।

কী যে বলিস তার ঠিক নেই। আজিজ আমাদের মস্‌নদে বসাবে। তুই থাকিস ইমারতে, নেকজানের মা, আমি আমার ভুঁইয়ে বুক দিয়ে পড়ে থাকব।

আরো পাঁচ বিঘে এখনো আছে। ঝাঁ ঝাঁ করে আকাশ, মেঘের ছিটে-ফোঁটা নেই আনাচে-কানাচে। আমানত আকাশের দিকে তাকায় আর লাঙল ঠেলে। পানি-পশালা এবার আর হল না এ-তল্লাটে।

আধপেটাও বুঝি আর জোটে না। এবার বোধ হয় নগদা মজুরিতে পাইট খাটতে হয়।

না, রহমান আছেন। টেনেবুনে আজিজ পাশ করেছে, চাষার ছেলে আজ তাকে আর কে বলে। বদলে গেছে তার নামনিশানা।

কী করবি, আজিজ? জিজ্ঞাসা করতেও যেন সম্ভ্রম হয়।

পড়াবার তো আর মুরোদ নেই তোমার, এবার তাই চাকরি নেব।

চাকরি আছে গোটাকতক। আদালতের আমলা। প্রাথমিক একটা পরীক্ষা হবে লোকদেখানো। জেলার সেরেস্তাদারকে যে ভারি হাতে খাওয়াতে পারবে তারটাই অবধারিত, আর সব খারিজ।

একশো টাকায় রফা হয়েছে, বাপজান।

আবার টাকা!

কিন্তু চমকে ওঠার কিছু নেই। নৌকো শুধু পাড়ে ভিড়ালেই চলবে না, নোঙর নামাতে হবে! টাকা দেবার জন্যে জমি রয়েছে এখনো নিটুট পাঁচ বিঘে।

দোয়াত-কলম-স্ট্যাম্প-ইসাদি নিয়ে হাজীসাহেব এসে হাজির, পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে—বাকি পাঁচ বিঘেও লোপাট হয়ে গেল।

সদর থেকে আজিজ চাকরির খবর নিয়ে এলেও আমানতের কান্না থামল না: একেবারে ফৌত-ফেরার হয়ে গেলাম, নেকজানের মা।

বাপ-পিতামোর ভিটেটুকুই শুধু আছে। কিন্তু কী হবে তার এই বাস্তু দিয়ে যদি আর তাতে বস্তু না থাকে এক কণা।

আজিজ সবাইকে শহরে নিয়ে এল, তার কর্মস্থলে। ত্রিশ টাকা মাইনেতে টায়েটুয়ে সে চালিয়ে নেবে সংসার। এদিক-ওদিক আছে কিছু উপরি—ঘাঁতঘোঁত সে এরি মধ্যে দোরস্ত করে নিয়েছে। এলেমদার ছেলে সে—কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ছিলিম খেয়েও আমানত আগের স্বাদ পায় না, শ্রান্তদেহে তামাকের সে-ধার। দুদিনই তার গতুরে শরীর কেমন ধসকে গেছে, বাত জমে উঠেছে গাঁটে-গাঁটে। মেজ ছেলের বৌটা আলাদা হয়ে গেছে, বড় ছেলের বৌটাও যাব-যাব করছে। নেকজানের মা রয়েছে এখনো তাকে আঁকড়ে। কিন্তু একেক সময় ইচ্ছে করে আমানতের, তাকে তিন-তালাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আবার তার মাটির আকর্ষণে—কাঁচা-সোনা-গা নয়লী যৌবনী কাউকে সাদি করে ফের বুড়ো বয়সে, এক ফৌজ সৃষ্টি করে সে মাটির উপর, দিগন্ত পর্যন্ত সে সবুজের তরঙ্গ তুলে দেয়।

তার দিন আর কাটে না। অনড় হয়ে আসে তার হাত-পা। খাবার পর ঢেঁকুর ওঠে। তাই আজিজ তাকে বাজারে একটা খোপরি ভাড়া করে দিয়েছে। আমানত সেখানে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে সেলাইর কল চালায়। ফতুয়া বানায়, কুর্তা বানায়, শার্ট বানায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যবসা। আমানত আর চাষা নয়, খলিফা। আজিজ আর চাষার ছেলে নয়, খলিফার ছেলে। অনেক নরম লাগে শুনতে।

কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়—বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ ; আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।

কালনাগ

ভবতোষ চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, আত্মহত্যা। আত্মহত্যা ছাড়া কোনো পথ নেই সমাধানের। পরাজয়-মোচনের।

সমস্ত রাত ছটফট করেই তার কাটত, যদি না শেষ রাতের দিকে চাঁদ উঠত পীত-পাণ্ডু। চাঁদ দেখে তার আশা হল একবার, এই বুঝি আকাশ ছিঁড়ে যাবে বন্য চীৎকারে আর দেখতে-না-দেখতে সে তার সমস্ত নিয়ে আগুনে অঙ্গার হয়ে উঠবে। তার সমস্ত অর্থ—তার লজ্জা, তার দৈন্য, তার সাহসহীনতা। তার এই আনর্থক্য।

কিন্তু আজকের চাঁদ আতঙ্কের চাঁদ নয়, ঘুম পাড়াবার চাঁদ। একটু ঘুমুলই না হয় ভবতোষ। কাল যে আত্মহত্যা করবে চাঁদের বৈমুখ্যে আজকে তার নালিশ না করলেও চলে।

ভবতোষ সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে ভুলল যে কাল তাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ভুলল, তিন দিন ধরে আধপেটা খাচ্ছে, সাত দিনের উপর সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, এক মাসেরও উপর পরনে তার একটা আস্ত কাপড় নেই। ভুলল সংসারে যে চিনির পাট নেই, জুতোর হাঁ-টা যে বোজানো যাচ্ছে না, কয়েক দিন আগে একমাত্র লেখবার টেবিলটা যে পোড়াতে হয়েছিল কয়লার অভাবে। ভুলল তার অসহায় স্ত্রী, অসহায়তর শিশুগুলি। ভুলল সে ইস্কুলমাস্টার।

সংকল্পের উত্তাপের দরুন তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙল ভবতোষের। দিনের আরম্ভটি কেমন যেন নতুন লাগল।

নতুন লাগল, সুধার কাংস্য-কর্কশ কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ শোনা গেল না। তার অগণিত অভিযোগের তালিকা। তবে কি ঘটেছে কিছু অভূতপূর্ব? শোঁকা যাচ্ছে কি উনুনের ধোঁয়া?

ভবতোষ নেমে এল তক্তাপোশ ছেড়ে। নিচে মেঝের উপর গড়াচ্ছে এখনো শিশুগুলি, সুধার জায়গাটা শুধু ফাঁকা। যেখানে ঘুম মানে বিস্মরণ সেখানে এত ভোরে ওঠবার মানে কী? আর উঠলই যদি, নিজেকেই বা সে জানান দিচ্ছে না কেন?

ছাদ নেই, ভবতোষ তাই খুঁজল একতলাতেই। কোথাও সুধার ঠিকানা পাওয়া গেল না। রান্নাঘর থেকে একতলা—কতটুকু বা জায়গা—ঘুরে-ঘুরে বারে-বারে ভবতোষ দেখতে লাগল, কোথাও সুধা নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সদরের খিল খোলা।

একটা ছুরির ফলা ভবতোষের বুকের মধ্যে যেন দাগ কেটে দিল—তবে কি সুধা ঘরে নেই? দরজা খুলে গলির মোড় পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সে ঘুরে এল, একটা ঝাড়ুদারনী ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রীলোক দেখা গেল না।

ভবতোষ কি পাগল না অসৎ যে স্ত্রীকে অসতী ভাববে? নিশ্চয়ই আছে কোথাও বাড়ির মধ্যে। সদরে খিল দেয়া নেই, মানে দিতে ভুলে গিয়েছিল।

ফিরল ভবতোষ। ঢুকল শোবার ঘরে। ছেলে-মেয়েগুলো তেমনি ঘুমে, কিন্তু ওদের মা কোথায়? চেঁচিয়ে ডাকা যায় না, তবু ডাকল দুবার সুধা বলে। তক্তাপোশের তলাটা শুধু দেখতে বাকি ছিল, তাও দেখল। বাইরে যদি-বা গেছে, নিশ্চয়ই সেটাকে বাইরে বলে না? ফিরে আসবে এখুনি। রোদ ওঠবার আগেই। কিন্তু তাকে না বলে প্রায় রাত-থাকতে সদর খুলে সে বাইরে যাবে সেটাই বা কোন দিশি? রোজই যায় নাকি এ রকম?

কোনো কিছু হদিস রেখে গেছে কি না ভবতোষ তাই খুঁজতে লাগল ব্যস্ত হাতে। তক্তাপোশে তার তোশকের তলাটাই হচ্ছে সুধার চিঠিপত্র রাখার জায়গা। উলটে-পালটেও কোনো খেই পেল না কিছুর। শুধু সুধার নিজের বালিশের নিচে চাবির গোছাটা পড়ে

আছে। বুকটা কেঁপে উঠল ভবতোষের—চাবি যখন নেয় নি আঁচলে বেঁধে, তখন সে বুঝি আর ফিরে আসবে না।

চাবি দিয়ে ভবতোষ সুধার হাতবাক্স খুলে ফেলল। যা ভেবেছিল। সুধা আর নেই। সুধা তার হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি হাতবাক্সে রেখে গেছে।

ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই সুধার শেষ আভরণ। আর বাকি যা-কিছু ছিল কাগজের টুকরোয় পর্যবসিত হয়ে জঠরের আগুনে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। ঐ দুগাছি রেখে দিয়েছিল সে আয়তির চিহ্ন হিসেবে তত নয়, যত একটা কিছু বড় রকমের বিপদ-বিশৃঙ্খলার হাত এড়াতে। যদি বোমা পড়ে কোলকাতায় আর তাদের চলে যেতে হয় শহর ছেড়ে, তবে ঐ দুগাছি সোনার চুড়িই হয়তো তাদের কিছু দূরের পথ দেখাবে। তাই সব সময়ে হাতে রেখেও তাতে হাত দেয় নি সে কোনো দিন। সেই চুড়ি দুগাছ আজ তার হস্তচ্যুত! কী মানে দাঁড়ায় এর?

স্পষ্ট, অবধারিত। সুধাই গেছে আত্মহত্যা করতে। ভবতোষের আগে, ভবতোষকে কলা দেখিয়ে। তার পতিবত্নীত্ব বজায় রেখে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভবতোষ রাস্তায় বেরিয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। যতক্ষণ না জানতে পারে। যতক্ষণ না জানতে পারে ক্ষুধার দগ্ধশলাকা।

কোথায় যেতে পারে সুধা? কোথায় আবার! গঙ্গায় নিশ্চয়। জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। আর, সুধা সাঁতার জানে না। সন্দেহ কী!

বেশি দূর নয় গঙ্গা। গলি থেকে বেরিয়ে ডান দিক খানিক গিয়ে মোড় ঘুরলেই। প্রায় ছুটতে-ছুটতে ভবতোষ পৌছুল গঙ্গার ঘাটে। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। ভিড় জমেছে প্রাতঃস্নাতকদের। কোথাও সুধার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। না ঘাটে না জলে।

ভীষণ হৃতবল মনে হতে লাগল ভবতোষের। নিরাশ, নিরুৎসাহ। সে পারল না আগে মরতে। সে পারল না বাঁচিয়ে রাখতে তার আত্মহত্যার ইচ্ছা।

ফের ফিরতে হয় বাড়ি। কে জানে, হয়তো ফিরেই দেখতে পাবে

সুধাকে। গঙ্গা থেকে স্নান করে বাড়ি ফিরেছে ভেজাচুলে। উনুন ধরিয়েছে। কিন্তু তার পর, রাঁধবে কী? চাল কই?

তবু, সে ফিরেছে এই লালসাটি লালন করেই ভবতোষ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করল। দেরি করল খানিকক্ষণ। যেন ফিরতে সময় দিল সুধাকে।

হয়তো মন থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছাটাকে তুলে ফেললেই সুধাকে ফিরে পাবে সে। হঠাৎ এই জন-প্রবাহকে ভালো লাগল তার, ভালো লাগল রোদের প্রথম ঝাঁজ, খানিক পরে ফের মেঘলা হয়ে যাওয়া। সুন্দর বলে মনে হল সুধাকে। তার শরীরের ঠামটি মনে হল একটানে একটি লাবণ্যের রেখাঙ্কন। মৃত্যুর থেকে মুখ ফিরিয়ে আনতেই সাধ হল সুধাকে স্পর্শ করে।

বাড়িতে যে-চমক সে দেখবে বলে আশা করেছিল তা দেখল সে ছোট দুটোর কান্নায় আর বড়টার রুদ্ধ-শোক গাম্ভীর্যে। বড়টা মেয়ে, সাবিত্রী, বয়স দশ। ছোট দুটো ছেলে। সবশেষটা তিন বছরের। মাঝখানে দুটো কাটা পড়েছে।

কী, মা কোথায়? ভবতোষ জিগগেস করল সাবিত্রীকে।

বা, তোমরা তো একসঙ্গেই গেলে। তোমার সঙ্গেই তো মার ফেরবার কথা।

কী যে বলিস! আমি তো গেছলাম তাকে খুঁজতে। কোথাও দেখতে পেলাম না।

সাবিত্রী স্তম্ভিত হয়ে রইল। ছোট দুটো খানিক থেমে আবার উচ্চে তান তুলল। সবাইর ধারণা ছিল বাবা আর মা একসঙ্গেই ফিরে আসবে। কিন্তু বিপদের এমন চেহারাটা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। একটা হতবুদ্ধিকর ঘটনা। কোথায় যাবে কী করবে ছেলে-মেয়েগুলোকে কী প্রবোধ দেবে কিছুরই কিনারা করতে পারে না ভবতোষ। আর এটা এমন একটা হৈ-চৈ করবার মতোও ঘটনা নয়, ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করা যায় না। মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবে না আত্মহত্যা বলে। মুখে যাই বলুক, ঢোল পিটবে মনে-মনে।

তার চেয়ে গলায় দড়ি বেঁধে সিলিঙের কড়ায় ঝুলে থাকলেও যেন এমন কেলেঙ্কারি হত না। একটা প্রমাণের আরাম পেত অন্তত।

কাউকে বলা যায় না, তবে কী ব্যবস্থা করবে ছেলেপিলেগুলোর? কী খেতে দেবে তাদের? ইস্কুলেই বা সে যাবে কখন? তার পর, যোগাড় হয়েছে সন্ধ্যেয় একটা নতুন টিউশনি, তারই বা কী হবে? সর্বত্র রাষ্ট্র না করেই বা কী উপায়!

সূর্য মুহ্যমান হয়ে এল পশ্চিমে, তবু সুধার দেখা নাই। অঙ্কের মাস্টার কাশীনাথবাবু পাড়ায় থাকেন, তাঁরই বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া হল এ বেলা। তবু একটা ওজুহাত জুটেছিল তাদের অদৃষ্টে! ভবতোষ অভুক্ত। হয়তো সেই একই ওজুহাত।

কিন্তু কাল? কাল কি তার শূন্য হাঁড়ির খবর সে চেপে রাখতে পারবে? কিন্তু কালকের মধ্যেই কি সুধার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না?

সন্ধ্যের টিউশনিটা যে খোয়া যাবে এই ভবতোষের দুঃখ। ছাত্রের বাপ ভীষণ কড়া, পাঁচ মিনিট দেরি হলেই মাইনে কাটবার ভয় দেখায়, গোটা এক দিন কামাই করলে বরখাস্ত করবে। কোন কিছুই তো জানতে সুধার বাকি ছিল না।

শুধু টিউশনিটাই বা কেন? তার অবোধ ছেলে-মেয়ে, তার অযোগ্য স্বামী, ছন্নছাড়া সংসার।

বাড়িতে বাতি জ্বালবে কি না ভবতোষ ভাবছিল, দেখল কে আসছে গলি দিয়ে। নির্ভুল মেয়েছেলে। পরনে খাটো ফেঁসে-যাওয়া নোংরা কাপড়—পাড় আছে কি নেই চোখে পড়ে না—হাত গলা সব খালি, একহাঁটু ধুলো। যেন দাঁড়াতে পারছে না এমনি তার চলা, হাতে আবার একটা পুঁটলির ভার। ভবতোষ বেরিয়ে এল রোয়াকের উপর। সুধাই তো সত্যি।

কী যে হতে পারে সুধার, নিশ্বাস নিতে-নিতে কিছুই ভেবে উঠতে পারল না ভবতোষ। কাছে এসে শুধু জিজ্ঞেস করলে, এ কী?

সুধা বলল, চাল।

চাল? যেন ভবতোষ কোনো দিন নাম শোনে নি ও জিনিসের।

হাঁ, দু সের চাল পেয়েছি। সুধা হাসলে। অসীম ক্লান্তির মাঝেও যেন জয়ের একটু স্পর্ধা আছে লেগে।

যেন বহু দূর পথ পার হয়ে ভিক্ষে করে কুড়িয়ে এনেছে এমনি মনে হল ভবতোষের। বললে, পেলে কোথায়?

কনট্রোলের দোকান থেকে। রাত থাকতে গেছি আর ফিরছি এই সন্ধ্যেয়। তোমরা না জানি কত উতলা হয়েছ, সুধা হাসল অন্তরের স্বচ্ছতায়: কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলাম চাল না নিয়ে বাড়ি ফিরব না কিছুতেই। তাই মাঝখানে দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও লাইন ছাড়ি নি। কত ধাক্কাধাক্কি, কত ধস্তাধস্তি, তবু টলি নি এক পা, মাথার উপর তুমুল এক পশলা বৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে গেল। ষোল ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পেলাম তবে এই দু সের। উঃ, আমি তো কত লোকের ঈর্ষার বস্তু, কত লোকেই তো কিছু পায় নি, যারা দাঁড়িয়েছিল আমার পিছনে। পুরুষের লাইনেও তাই। আমিও নিলুম, আর বললে, ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু এমন একটা বিশ্রী পোশাকে গিয়েছিলে কেন? হাত-পা খালি, পরনে আমার তেল মাখবার ধুতিটা। গায়ে জামাও নেই বুঝি কোনো?

বস্তির ঝি না সাজলে কি দাঁড়ানো যায় কনট্রোলের লাইনে? দিগ্‌বিজয়িনীর মতো চালের পুঁটলি নিয়ে সুধা বাড়ির মধ্যে চলে গেল। মাকে ফিরে পেয়ে ছেলেমেয়েগুলির উত্তালতা তখনো থামে নি, গলির মুখে ভবতোষ দেখতে পেল একটি পুরুষমূর্তি। দ্বিধায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে, গলিতে ঢুকবে কি ঢুকবে না। শেষ পর্যন্ত ঢুকল, আর এগিয়ে এল কি না ভবতোষের বাড়ির দিকে।

আধাবয়সী, কিন্তু যেন ঠিক ভদ্রলোকের পর্যায়ে পড়ে না। যদিও গায়ে একটা ছেঁড়া ও কুঁচকোনো চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি। দাড়ি কামায় নি কত দিন। চুলগুলিতে চিরুনির আঁচড় নেই। চাউনিটা কেমন যেন ঘোলাটে, অপরিচ্ছন্ন।

এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে লোকটা জিগগেস করল: এ বাড়িতে একটি মেয়েছেলে ঢুকেছে এখুনি?

মুহূর্তে ভবতোষ রুক্ষ হয়ে গেল। বললে, হাঁ, কেন?

কি-ভাবে যে বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে আগন্তুক বললে, তাকে আমার দরকার।

দরকার? রাগে কঠিন হয়ে উঠল ভবতোষের গলা: তাকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ, না, ঠিক চিনি না, তবে—লোকটা আমতা-আমতা করতে লাগল।

ভবতোষ ফণা-তোলা সাপের মতো বিষিয়ে উঠল: আরো দুটো গলি ছেড়ে দিয়ে শুঁড়িখানার কাছে থামের তলায় আপনার চেনা জিনিস পাবেন। যান সেখানে। এটা বস্তি নয়, গেরস্থ-বাড়ি। যাকে ঝি ভেবে পিছু নিয়েছেন, সে ঝি নয়, ভদ্রলোকের স্ত্রী।

লোকটা যেন তবু এক কথায় চলে যেতে প্রস্তুত নয়। দোমনা করছে—ঘুর-ঘুর করছে।

কেলেঙ্কারি বাধাবেন না বলছি। ভালোয়-ভালোয় বেরিয়ে যান গলি থেকে, নইলে পাড়ার লোক জড়ো হলে ঘাড়ের উপর মাথাটা আপনার সোজা থাকবে না বলে রাখছি। আমি অভুক্ত আছি বটে, কিন্তু পাড়ার আর সবাই আমার মতো এত নিস্তেজ হবে না বলেই বিশ্বাস। মারবে তো বটেই, পুলিসেও ধরিয়ে দেবে।

আমারই ভুল। মাপ করবেন। লোকটা আবার সস্পৃহ চোখে তাকাল চার পাশে। তার পর চলে গেল।

কারু সঙ্গে একটা কিছু উত্তেজিত বচসা হচ্ছে এমনি আভাস পেয়ে সুধা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রোয়াকে। বললে, সেই লোকটা এসেছিল বুঝি?

কে লোকটা? আপাদমস্তক জ্বলে গেল ভবতোষের।

সেই চীনে-সিল্কের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক? এরি মধ্যে গাঢ় পরিচয় হয়ে গেছে দেখছি।

কী যে বল তার ঠিক নেই। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ বুঝি?

সুধা যেন কণ্ঠস্বরে তাকে খুঁজছে।

না, তাকে আমার খাট ছেড়ে দিতে হবে। ভবতোষ গলার আওয়াজকে কুৎসিত করে তুলল: ওটা একটা বদমাশ, তোমাকে ভেবেছে বস্তির ঝি।

তা যা খুশি ভাবুক, কিন্তু আমিই তো ডেকে এনেছিলাম।

কাছাকাছি বোমা পড়লেও ভবতোষ এত চমকাত না। বললে, তুমি ডেকে এনেছ? কেন জানতে পারি?

চারটি ওকে খেতে দেব বলে। ও আমার সামনেই ছিল, পুরুষের লাইনে। আমার নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোকান বন্ধ হয়ে গেল, আর ও আমার চোখের উপর মাটিতে ভেঙে পড়ল টুকরো-টুকরো হয়ে। বললে, বাড়িতে বসে আছে সবাই চালের প্রত্যাশা করে, সে গেলে তবে উনুন ধরবে। তবু তো স্ত্রী-পরিবারকে একবেলা আধপেটা সে খাওয়াচ্ছিল, কিন্তু নিজে সে উপোস করে আছে প্রায় চার দিন। পাছে ওদের ভাগে কম পড়ে তাই মিথ্যে করে বলত যে বন্ধুর ওখানে তার নেমন্তন্ন। কিন্তু চার দিনের উপোসের পর নেমন্তন্নের কথা নাকি আজ সে কিছুতেই বলতে পারবে না। তাই আমি ওকে বলেছিলাম, চলুন আমার ওখানে, অন্তত ভাত খাবেন আপনি পেট ভরে। প্রথমটা বিশ্বাস করে নি। পরে বিশ্বাস করলেও রাজি হতে পারে নি। স্ত্রী-পুত্রের জন্যে চাল না নিয়ে গিয়ে নিজে ভাত খাবে লুকিয়ে, হয়তো যন্ত্রণা হচ্ছিল, কিন্তু জঠরের যন্ত্রণা তার চেয়েও ভয়ানক। আহাহা, তাড়িয়ে দিলে তুমি? সুধা গলা বাড়িয়ে তাকাল এদিক-ওদিক।

আস্তে আস্তে একটা তীব্র, ঘন, উগ্র গন্ধ ভবতোষকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। যেন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে এখুনি। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে।

না, ও কিছু নয়। ও শুধু উনুনের ধোঁয়া।

বাঁশবাজি

খোড়গাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমে নি, মালপত্রও বিশেষ কিছু নেই। তেলে ভাজা দুর্গন্ধ পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সকলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝবার জন্যে কালোর দু-একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি-চ্যাঙারি, খারা-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুড়ি, সরা-মালসা, কলকে-ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, ঝিম-মারা। যেন কী একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলায়-বলায় ফুর্তি নেই এক রত্তি! পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে!

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম! শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না।

আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব। আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়স, পেঁকাটির মতো হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মতো অসহায়।

ব্যাপার কি ? কাঁদছে কেন ?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে, তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

বাঁশগাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনেছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখি নি তখনো!

মাটিতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা ? কে একজন জিগগেস করলে।

না, এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে ভারিক্কি গলায়, না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে-বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন-বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মতো ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা!

ঐ বুড়ো বুঝি ?

হাঁ, ওই মস্তাজ।

শনের দড়ির মতো পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক-গাছ দাড়ি রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা চিপলে মতন, পেটটা দ-পড়া, হাত-পায়ের মাংগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁচকানো চোখ দুটো তার চকচক করছে—সেইটুকুই তার যা-কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মস্তাজ সবাইর কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

খেলা শুরু হল না আগেই পয়সা ? কে একজন ধমকে উঠল।

খেলা হয় কী করে ? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে রসাতল করছে। পড়ে যাব, মরে যাব—এ কেমনতর কান্না ? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে ?

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের ভ্রূক্ষেপ নেই। হবে, হবে, শুরু হচ্ছে এখনি। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে শূন্য মগ দেখিয়ে-দেখিয়ে ঘুরে যায়।

খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা? জিগগেস করলাম পাশের লোককে।

এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।

তবে কে ছিল এতদিন?

ওর দাদা—

না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু-একবার। কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। সরস্বতী পূজার সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয় নি—বেয়ে-বেয়ে চুড়োয় উঠে আসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর দাদাই। আর যাই বলুন, আসল কসরত যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধরে রাখে তার—মস্তাজের।

কই ওর দাদা?

কে জানে।

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেল না দেখে কেউ পয়সা দিতে রাজি নয়।

অনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছেলেটা। না না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—!

বাপ একবার তার হাত ধরে টান মারল হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচাল একবার।

হেঁ, ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে দিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না, পুঁচকে একরত্তি ছেলে। বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ কেউ তিরস্কার করলে।

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দুহাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে, উঠে আয়।

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজী হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু-একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণুর মতো গলা উচিয়ে তাকাল একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপর।

ওই ওর দাদা। জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চার পাশে, গালে ও থুতনির নিচে কাটা ঘা, একটা ঢনঢনে মাছি বারে-বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা-ভাসা চোখে কেবল একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাইর কাছে এগিয়ে গেল। বললে, তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে-দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুণ্ডলের গর্তে। কী যেন বলল বিড়বিড় করে। বোধ হয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কী বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখে নি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

চলে আয়, ইন্তাজ। ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেঁটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি আঁতকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগদগ করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চনচনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা? জিগগেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়িতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারে নি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারে নি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ, সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক-পেট ছড়ে-কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

ক্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না? জিগগেস করল মস্তাজ।

না। দু হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে চেয়ে উঠতে লাগল। দু হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মস্তাজ।

দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।

আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের

কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্তে। তখন তার ঘাগুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখলাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম, চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, তার পর যখন ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্তে তখন ওসব ঘা-টা কিচ্ছু দেখা যাবে না।

বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি ?

কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।

নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগবাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাতুরি কী! আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে শুরু করেছে মস্তাজের তুহাতে। চোট খাবার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মতো। হাত-পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাতুড় না চামচিকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম মস্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তার পর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশি দেখবার মতো। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্তে মস্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরি হয় নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুঁটে-ঘুঁটে ঘুরছে না জানি কোন জলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম—ইস্তাজ ফসকাল না, মস্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দুহাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মস্তাজ, কিন্তু যতই ফুরফুরে পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইস্তাজকে।

—আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মস্তাজ দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দৌড়-খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মতো ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা শুরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপর কি চামদড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, থুত্থুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছু সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা—সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইস্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলুম না। কেউ বললে, হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইস্তাজকে ধরাধরি করে কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্য সদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেবার সময় এক আনা করে পয়সা দিতে পারত না মস্তাজ। যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না, পেটের ভিতরের ঘা।

মস্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কা

কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠে। এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নির্ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি।—

মস্তাজ কিছুই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

পড়ে যাব, মরে যাব। কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি!

মস্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কী, তাকে খেতে হবে তো।

সাহেবের মা

তোমার নাম কী ?

সাহেবের মা।

নাম শুনে সুমারনরিশ একটু চমকাল বোধহয়। বোধহয় বা চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে। ঘর-দোরের সঙ্গে।

এখন আর অবিশ্যি ঘর নেই। সমস্ত বেড়াটাই এখন দরজা হয়ে গেছে। দাবার উপর আছে একটু চালের অবশেষ। বাঁশে দুটো খুঁটি আছে এখনো আঁট হয়ে। একটাতে ঠেস দিয়ে বসে আছে সাহেবের মা। বুড়ি, আধ-পাগলা। হাতের কাছে একটা শুকনো শূন্য বাটি।

কে আছে তোমার ?

কেউ না।

কে ছিল ?

তিন ছেলে ছিল। আর ছিল আল্লা।

কেউ নেই ?

কেউ না।

অমূল্য থামল। বললে, গেল কিসে ?

তিনটেই খেয়ে!

খেয়ে ?

হ্যাঁ, অখাদ্য খেয়ে। ঘাস-পাতা ছাতা-মাথা খেয়ে। এখানে-ওখানে যেখানে যা পেয়েছে তাই পেটে ঢুকিয়ে। শত্তুরদের পেটে কী যে দস্যু খিদে ছিল—

শেষ পর্যন্ত তো কলেরাতেই মারা গেল—

তাই লেখ। ওরা যখন নেই তখন কে বলতে আসছে কিসে ওরা গেল?

কিন্তু আল্লা কোথায়?

সে গেছে তোমাদের পকেটে। কোঠাবাড়িতে।

অমূল্য হাসল। বললে, কি করে খাও এখন?

পা দিয়ে বাটিটা ঠেলে দিয়ে বললে সাহেবের মা, ভিক্ষে করে।

শোন। যার জন্যে আমি এসেছি—

এই পাশের গাঁ, ডুমুরতলায় একটা তাঁতখানা বসেছে, সঙ্গে আছে চাচবাঁখারির কাজ, তালবেতে মোড়া-চেয়ার টুকরি-টুপি বানান। কি হবে ভিক্ষে করে? তুমিও এস না, কাজ করবে আমাদের সঙ্গে।

আঙুলের গাঁটে-গাঁটে চামড়া আছে কুঁচকে। বুড়ি বললে, আমি কী কাজ করব?

কেন, কাগজের ঠোঙা বানাবে। শিখিয়ে দেব আমরা। খাওয়া পাবে মাগনা। আর রোজ পয়সা পাবে ছ-আনা করে।

সাহেবের মা জগৎসংসারকে বিশ্বাস করতে চাইল না। খাওয়া, খাওয়ার উপরে আবার ছ-আনা পয়সা?

হ্যাঁ পয়সা দিয়ে আবার তোমার ঘর তুলবে। কথাটা বলতেই অমূল্যর কেমন ফাঁকা ঠেকল বুকের ভেতরটা। সেই তৈরী ঘরের তীক্ষ্ণ শূন্যতার নিশ্বাস লাগল তার হাড়ের মধ্যে।

ঝড় নেই, তুফান নেই, বান-বন্যা নেই, অথচ ঘর পড়ে গেছে। যেন কতকগুলো বুনো নেকড়ে দল বেঁধে চলে গিয়েছে এখান দিয়ে, সব দলে-পিষে ছত্রাকার করে দিয়ে। ক্ষুধার নেকড়ে।

বুড়ি রাজী হয়ে গেল সহজেই।

কে না রাজী হয়! মাগনা খাওয়া পাবে, উপযুক্ত মজুরি পাবে, রাজী না হবার কোনো মানে হয় না।

চাঁড়ালরা রাতে ঢেঁকিতে চিড়ে কুটত, এখন কেরোসিন পায় না, জ্বলে না আর টেমি বা বাঁশের চোঙার কুপি। তারা এল। সরবে

নেই, ঘানি ঘুরছে না কলুদের, তারা এল। সিউলিরা তাল-খেজুরের গুড় তৈরি না করে তাড়ি তৈরি করছে, এল তারা কেউ-কেউ। কাগজীরা খড়-বাঁশ-শর যোগাড় করলেও পাচ্ছে না কাগজ-তৈরির মশলা, তারাও নাম লেখাল।

গ্রামের পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। শ্মশানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গঞ্জ-গোলায়। পাণ্ডুরকে শ্যামলে।

কাঁচা মাটির ঘর উঠেছে কতকগুলো, কঞ্চিতে কাদার চাপড়া লাগান দেওয়াল। তাঁত বসেছে ক-খানা, তৈরি হচ্ছে গামছা আর টেবল-ঢাকা। তৈরি হচ্ছে বাঁশের মোড়া আর ঝুড়ি, থাল্লা আর ডোল, টপুর আর ধানের হামার। তৈরি হচ্ছে কাগজের ঠোঙা। লাগোয়া জায়গায় তৈরি হচ্ছে শাক-সবজি।

অমূল্যর ভীষণ উৎসাহ। সরকারী সহানুভূতি পর্যন্ত সে আদায় করেছে। যারা শহরে-গাঁয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে নিজেদের মান-মুনাফা ঠিক রেখে বাঁধা-বাঁধা বুলি কপচায় তাদের কাউকে টেনে নিয়ে এসেছে এই কাজের ঘূর্ণিপাকে। কিন্তু এক-এক সময় বড় শ্রান্ত লাগে অমূল্যর। মনে হয় নিজেকে স্তোক দিচ্ছে সে। গ্রামের উজ্জীবন! কিন্তু গ্রামকে ধ্বংস করল কে? আজ গ্রামকে খাড়া করলে কালই যে সে ফের ধ্বংস হয়ে যাবে না তার ঠিক কি? আজ রুগ্নের মুখে জল দিচ্ছে। কিন্তু রোগ যাতে চিরদিনের মতো উচ্ছেদ হয়ে যায় তার সে করছে কী?

বিশাল বটগাছের তলায় বসে থাকে সে নিরিবিলি।

না, এই বা কম কী! ঐ যে থাবা-থাবা খাচ্ছে এখন সাহেবের মা।

সাহেবের মা হামড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের পাতের উপর। ভাবে, খাওয়াটা কত সহজ, কত জানা জিনিস। ধান কেঁড়ে চাল ফুটিয়ে ভাত, ফেনালো ভাত, আর যদি দাও একটু নুনের ছিটে। আর না-খাওয়াটা কত রাজ্যের পথ, আর কী নির্জন সে পাথরের রাস্তা! তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হয় সাহেবের মাকে, আর সবাইকে পিছে ফেলে। খিদের

তাড়নায় নয়, ভূতের তাড়নায়। তিনখানা কঙ্কালসার হাত তার দিকে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে।

এরা একবেলা খেতে দেয়। স্বাদ পেয়ে সাহেবের মায়ের সাধও যেন বেড়ে যায়। নগদ পয়সার থেকে সে খই কেনে, চিনির বাতাসা কেনে। কিছু খায় কিছু রেখে দেয় কাগজের ঠোঙায়।

সেদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ একটা সোরগোল উঠল। শোনা গেল মোটরের ঝকঝকানি।

সাহেব এসেছে, সাহেব এসেছে।

ঠোঙা বানাচ্ছিল সাহেবের মা। তার পাশে ছিল মোক্ষমণি। সে বললে ফিসফিসিয়ে, তোর ছেলে এসেছে, সাহেবের মা।

ছেলে? সাহেবের মা চেঁচিয়ে উঠল।

শুনছিস না সাহেব এসেছে? তুই যদি সাহেবের মা হোস, ও তো তবে তোর ছেলে! মোক্ষমণি হাসল মুখ টিপে।

আশ্চর্য, তার একটা ছেলের নামও সাহেব ছিল না। মেনাজ, ইছব আর সদরালি—তার তিন ছেলে। একটার নামও অন্তত সাহেব থাকা উচিত ছিল, নইলে কিসের সে সাহেবের মা? উপায় কি, যখন বাপ তার নাম রেখেছে, তখন কোথায় সাহেব। বাপ তার ভুঁই রুইত, বোধ হয় আশা করেছিল নাতি তার লাটসাহেব হবে। অন্তত আশা করেছিল সাহেব নামে সৌভাগ্য আসবে তার মেয়ের সংসারে।

সে সাহেবের মা, অথচ ছেলে তার কেউ সাহেব নয়, এই অসঙ্গতিটা আজ কেমন লাগল তার বুকের মধ্যে।

জীবেশ এ মহকুমার ছোকরা মুনিব। এসেছে পরিদর্শনে।

তাকে পেয়ে অমূল্য মহা খুশি। কৃতকৃতার্থ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাচ্ছে সব কাজকর্ম। তাঁতের, বাঁশ-বেতের, ঠোঙা-ঠিলির।

খুব ভালো কাজ হচ্ছে। দাঁত চেপে বললে জীবেশ মুরুব্বিয়ানার স্বরে।

তবে আরো দেখুন। এই শাকপাতাড়ের খেত। ফুল যা দেখছেন সব আহার্য ফুল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজ এই পর্যন্ত থাক। জীবেশ মৃদু হাস্যে আপত্তি করল।

আর একটু। এই দেখুন বাঁশের জাফরির কাজ। গোলোকধাঁধা নক্সার সিলিং।

এবার যাই অমূল্যবাবু। আফিস থেকে এখনো বাড়ি যাই নি। খিদে পেয়ে গেছে।

এ ছেলেমানসি ধরনের কথাটা কেউ তেমন খেয়াল করল না, কিন্তু লাগল গিয়ে ঠিক সাহেবের মার হৃৎপিণ্ডে। সন্দেহ কি, এ তারই ছেলে। বলছে, খিদে পেয়েছে। বলছে, খেতে দাও কিছু।

কার কাছে বলছে?

কার কাছে আবার! সন্তান আবার কার কাছে বলে!

সন্দেহ কি, এ তারই ছেলে। পোষাক-আসাক বদলে যেতে পারে, বদলে যেতে পারে ধরন-ধারন, কিন্তু গলার স্বর বদলায় নি একটুও। বলে, খিদে পেয়েছে, খেতে দে, মা। তার মেনাজ-ইছব-সদরালি না হতে পারে, কিন্তু তার সাহেব,—যে ছেলে তার মরে নি এখনো ক্ষিদেতে ধুঁকছে, কিন্তু মরে নি এখনো। সে যে মা, সাহেবের মা।

জীবেশ উঠছে তার মোটরে, সাহেবের মা কাগজের ঠোঙায় চিনির বাতাসা নিয়ে এল তার সামনে। ঠোঙাটা মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, নে, খা।

জীবেশ পিছিয়ে গেল দুপা। সবাই বোকা, হতভম্ব হয়ে গেল।

তোর খিদে পেয়েছে বলছিলি না? নে খা, খিদের কাছে আবার লজ্জা কী।

আশে-পাশের লোককে জীবেশ জিগ্‌গেস করল, কে এ?

সবাই বললে, পাগলি।

ছেলের খিদের কথা শুনে কোন মা না পাগল হয় শুনি? সাহেবের মা হাসল অদ্ভুত করে: নে, হাঁ কর, আমি খাইয়ে দি হাতে করে।

জীবেশ তবু মুখ ফিরিয়ে রইল। সবাই হাই-হুই করে সাহেবের

মাকে চেষ্টা করল হটিয়ে দিতে। কেউ বা টানল তার হাত ধরে। অলে হঠাৎ চোখ দুটো তার খুব উজ্জ্বল দেখাল। বললে, আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না সাহেব? আমি যে তোর মা—সাহেবের মা। আমার একটা ছেলে এখনো বেঁচে আছে, কাঁদছে খেতে দাও বলে! আর তুই—

না, চিনতে পেরেছে। সন্তানকে মা চিনলে মাকে সন্তান চিনবে না? জীবেশ দরজা খুলে দিল মোটরের। বুড়িকে তুলে নিল ভিতরে।

লোকে যা ভেবেছিল তার উলটো হল। ভেবেছিল বুড়িকে হাতের ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে চলে যাবে জীবেশ, কিন্তু না, একেবারে তুলে নিল গাড়িতে। দয়ার শরীর আছে সাহেবের।

বা, ও সাহেব যে। মার ছেলে। বলে উঠল মোক্ষমণি।

তার বাবা আর তার নাম মিথ্যে রাখে নি। তার সাহেবের কত সুন্দর বাড়ি, কেমন সুন্দর বাগান। কেমন চমৎকার হাওয়া-গাড়ি।

বাড়িতে পা দিয়েই জীবেশ চেঁচিয়ে ডেকে উঠল: মা, মা। ডাকতে-ডাকতে চলে গেল ভিতরে।

ডাকটা একটা দগ্ধ শেলের মতো লাগল এসে সাহেবের মার বুকে। এ যেন অন্য রকম। এ যেন আনন্দের ডাক, অহঙ্কারের ডাক।

বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাহেবের মা তাকাতে লাগল চার পাশে, ঝাপসা অন্ধকারে। তার চোখে যেন আর সেই আশ্বাস নেই। কেমন ভয়-ভয় ভাব। যেন কোন অজানা বিরানা জায়গায় চলে এসেছে সে। যেন বালির উপরে রোদ্দুরে তার জলভ্রম হয়েছে।

এই যে মা, এই যে। ভারি অদ্ভুত—তার সাহেব বাড়ির ভিতর থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে আর কাউকে।

তারই মতো বুড়ি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। সত্যিকারের মার মতো। পিরতিমের মতো। কাঁচা-পাকা চুলে লাল টকটকে সিঁদুর, চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি, গা ভরা গয়না। ঝকমক করছে, গনগন করছে।

আহা, বেচারী— জীবেশের মা বললেন সাহেবের মাকে। নিজে খেতে পাচ্ছিস না, তাই পরের খিদেয় প্রাণ পোড়ে। বোস্, সরে বোস ওখানটায়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসছি আমি। আর, কাপড় নিবিনে একখানা? বোস বোস ওই নিচে নেমে।

জীবেশ ও জীবেশের মা চলে গেল ভিতরে।

ছেলেকে খেতে দিয়ে জীবেশের মা বুড়ির জন্যে কলাপাতায় করে খাবার নিয়ে এলেন, নানারকম খাবার; কিন্তু বুড়িকে কোথাও দেখতে পেলেন না। না বারান্দায়, না বা নিচে, বসতে বলেছিলেন যেখানটায়। অন্ধকারে চলে গিয়েছে কোন দিকে। শুধু একটা কাগজের ঠোঙা রেখে গিয়েছে দরজার কাছে। তাতে কটি ভাঙা গুঁড়ো-গুঁড়ো চিনির বাতাসা।

বৃত্তশেষ

পেয়াদা-বাবু এসেছেন। ঘাটে-বাটে লোক জমে যাচ্ছে। কেউ কেউ বা গা-ঢাকা দিচ্ছে ভয়ে ভয়ে।

ইস্তাহার আছে, দখল আছে, অস্থাবরও আছে এক নম্বর।

অস্থাবরটা ক্ষেত্র দুয়ারীর নামে। দোয়া গাই, বকনা বাছুর, এঁড়ে দামড়া—কিছুই বাদ দেবে না। পোয়াল-কুড় পর্যন্ত।

যতই পেয়াদা-বাবু হোক, ক্ষেত্র চেনে মনোরথকে। এককালে সরিক ছিল তারা। উলুমাঠ ভেঙে চাষ করেছিল দুজনে। চাষকারকিত ছেড়ে দিয়ে মনোরথ চলে গেল সদরে, ঘুস-ঘাস দিয়ে আদালতের রাত-পাহারার কাজ নিলে। এদিকে জঙ্গল উঠিত হল, তবু মনোরথ ফিরে এল না। রাত-পাহারা থেকে হল সে আদালতের সেপাই, চাপরাশটা কখনো কাঁধে, কখনো কোমরে! ক্ষেত্র সেই যে-কে-সে চাষা, সেই ধান ছিটেন করে, বীজপাতার চাতর দেয়। থাকে খোড়ো ঘরে। মাটিতে গা পেতে।

আমি ক্ষেত্তর।

মনোরথ চিনতেই পারে না। তার এখন অনেক সম্মান। পায়ে জুতো, সঙ্গে দোত-কলম। ভাবটা ছোটলাটের মতো।

অণ্ডিম্যাণ্ড হ্যাণ্ডনোটের মামলা। ডিক্রি জারিতে পাওনা সাতান্ন টাকা সাড়ে তেরো আনা। মনোরথ নিশানদারকে সনাক্ত করতে বলে।

ওরে মনো, চেয়ে দেখ। আমি ক্ষেত্তর—

গরজারি করিয়ে দিতে হলে দু টাকা লাগবে। মনোরথ বলে কানে কানে।

আমার গলায় ছুরি দিবি? মরলে হাঁড়ি ফেলতে হয় যেখানে—

মনোরথ ও-সব ছেঁদো কথায় কান দেয় না। ডিক্রিদারের থেকে সে টাকা খেয়েছে। সে পরোয়ানার মর্ম পড়তে শুরু করে।

ভর-বয়সের বলদ, হাঁসা রঙ, হেলা শিঙ, লেজ ভাঙা—

ওরে, মনো, চার আনা নিয়ে ছেড়ে দে। মনে করে দেখ, দুজনে ভুই রুইতাম একসঙ্গে। ধান এবার অপুষ্ট ও দাগী হয়েছে, নোনা উঠেছে জমিতে। চার আনা পয়সায় দুবেলার খোরাকি হত—

অন্যায় মনোরথ করতে জানে না। সে কর্তব্য করতে এসেছে। টলাটলির ধার ধারে না সে।

একটা গরু ধলো, আরেকটা ধুসো। বাছুরটা পাটকিলে। ডিক্রি-দারের লোক জামিনদার হয়ে ধরে নিয়ে গেল। দুর্বল নাচারের মতো তাকিয়ে রইল ক্ষেত্র। মনোরথ যেন নবাব-নাজিম, আর সে বাজে-মার্কা। চুনোপুটির চেয়েও ছোট।

নাজির বললে, এ সাঁটে এবার দুটাকা দিতে হবে।

মনোরথ বললে, আট আনা।

আধুলিটা অতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার ভালো হাওলা পেয়েছে মনোরথ, অনেক শাঁসালো পরোয়ানা। দখল, ইস্তাহার, অস্থাবর। সমন-নোটিশের তো কথাই নেই। রিটার্নের দিন পেয়েছে লম্বা। এবার হাত ছোট করলে চলবে কেন?

গরিব-গুর্বো লোক, বাবু, পেরে উঠব না। ছেলেটার আমোশা হয়েছে, ডাক্তার নিয়ে যেতে হবে টাকা কবলে।

তাতে অতুলের কি? যা রেওয়াজ তা বজায় না রাখলে চলবে কেন?

বারো আনা বাবু—মনোরথ হাত কচলায়।

অতুল ফিরেও তাকায় না। তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে থাকে।

না, আর দরবিট করতে পারে না মনোরথ। যা হয় হবে, আর দিতে পারবে না সে নজরানা।

কিন্তু এত দূর যে হবে ভাবতে পারে নি সে কখনো। অতুল তার রোজনামচা নিয়ে পোকা বাছতে শুরু করেছে। কশানা পরোয়ানায় দিন মেরে দিয়েছে সে। গরহাজির জারি করেছে লটকে, অথচ বিবাদীর নাম নেই। বাঁশের আগালে পুঁতে দখল দিয়েছে, অথচ ঢোলসহরৎ হয় নি। মোকাবিলা সাক্ষীরা দেয় নি কেউই টিপটাপ। চৌকিদার-দফাদারের টিকিরও সন্ধান করে নি। এমনি অনেক বায়নাক্কা।

মস্ত নালিশের মুসাবিদা করছে অতুল।

মনোরথ অতি কষ্টে এবার দুটো টাকাই বের করে দেয়। অতুলের নজর এখন আরও উঁচুতে উঠেছে। তার মেহনতের দাম এখন আট টাকা।

গলায় কাপড় জড়িয়ে নেয় মনোরথ। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, রিপোর্ট করলেই সস্‌পেণ্ড হয়ে যাব বাবু। আপনার তাঁবে আছি আমরা। আপনি না দরগুজর করলে—

কোনো অন্যায় করছে না অতুল। সে তার কর্তব্য করছে। যত ঢিলেমি যত জোচ্চুরি—সমস্ত কিছুই তার চৌকি দেবার কথা। মাঝে-মাঝে খবরদারি না করলে কেউই সজুত থাকবে না।

মনোরথ ছুটো-ছাটা কাজ করে দিয়েছে অতুলের। গাছে উঠে নারকোল পেড়ে দিয়েছে। মফস্বল থেকে ডিম নিয়ে এসেছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। ঘাটের নৌকা থেকে চালের বস্তা মাঝির সাথে হাত-ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মাচার উপর। সেবার তার মেজ ছেলেটার দমকা জ্বর হলে সমস্ত রাত জলধারানি দিয়েছিল সে একটানা।

কর্তব্যের কাছে আর কিছুর স্থান নেই। নালিশ নিয়ে অতুল চলে গেল হাকিমের খাসকামরায়।

এ পাটালিখানার দাম কত নাজির বাবু? হাকিম জিগগেস করলে অতুলকে।

সাড়ে দশ আনা দাম দু পয়সা কমিয়ে অতুল বললে, দশ আনা।

ওঃ! পকেট থেকে হাকিম দশ আনা পয়সা গুণে দিলেন। গোণাটা ভুল হল কিনা দেখবার জন্যে অতুলের হাতের চেটো থেকে পয়সাগুলি তুলে নিয়ে আরেকবার গুণে দিলেন।

তবু অতুল পাটালির দাম গ্রহণ করল।

তালবেতের সুন্দর-সুন্দর মোড়া পাওয়া যায় এখানে, কয়েকখানা যোগাড় করে দিতে পারেন?

অতুল পারে না কী। রঙ-বেরঙের মোড়া যোগাড় করে দিলে। ক্ষীরোদবাবু মহা খুশী। হাত বুলিয়েবুলিয়ে- দেখতে লাগলেন। কিন্তু অতুল হঠাৎ তাঁর খুশ মেজাজ চুরমার করে দিল। বললে, দাম সাড়ে চার টাকা।

খড়ের আগুনের মতো জলে উঠলেন ক্ষীরোদবাবু। এত সব রঙচঙে আনবার কী হয়েছিল? আরেকটু ছোট দেখে আনলেও তো পারতেন।

দপদপে খড়ের আগুন ক্রমে ক্রমে গুমরানো তুষের আগুনে এসে দাঁড়াল। সাড়ে চার মাস পর অতুল দামের কথাটা মনে করিয়ে দিল।

ঘুরুনে বাতাসে অতুল হঠাৎ জলের ঘুরুলে পড়ে যায়। তার বিরুদ্ধে আসে উড়ো চিঠি। উপর হতে হুকুম আসে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

ক্ষীরোদবাবু বড় করে ঘুরান-জাল ফেলেন। শোল-বোয়াল অনেক অনেক অকীর্তিই এসে আটক পড়ে। এতদিনে বাগে পেয়েছেন ভেবে মনে-মনে যেন বিশ্রাম পান।

শিরদাঁড়া নরম করে অতুল পাশে এসে দাঁড়ায়। খানিকটা বাঁকা ও অনেকটা কুঁজো দেখায়। শার্টের হাত দুটো রোজ কনুইয়ের কাছে গুটোনো থাকে, আজ কবজির উপর নামিয়ে এনে বোতাম এঁটে দিয়েছে।

কিন্তু এর আর ছাড়াছাড়ি নেই। দফায়-দফায় চুরি। নিলেমে নৌকো ভাড়ায়, সাক্ষীসাবুদের খোরাকি ও রাহা-খরচে। পিওনদের মাইনের উপর উনি মাসওয়ারি মাশুল বসিয়েছেন। আস্ত কড়িকে অন্তত কানা না করে কারু সাধ্যি নেই বের করে ওর খপ্পর থেকে।

সংসারের সমস্তই কি কর্তব্য? মায়া-মহব্বত বলে কিছুই কি নেই দুনিয়ায়?

এ যাত্রা ছেড়ে দিন। পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে-পড়তে অতুল থেমে যায়।

কত যে কাজ করে দিয়েছে ক্ষীরোদবাবুর। প্রথম যখন আসেন, মালপত্র এসে পৌঁছয় নি, শিল-নোড়া, বালতি ও বঁটি যোগাড় করে দিয়েছে। এখনো খোঁজ করলে তার একটা মগ পাওয়া যাবে, একটা বাচ্চা হ্যারিকেন। ভাঙা অপবাদ দিয়ে যা আর ফেরান নি তিনি, ফেরাবেনও না কোনদিন। খুচরো নেই বলে একবার এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়েছিলেন তাকে দিয়ে, সে টাকা আর ইহজীবনে ভাঙানো হল না। কৃতজ্ঞতা বলে কিছুই কি নেই?

না, নেই, এমনি দোর্দণ্ড ক্ষীরোদবাবুর গোঁপ। সমস্ত অন্যায় ও শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তা উদ্যত বাঁশ ঝাড়।

যা থাকে অদৃষ্টে, পায়েই সে পড়বে আচমকা। কিন্তু তার নিচের লোক কী ভাববে? দেয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে যে মনোরথ-মেনাজদ্দিরা।

সাহেব এসেছেন পরিদর্শনে।

ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে পড়তেন এক কলেজে। বসতেন এক বেঞ্চিতে। থাকতেন এক হস্টেলে, এক ঘরে, পাশাপাশি তক্তাপোশে। তিনি খাস্তগির, উনি দস্তিদার।

এখন একেবারে চিনতেই চান না সাহেব। কর্মবাচ্যে কথা কন। আর যখন কর্তৃবাচ্যে আসেন তখন তাঁর একেবারে সংহারমূর্তি।

আপনার টাইপ রাইটার আছে?

না—

তোমার আবার টাইপ-রাইটার থাকবে—তুমি যা হাড়-কিপটে। সাহেবের চোয়ালের হাড়টা আঁট হয়ে ওঠে।

ঘুস নিই না, ছেঁচড়ামো করি না, তাই কিপটেমি না করে উপায় কী—ক্ষীরোদবাবু দাস্তে হয়ে রইলেন।

খবর এল, খেয়া পেরুবার সময় সাহেবের মনিব্যাগটা জলে পড়ে গিয়েছে। বেশি নয়, শ খানেক টাকা।

না, না, আপনাদের কাউকে ব্যস্ত হতে হবে না। অবিশ্যি, সদরে গিয়েই আমি পাঠিয়ে দিতুম ফেরত ডাকে। না, তবু আপনাদের ব্যস্ত

করে লাভ নেই। সামান্য পঁচিশ-তিরিশ টাকা হলেই—তা, যাক, সে এক রকম চলে যাবে 'খন।

অনেক পরে টনক নড়ল ক্ষীরোদবাবুর। যখন সাহেব চলে যাচ্ছেন, ট্রেনে উঠেছেন। কি একটা লেখবার জন্যে কলমের খোঁজ করলেন। বিনা দ্বিধায় ক্ষীরোদবাবু বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ফাউন্টেন-পেনটা।

সাহেব তা স্পর্শও করলেন না। ফাউন্টেন-পেনটা খেলো, পুরোনো, দাগধরা।

অমৃতের স্বাদ পেলেন ক্ষীরোদবাবু। রিপোর্ট এল পরিদর্শনের। হাতের লেখা বিতিকিচ্ছি, টাইপ-রাইটার না হলে চলবে না এক পৃষ্ঠা। তা ছাড়া কাজকর্ম একেবারে কাছাখোলা, ল্যাজে-গোবরে। ঝুড়ি-ঝুড়ি গলতি, ভূরি ভূরি গাফিলি।

এবার ক্ষীরোদবাবু কয়েক ঘর কেঁচে যাবেন সন্দেহ নেই। কর্তব্য ও শাসনের কাছে কোনো বন্ধুতাই ঠেকা দিতে পারবে না।

তবু একবার যেতে হয় সদরে। মনে করিয়ে দিতে হয় একদিন এক সঙ্গে পড়লেও কত অধম অধস্তন হয়ে আছি। কেউ কোথাও না থাকলে জড়িয়ে ধরবেন না হয় তাঁর হাত দুখানি।

আর মেম-সাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা হলে, দুহাত ঠিক জড়িয়ে না ধরলেও, মৃদুস্বরে ডাকবেন, না-হয় তাকে তার ডাক-নাম ধরে। বলবেন, পুর্ব কথা স্মরণ না কর, আজকের কথা ভেবেই কৃপা কর, করুণাময়ী। তোমাকে যে নিয়ে আসি নি আমার গোয়ালে বিছালির ধোঁয়া দিতে, তোমাকে যে জায়গা করে দিয়েছি তখত-তাউসে, যৌতুক দিয়েছি যে হুজুরী তালুক, ভার্যা না করে যে আর্যা করেছি, সেই কথা ভেবেই একটু অনুকূল হয়ো।

পারঘাটে অতুল-আত্মিয়াররা দাঁড়িয়ে আছে। উপায় কি। ছাতা আড়াল দিয়ে যেতে হবে ঘাড় গুঁজে।

এই সেই কোকিল স্বর। মেমসাহেবেরই রেশমী গলা।

বোয়া!

জী।

ক্ষীরোদবাবু ভাবছিলেন তিনিই বেয়ারাকে জিগ্‌গেস করবেন কোথাও একটু দেখা হতে পারে কিনা নিভৃতে। কে জানে, পর্বতই হয়তো আসছেন মেঘ হয়ে।

নিচে যে টাইপ-রাইটারের এজেণ্ট এসেছে তাকে বলে দাও আমাদের যোগাড় হয়েছে দুটো, এখন আর দরকার নেই—

মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে। ক্ষীরোদবাবুর পদাবলী মনে পড়ে গেল।

স্পেশাল সেলুনে উজির আসছেন। ট্রেন মাঝরাতে এসেছে, তাঁর সেলুন আছে সাইডিঙে, ভোর সাতটায় তিনি অবতরণ করবেন। সকাল হতেই সাহেব গোলাম ও তুরুপ-ফেরাই জড় হতে লাগল। কিন্তু খোদ সাহেব মিস্টার দস্তিদারের দেখা নেই।

উজির আগেই নেমে পড়েছেন। রাতের দলামোচা পোশাকেই। দাঁত না মেজে, খেউরি না হয়েই।

দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দস্তিদার। নিচু হয়ে, ঘাড় নোয়াতে-নোয়াতে।

এত দেরি তোমার! ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন উজির। করমর্দনটা উত্তপ্ত হতে দিলেন না।

দস্তিদারও দস্তবস্ত হয়! মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, সাতটা এখনো বাজে নি।

বাজে নি? উজির তাকালেন ঘড়ির দিকে। দেখলেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। স্প্রিংটা কাটা।

মুখ গোমসা করে রইলেন। পটকা ফুটছে, তোপ দাগা হচ্ছে না। বাজছে মোটে বিউগল, জগঝম্প নয়। শালুর মোটে একটা গেট, আর সবগুলো দেবদারু পাতার। শালুর গেটের ওয়েলকামের তুলো খসেখসে পড়ছে। চেঁচাড়ির গেট বেঁকে রয়েছে তে-ব্যাঁকার মতো। তেমন কোনো হৈ-হল্লা হচ্ছে না, নিশান হাতে মিছিল করছে না ছেলেরা। এই ব্যবস্থা! তিনি যেন উটকো লোক এসেছেন, তিনি যেন কেউকেটা!

এরো ব্যবস্থা আছে! খোল-নলচে বদলাতে না পারলেও কলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন। অন্তত বেমক্কা জায়গায় পারবেন ঠেলে দিতে।

উকিল ছিল আগে। মক্কেলের ট্যাঁক হাতড়ে ও কাছা টেনে বেড়াত। নাইকুণ্ডে এক গাদা তেল ঢেলে গামছা পরে চান করত নদীতে। একবার অনেক দিন আগে দস্তিদার তাকে তাঁর কোর্ট থেকে বের করে দিয়েছিলেন। মাপ চাইতে এলেও বসতে চেয়ার দেন নি।

আজ দান পড়েছে উলটো। ভূতনাথ দেবনাথ আজ চোখ পাকান আর দস্তিদার দস্তবরদারের মতো হাত কচলান। আশাসোঁটা নিয়ে চলেন পিছু-পিছু খাসবরদারের মতো!

আশ্চর্য, চাকা ঘুরছে গোল হয়ে! বৃত্তবলয় সম্পূর্ণ হল এত দিনে। ভূতনাথ দেবনাথ ক্ষেত্র দুয়ারীর দুয়ারে এসে উপস্থিত। তার সেই নাড়াকুচির ঘরে। গোরুচোরের মতো।

গোবরলেপা মেঝের উপর চ্যাটাই পেতে বসলেন ভূতনাথ। গরম মশলা নয় আজ একেবারে, রোগা পেটে পলতার ঝোল।

শক্তিধর মহীধর বলে নিজেকে আজ মনে করল ক্ষেত্রনাথ। সে আজ আর নরম মাটি নয় যে বেড়ালে আঁচড়াবে। সে এখন শক্ত ঘানি, জোরদার, জবরদস্ত।

রাজা-উজির সবাই আজ তার করুণার ভিখারী। তার কথায় ওঠে-বসে, হেলে-দোলে। সমস্ত পৃথিবী এখন তার করধৃত আমলকী।

এবারে ভোট কিন্তু আমাকে দিতে হবে, ক্ষেত্তর। ভূতনাথ ক্ষেত্রর ঘেমো পিঠে হাত রেখে একটু আদর করে। শুনতে পাই এ অঞ্চল তোর এক্তারে। সব ভোট আমাকে যোগাড় করে দিতে হবে কিন্তু। জানিস তো, আমার চেহ্ন হচ্ছে কাস্তে! ও-সব লণ্ঠন সাইকেল নয়, কাস্তের বাক্সে কাগজ ফেলবি। তোদের যা আসল জিনিস—সেই কাস্তে-কাঁচি।

ক্ষেত্র মাথা নাড়ে, মুখ টিপে-টিপে হাসে। বেড়ার গায়ে গোঁজা কাস্তের দিকে তাকায়।

বস্ত্র

যাই বাবু, আদাব। কাঠের ছে দিচ্ছিল মোবারক, ঘাসের উপর ফেলে-রাখা জামাটা কাঁধের উপর তুলে নিল হঠাৎ।

চললি এখুনি ?

হ্যাঁ, বাবু। বাড়ি যেতে-যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। লাশ-কাটা ঘর, চিতাখোলা, সব পথে পড়ে। বাবাজান বলে দিয়েছে আন্ধার না নামতেই যেন বাড়ি ফিরি। রাস্তাটা ভালো নয়।

মোবারক উমেদার-পিওন। অল্প বয়স। দাড়িগোঁফের রেখা পড়ে নি এখনো।

সেই মোবারকের অনেকদিনের আগেকার পুরোনো কথাটা মনে পড়ল হঠাৎ, নালতাকুড়ের পথে এসে। বেড়াতে-বেড়াতে কতদূর চলে এসেছি খেয়াল করি নি। এবার ফেরবার পথ ঠাহর করতে গিয়ে দেখি আঁধার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। জ্যালজেলে দিনের আলোর পর হঠাৎ আঁধারের ঠাসবুনন।

কেমন ভয় করতে লাগল। আজ হাটবার নয়, পথে জনমানুষ নেই। চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

সামনেই চিতাখোলা। লাশ-কাটার ঘর। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দুধারে লটা ঘাস। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠতে লাগলুম।

বিশাল, বলিষ্ঠ একটা পাহাড়ে-গাছ ডাল-পালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাছের থেকে নাকি ভূত নামে। হেঁটে বেড়ায়। মোলাকাত করে কথা কয়।

হাতে টর্চ আছে তাতে যেন বিশেষ ভরসা হল না। মনে হল, অন্ত অস্ত্র কিছু নিয়ে এলে হত পকেটে।

ভাবছি এমনি, সামনেই তাকিয়ে দেখি, ভূত। স্পষ্ট ভূত। গাছ থেকে নেমে এসেছে কিনা কে জানে, কিন্তু দস্তুরমত হাঁটছে সমুখ দিয়ে। কিন্তু যেন হাঁটতে পারছে না। ঢ্যাঙা, লিকলিকে হাত-পা। আর, আগাগোড়া কালো, একরঙা। ঠাওর করতেই মনে হল, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আতঙ্কে গায়ের রক্ত শাদা হয়ে গেল।

টিপলুম চর্চ। আলোর সাড়া পেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে ততখানি যেন শক্তি নেই। গাছ থেকে নেমে এসেছে একথা ভাবা যায় না। যেন নিজেই ভড়কে গেছে। হাঁটু মুড়ে পথের পাশে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল হঠাৎ।

এ নগ্নতাটা আতঙ্কের নয়, হাহাকারের। মৃত্যুর নয়, সর্বাপহরণের।

স্বচক্ষে ভূত দেখবার সুযোগ ছাড়া হবে না। যখন সে ভূত মিলিয়ে যায় না, গাছে ওঠে না, পথের পাশে বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

টর্চের আলোটা নিবিয়ে ফেললুম তাড়াতাড়ি। কেননা লোকটাকে চিনতে পেরেছি।

বুড়ো ছাদেম ফকির। অনুদয়ে গেয়ে-গোরুর দুধ দুয়ে আমার বাড়িতে জোগান দিত। বলেছিল একদিন, কাপড় পাওয়া যাবে বাবু?

বলেছিলুম, রেশন-কার্ড যাদের আছে তারা পাবে একখানা। বাড়িপ্রতি একখানা। আছে তোমার রেশন কার্ড?

আছে।

কিন্তু তুমি তো মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে। আমরা এক গাঁট যা ধরেছি চোরাবাজারে, তা বিলোচ্ছি শহরের লোকদের।

আমাদের তবে কি হবে?

অনেকক্ষণ ভেবে বলেছিলুম, সার্কেল-অফিসার সাহেবের কাছে গিয়ে খোঁজ কর।

তারপর আর আসে নি ছাদেম। সেদিন কোমরের নিচে এক হাত অবধি একটা ন্যাকড়ার ঘের ছিল। সেই ফালিটা নিশ্চয়ই নেংটি হয়েছিল আস্তে-আস্তে। আজ একেবারে তন্তুহীন।

ওর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো স্ত্রীলোক আছে। নইলে ও কাঁদে কেন? নইলে ওর লজ্জা কিসের?

কিন্তু ওখানে ও করছে কি?

দু-একটি লোক এসে জুটেছে। একজন কদমালি, আদালতের রাতের চৌকিদার। চলেছে শহরেব দিকে। ভেবেছে, চোর-ছেঁচড় কাউকে ধরেছি বোধ হয়। কিন্তু চোর যদি বা কাঁদে, অমন কুঁকড়ি-মুঁকড়ি হয়ে কাঁদে কেন? কদমালি থমকে দাঁড়াল।

জিগগেস কর তো, করছে কি ও ওখানে?

আর কি জিগগেস করব। কদমালি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। বলল, শ্মশানে কাপড় খুঁজতে বেরিয়েছে, যদি পায় ন্যাকড়ার ফালি, চটের টুকরো, বালিশের খোল—

বললুম, কেন বললুম কে জানে, আমার বাড়িতে যেয়ো কাল সকালে। কাপড় দেব একখানা।

আমার রেশন-কার্ডের বনিয়াদে কাপড় যোগাড় করেছিলুম একখানা। খেলো, মোটা কাপড়, পাড়টা বাজে। যদিও সেটা আমার পরবার মতো নয়, তবু সংগ্রহ করে রেখেছিলুম। চাকর-ঠাকুরের কাজে লাগবে সময় হলে। নিরবশেষ দান করব এমন সংকল্প ঘুণাক্ষরেও ছিল না। কিন্তু মৃত নয়, রুগ্ন নয়, স্বাভাবিক সুস্থ একটা মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকবে এর অসঙ্গতিটা মুহূর্তের জন্যে অস্থির করে তুলল। মানুষ দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার দারিদ্র্যের চিহ্ন যে ছিন্নবস্ত্র, তার নিদর্শনটুকুও সে রাখতে পারবে না।

কিন্তু কাল ও আমার বাড়ি যাবে কি করে কাপড় আনতে? ও যে এখন সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত গোঁজামিলের বাইরে।

কদমালিকে বললুম, ওর বাড়ি চেন?

এই তো সামনে ওর বাড়ি। খানিকটা জঙ্গুলে অন্ধকারের দিকে সে আঙুল তুলল।

পরদিন কদমালির হাতে নতুন একখানা কাপড় দিলুম। বললুম, খবরদার, ঠিকঠাক পৌঁছে দিও ছাদেম ফকিরকে। পাড় কিন্তু আমার মনে থাকবে।

পাঁজিতে লেখে, শুভদিন দেখে নববস্ত্র পরিধান করতে হয়। কত শুভদিন চলে গেছে পঞ্জিকার পৃষ্ঠায়, কিন্তু ছাদেমের হৃতবস্ত্র এল না নতুন হয়ে।

আজ নিশ্চয়ই ছাদেম ফকিরের মুখে হাসি দেখব। আজ নিশ্চয়ই রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে আমাকে সেলাম করবে।

সন্ধ্যের মোহানার মুখে দিনের হাল হেলতে-না-হেলতেই বেরিয়ে পড়লুম নালতাকুড়ের পথে। চলে এলুম শ্মশান পেরিয়ে।

কোন জায়গায় ছাদেম ফকিরের বাড়ি আন্দাজ করে দাঁড়ালুম কাছাকাছি। কাছেই ছোটখাট একটা ভিড়। ফিসির-ফিসির কথা।

কেউ কতক্ষণ দাঁড়ায়, দেখে, তারপর চলে যায়।

দেখলুম কদমালি আছে কিনা। কদমালি এখনো বেরোয় নি লণ্ঠন হাতে করে, তার রাত-পাহারায়। যারা জটলা করছে তাদের কাউকে চিনি না।

এগিয়ে গিয়ে শুধোলুম, কি ব্যাপার ?

ঐ দেখুন।

তখনো গাছপালা একেবারে ঝাপসা হয়ে আসে নি। দেখলুম একটা সাধারণ আম গাছ। তারই একটা ডালে কি-একটা ঝুলছে। সন্দেহ কি, আমাদের ছাদেম ফকির।

তেমনি নিঃস্ব, তেমনি নিরবকাশ।

কয়েকজনকে সঙ্গে করে এগোলুম গাছের নিচে। সন্দেহ কি, ছাদেম ফকিরের গলায় আমারই দেয়া সেই নব বস্ত্র। গলা ঘিরে দেখা যাচ্ছে সেই তীক্ষ্ন লাল পাড়।

এরি জন্যে কি কাপড়ের দরকার হয়েছিল ছাদেমের ?

বললুম, বাড়ি কোনটা ওর ?

জঙ্গলের মধ্যে একখানাই শুধু ভাঙা কুঁড়েঘর সেখানে। সবাই বললে, ঐ তো।

মাতবর-মতন একজনকে ডেকে জিগগেস করলুম, ওর বাড়ির লোকেরা জানে ?

কেউই নেই বাড়িতে। কাউকেই দেখতে পেলুম না—

কতক্ষণ থেকেই তো ঝুলছে। বললে আরেকজন।

সত্যি, একটা টুঁ শব্দ নেই কোথাও। কেউ একটা কান্নার আঁচড় কাটছে না। আশ্চর্য! তবে কাল কি ছাদেম কেঁদেছিল নিজে মরতে পারছে না বলে ?

নতুন দক্ষিণের বাতাসে বোল-ধরা ডালগুলো কাঁপছে মৃদু-মৃদু।

মনে হল, আমাকে সে সেলাম করছে। যেন বলছে, আমার তুমি মান বাঁচালে বাবু। উলঙ্গতা আর দেখতে হল না নিজেকে।

লণ্ঠন হাতে এল কদমালি।

ঠেসে খানিকক্ষণ গালাগালি করল ছাদেমকে। নতুন বস্ত্রের এই পরিণাম? আত্মহত্যাই যদি করবি, তবে একগাছা দড়ি যোগাড় করতে পারলিনে? ঠাট করে নতুন কাপড় গলায় জড়াতে গেলি? এরি জন্যে তোকে কাপড় এনে দিয়েছিলাম ?

ভাবলুম, এ কি তার প্রতিশোধ, না, প্রতারণা।

লণ্ঠন নিয়ে কদমালিও খুঁজে এল তার কুঁড়ে ঘর। আনাচ-কানাচ। গলি-ঘুঁজি। ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলের মধ্যে সাপের খসখসানি। ঝরা পাতার শব্দ।

শুকনো ও শূন্য ঘর। মাদুর পেতে কেউ শোয় নি, শিকে থেকে নামায় নি হাঁড়িকুঁড়ি। জল বা আগুনের রেখা পড়ে নি কোথাও। শুধু ছাড়া-গোরুটা ঘাস চিবুচ্ছে আর বাছুরটা ঘোরাঘুরি করছে।

একা লোকের পক্ষে এই বিতৃষ্ণাটা অবান্তর নয় ?

কে ছিল এই লোকটার ?

কেউ বলতে পারে না।

যদি বা কেউ ছিল, গত দুর্ভিক্ষে সাবাড় হয়ে গেছে, কেউ-কেউ মন্তব্য করলে। ভাতের দুর্ভিক্ষে।

কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও যে লোক মরে এই দেখলুম প্রথম।

কিন্তু কাপড়ের বেলায় দুর্ভিক্ষ কোথায় ছাদেম ফকিরের? তাকে তো যোগাড় করে দিয়েছিলুম একখানা। তা কোমরে না রেখে গলায় জড়ালে কেন? কোন দুঃখে?

শেষ পর্যন্ত দুঃখ না হয়ে রাগ হতে লাগল।

বললুম, থানায় খবর গেছে?

এতেলা নিয়ে গেছে দফাদার।

আর, কেউ যখন নেই, পঞ্চায়েতকে ডেকে আঞ্জুমানে খবর দাও। কাফন-দানের ব্যবস্থা করাও।

সকালবেলাটা শহরের মধ্যে হাঁটি। রবিবার দেখে গেলুম নালতাকুড়ের পথে।

সেই যেখানে ছাদেম ফকিরের বাড়ি। সেই আমগাছ। স্পষ্ট দিনের আলোতে নিতে হবে তার অবস্থানের জ্যামিতিটা। আয়ত্তে আনতে হবে তার অনুভবের পরিমণ্ডল।

হঠাৎ কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। বেশ মুক্ত কণ্ঠের কান্না। আর, আশ্চর্য, নারীকণ্ঠের।

কে কাঁদছে? এগোলুম কুঁড়েঘরের দিকে।

ছাদেম ফকিরের পরিবার আর তার পুতের বৌ। পুত মরেছে এবার বসন্তে। কে একজন বললে সহানুভূতির স্বরে।

কেন, কাঁদছে কেন? যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছি, প্রশ্নটা এমনি খাপছাড়া শোনাল।

ছাদেম ফকির গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। পুলিসের হাঙ্গামার পর লাশ এই নিয়ে গেছে কবরখোলায়।

কাল ছিল কোথায় এরা সমস্ত দিনে-রাতে? ছাদেম ফকিরের পরিবার আর পুতের বৌ? মরে গিয়েছিল নাকি? মুছে গিয়েছিল নাকি? লুকিয়ে ছিল নাকি জঙ্গলে?

পর্দানশিন হলেও শোকের প্রাবল্যে এখন আর সেই আবরু নেই কিংবা, এখনই হয়তো আবরু আছে। লোকের সামনে করতে পারছে শোকের দুরন্ত দুঃসাহস।

এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, হেলে-পড়া চালের নিচে দাবার উপরে ছাদেমের পরিবার আর তার পুতের বৌ গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে জিগির দিয়ে কাঁদছে। যেন সদ্য-সদ্য ঘটেছে ঘটনাটা। কিংবা সদ্য-সদ্য কাঁদবার ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। পেয়েছে আত্মঘোষণার স্বাধীনতা।

তাদের পরনে, সন্দেহ কি, আমারই দেয়া সেই লাল-পাড় ধুতির দুই ছিন্ন অংশ। ফালা দেবার আগে খুলে নিয়েছে ছাদেমের গলা থেকে, লাশখানায় চালান দেবার আগে। সেই কাপড়ে সসম্মান তিন অংশ বোধ হয় হতে পারত না। আর, আগেই শাশুড়ীতে-বৌয়ে ভাগ করে নিলে ছাদেম ফকির মরত কি করে?

জনমত

চড়ুই-পাখিদের দেশে একটা ময়ূর উড়ে এসেছে।

ইং লেউ ইং—

সেই পরিচিত স্বর। সেই পরিচিত ভারি পায়ের শব্দ। কিন্তু তেমন যেন আর সাড়া জাগায় না। আগে-আগে ভয় পেত সবাই, এখানে-ওখানে গা-ঢাকা দিত। এখন দিব্যি সবাই পথের উপর এসে দাঁড়ায়, স্পষ্টাস্পষ্টি তাকায় মুখের দিকে। আগে কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত, এখন যেন কৌতূহলের, হয়তো বা কৃপার চোখে দেখছে। হল কি হঠাৎ? সে যেন সেই ডাকসাইটে ডাকাত নয়, ফকির-মুসাফির!

মামুদ খাঁ হাসে মনে-মনে। হাতে লাঠি, জামার নিচে গায়ের চামড়ায় গরম হয়ে আছে ভোজালি।

ইং লেউ ইং—

কেউ যেন তাকিয়েও দেখে না। দেখলেও হাসে। অবজ্ঞার হাসি।

লোকজন অনেক বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু বন্দর-বাজার তেমনিই আছে নদীর ধার ঘেঁসে। সেই সব হোগলপাতার চটি, বসেছে মুদি-মনোহারি বাজে-মালের দোকান। আছে সেই বড়-বড় বাহালীর দোকান, পেঁয়াজ-রশুন মরিচ-তেজপাতা টাল করা। হৈ কাঠ-কাঠরার আড়ত। চলেছে সেই দর্জির কল, কিস্তিটুপি আর দোলমান সেলাই করছে। লোহার কামারের দোকানে নেহাইয়ে ঘা পড়ছে হাতুড়ির। হাসিল-ঘরে রসিদ দিয়ে গোরু আর মোষ বিক্রি হচ্ছে। নৌকো এসেছে কাঁচামালে বোঝাই হয়ে, গুড়ের হাঁড়ি, তামাক

আর ধান-চালের বেসাত নিয়ে। খেয়ার পাটনী তোলা তুলে নিচ্ছে। গাছের ছায়ায় কামাতে বসেছে নাপিতেরা। সবই সেই আগের মতো। সেই আগের মতোই বিকেল।

তবু, যেন হাওয়া শুঁকে টের পাওয়া যায়, দিন কি রকম বদলে গিয়েছে।

হ্যাঁ, নতুন বাঁশের ছাউনি হয়েছে কতগুলি।

কি এই সব? এক জনকে জিগগেস করলে মামুদ খাঁ।

লোকটা বললে, এফ-আর-ই।

মামুদ খাঁ হাঁ হয়ে রইল।

হাসপাতাল। দুর্ভিক্ষের হাসপাতাল।

হ্যাঁ, বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের কথা ভাসা-ভাসা শুনেছে মামুদ খাঁ। পাথার এক ঝাপটায় অনেক লোক উজাড় হয়ে গিয়েছে। অনেক লোক চলে এসেছে কঙ্কালের সীমানায়। তাদের কাছে আসে নি মামুদ খাঁ। এই বাজারেই যারা মুনাফা মেরে মোটা হচ্ছে, এসেছে তাদের কাছে।

এই মেরা রুপেয়া লেউ। মামুদ খাঁ পাকড়েছে ননীলালকে।

ননীলাল যেন একটুও ভয় পায় না। যেন খুব অবাক হয়েছে, এমনি ফ্যাল-ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়। বোধ হয় মুচকে-মুচকে একটু হাসেও।

হাসতা কিঁউ? মেরা রুপেয়া লেউ।

ননীলাল তবু ভড়কায় না এক-চুল। আগে-আগে পালাত আনাচ-কানাচ দেখে। দিনের বেলায় কোন দিন মুখোমুখি হবার সাহস পায় নি। আজ দিব্যি হাতের নাগালের মধ্যে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে।

বলে, টাকা কিসের?

টাকা কিসের! মামুদ খাঁর বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ভাবে স্পর্ধা কি লোকটার! মামুদ খাঁর হাতের লাঠি কি বেদখল হয়ে গেছে? জং ধরেছে কি তার ইস্পাতের ভোজালিতে?

পাঁচ বছর ফাটকে ছিল মামুদ খাঁ। তার লাঠির গাঁটে পাথরের মজবুতি ছিল, ভোজালির মুখে ছিল লকলকে আগুন। জেল থেকে বেরিয়ে মামুদ খাঁ কিছু বে-তাগদ হয়েছে, লাঠিতে যেন আর সেই লাফ নেই, ভোজালিতে নেই আর সেই রাগ-থেকেই-রক্তের ভোজবাজি। নইলে সেদিনের ননীলাল কি না বলে, টাকা কিসের!

তুম শালা দিললাগি করছ হামার সাথ! হামি আদালত যাব।

ননীলাল হেসে ওঠে গলা ছেড়ে। বলে, সেদিন আর নেই, খাঁ সাহেব।

সত্যি, সেদিন আর নেই। নইলে মামুদ খাঁ আদালতের রাস্তা বাতলায়! কে না জানে, কত দিন তামাদি হয়ে গেছে তার টাকার দাবি-দাওয়া। তবু কি না আজ সে না-মরদের মতো আদালতের নাম করে। নালিশবন্দ হয়ে জবানবন্দি করবে! ছেঁচড়া উকিল-মোক্তার টয়ি-মুহুরির তাঁবেদার হবে! দিন-কাল বদলেছে বই কি!

তবে কি ননীলাল উপস্থিত দুর্ভিক্ষের দোহাই পাড়ছে? ননীলাল যেন না বেহুদা বদমায়েশি করে? তার 'ভাসানে' ব্যবসা ছিল, শহর থেকে বাজে মাল কিনে এনে নৌকো করে গাঁয়ের হাটে-হাটে বিক্রি করত, তার আলমাল বেড়েছে বই কমে নি একটুও। আগে মাটির একটা হাঁড়ি বেচে সেই হাঁড়ির মাপে চাল নিত, এখন এক হাঁড়ি চাল দিয়ে প্রায় এক হাঁড়িই টাকা নিয়ে যায়। তার এখনও ফালাও কারবার।

দেদার টাকা না হলে ডাকাবুকো হয়ে দাঁড়ায় অমন মুখোমুখি?

কিন্তু মামুদ খাঁও একেবারে মরে যায় নি।

আরও দু-চারজন জুটছে এসে ক্রমে-ক্রমে। মোগলাই কাবা, ঘুরুলি-দেয়া পায়জামা, জরিদার মখমলের ওয়েস্টকোট অনেক দিন পর এ অঞ্চলে একটা সোর তুলে দিয়েছে। যেন বিদেশ থেকে বহুরূপী এসেছে সে। যেন কেউ তাকে চেনে না, দেখে নি কোনো দিন।

এই যে নবি-নওয়াজ। জমিদারের তশিলদার। একবার তবিল ভেঙেছিল বলে গ্রেপ্তারি বেরিয়েছিল তার নামে। মামুদ খাঁর থেকে

চড়া সুদে দুশো টাকা ধার নিয়ে দু-বছরে মোটে কুড়ি টাকা শোধ করেছিল সে।

এই মেরা রুপেয়া লেউ।

প্যাঁকাটে চেহারা, মাড়ি বের করে দস্তুরমতো হাসে নবি-নওয়াজ। বলে, টাকা গেছে দেশান্তরী হয়ে।

তুম শালা তো আছ হামার কবজার ভিতর— মামুদ খাঁ তেড়ে আসে।

ও দিন-কাল আর নেই, খাঁ সাহেব। ও সব টেণ্ডাই-মেণ্ডাই আর চলবে না!

আশ্চর্য, কেন কে জানে, মামুদ খাঁ গুটিয়ে যায় আচমকা। আগে কেমন টগে-টগে থেকেও নবি-নওয়াজকে ধরতে পারত না, এখন চোখের সামনে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পাচ্ছে না বাগাতে।

আইন-ফরমান সব বদলে গিয়েছে। সুদখোরদের ভালো ওষুধ বেরিয়েছে এবার।

আইন-ফরমানকে মামুদ খাঁ কবে তোয়াক্কা করেছে শুনি? আজও তাতে তার টনক নড়ত না, কিন্তু আজ সে চমকাচ্ছে ননীলালের সাহসে, নবি-নওয়াজের মাড়ি-বের-করা নিশ্চিন্ত হাসিতে। বাজার-বন্দর গোলা আড়ত সব তেমনি আছে, কিন্তু, কি আশ্চর্য, সব থেকেও যেন কি নেই!

নেই আর তার পিছনের জোর, জনতার সম্মতি।

কে বলে জোর নেই? জবরদার হাতে মামুদ খাঁ নবি-নওয়াজের হাত চেপে ধরল। টানতে-টানতে নিয়ে চলল সামনের দর্জির দোকানে।

তবু নবি-নওয়াজ হাসে। যেন দর্জি-তাঁতি, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমোর, জেলে-মুচি, সব আজ তারা একদল।

দর্জি কেতাব আলি। অনেক দিনের মহব্বতি তার সঙ্গে। এখানে বসে মামুদ খাঁর অনেক লেন-দেন হয়েছে, অনেক বুঝ-সমুঝ। হাত-চিঠায় পড়েছে অনেক টিপটাপ। কেতাব আলিও তার কাছ থেকে ধার খেয়েছে, কিন্তু বেইনসাফি করে ঠকায় নি কোনো দিন। কত জনের জন্যে ফেলজামিন দাঁড়িয়েছে।

পাল্লা বদল হয়ে গিয়েছে, খাঁ সাহেব। দেশে মহাজনী আইন বসেছে। এসেছে নতুন দিন, ফিরিয়ে দেবার দিন। অনেক দিন এ অঞ্চলে আস নি বুঝি? তোমার দোস্ত-দোসরদের সঙ্গে মুলাকাত হয় নি? তারা তো কবে এ তল্লাট থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।

উঁহু, কি করে জানবে? দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করে কয়েদ হয়েছিল তার। জেল থেকে বেরিয়ে সটান চলে এসেছে সে। এক ঘরওয়ালীর কাছে তার জামা-মেরজাই জুতো-পয়জার ছিল, তাই চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। সব ছিঁড়ে-ফেড়ে গেছে, কনকনে শীতের হাওয়া ঢুকছে এসে হাড়ের মধ্যে।

কিন্তু আইনটা কি?

হাতের লাঠি নির্জীব হয়ে থাকে, ভোজালিটা ভোঁতা মনে হয়, মামুদ খাঁ জিগগেস করে, আইনটা কি?

দর্জির দোকানে বসে আদালতের পিওন সমন-নোটিশ জারি করে. রিটার্ন লেখে। পোস্টাপিসের পিওন চিঠি বিলি করে, বোর্ডের ট্যাক্স-দারোগা ট্যাক্সো কুড়োয়।

আদালতের পেয়াদারই বেশি মান, বেশি দাপট। সে জানে-শোনে বেশি, সে একেবারে ভিতরের লোক।

সে বলে, এখন বাবা লাইসেন লাগে। যেমন লাগে বন্দুকের, মদ-গাঁজার। লাইসেন না নিয়ে তেজারতি করলেই হাতে হাতকড়া।

টাকা কর্জ দিতে কে এসেছে? যে টাকা নিয়েছ তোমরা, তা ফিরতি দেবে না? এ কোন-দিশি নয়া কানুন? আসল টাকাও গাপ হয়ে যাবে?

হ্যাঁ, তামাদির গেরোর কথাটা জানা আছে মামুদ খাঁর। তার সে ভয় রাখে না। আদালতে যদি যেতেই হয় কোনো দিন, হাতচিঠাতে সে সুদের উশুল দিয়ে রাখতে জানে। কলম-ছোঁয়ানো সই করে রাখবার মত জালবাজের অভাব নেই। বটতলায় মিলবে অমন ঢের মুনসি-মুহুরি।

নয়া কানুন নয় তো কি। পাশের ঘরের মহেন্দ্র ডাক্তার তেড়ে

এল : চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে চাষা-ভুষো বেপারি-কারবারি সবাইকে উচ্ছন্নে দিয়েছ, তাদের জন্যে নতুন আইন হবে না তো কি! সুদের সুদ, তস্য সুদ, যেন চক্কর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে বেড়েই যাচ্ছে, খোলের চেয়ে আঁটি হয়েছে বড়, হাঁ-এর চেয়ে খাঁই। আসল? আসল কবে ভুষ্টিনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।

নেহি, আসল অন্তত হামার চাই।

জানি না আমরা তোমার এই আসলের কারসাজি? দিয়েছ দশ টাকা লিখেছ চল্লিশ। এখন সব বস্তা-বোঁচকা গাঁট-গাঁটরি খুলে দেখাতে হবে। এসেছে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার দিন।

সত্যি, এ হল কি? গো-বস্তি মহেন্দ্র সাপুই, ম্যালেরিয়ায় ভোগা চিমসে চেহারা, সে পর্যন্ত আইনের চিপটেন ঝাড়ে। ত্যাড়া ঘাড়ে কথা কয়। চোখ পাকায়।

নিজেকে মামুদ খাঁর হঠাৎ অসহায় লাগে। বুঝতে পারে তার পিছনে আর জনতার অনুমতি নেই। তার জবরদস্তির পিছনে নেই আর সেই ভয়ের বুজরুকি। যে ধার খায় সে যে অপরাধী নয়, সে যে শুধু অপারগ, রটে গেছে যেন তারই কানাঘুসো। অপারগের দল এবার তাই একজোট হয়েছে। পেরেছে একজোট হতে।

কিন্তু কিছু অন্তত টাকা না পেলে মামুদ খাঁ দেশে ফিরে যায় কি করে? তার কারবার যখন বরবাদ হয়ে গেল তখন দেশে গিয়ে সে চাষ-বাস করবে। হাল-বলদ কিনবে। হিং-এর চাষ করবে। কিন্তু বিনি সম্বলে সে যাবে কোথায়? খাবে কি? গরিবপরওয়ার কেউ নেই তোমাদের মধ্যে?

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই মামুদ খাঁ লজ্জায় মরে যায়।

এক আধলাও কেউ দেবে না! শুষে-শুষে ছিবড়ে করে ছেড়েছে, সোনার ডিম পাড়ত যে হাঁস, অতি লোভে তার পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়েছে—আছে কি আর আমাদের? যা তো, থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আয় তো দারোগাবাবুকে। মহেন্দ্র তড়পাতে থাকে: আজকাল খাতকের বাড়িতে গিয়ে ধন্না দেয়া বা চারপাশে ঘুরনা দেওয়াও

মারপিটের সামিল। যা তো কেউ, দেখবি এখনি শালার আসথাস তলব হবে থানা থেকে।

থানা-পুলিশের নাম শুনে মামুদ খাঁ জ্বলে ওঠে। বলে, তুম শালা তো কম্বল লিয়েছিলে—তার দাম ভি আইন নাকচ করে দেবে? আচ্ছা দাম না দাও, হামার কম্বল ফিরিয়ে দাও। মামুদ খাঁ সত্যি সত্যি হাত পাতে।

তুম শালা একখানা কম্বল দিয়েছ আর গায়ের ছাল তুলে নিয়েছ একশো জনের। সেই ছালে ডুগি-তবলা বানিয়েছ। আর আমরা হাড়গোড় বার করে দাঁত খিঁচিয়ে মরে আছি। বেইমানি করার আর তুমি জায়গা পাও নি? যাও, বেরোও।

শের ছিল, কুত্তা হয়েছে আজ। তবু বেইমান কথাটা সহ্য করতে পারে না মামুদ খাঁ। তার এক কালের বেদানা-খাওয়া রক্ত লাল হয়ে ওঠে। লাঠি তুলে আচমকা মারতে যায় মহেন্দ্র সাপুইকে।

ঐ মারতে যাওয়া পর্যন্তই। হাতের মুঠ তার আঁট হয়ে বসতে পারে না লাঠির উপর, ওরা তা অনায়াসেই কেড়ে নেয়। কাউকে কিছু বলতে হয় না, সবাই দাঁড়ায় এককাট্টা হয়ে। একসঙ্গে ঘাড়কাতা দিয়ে নামিয়ে দেয় তাকে দোকান থেকে। তার জামা ছিঁড়ে দেয়। পাগড়ি খুলে ফেলে। বাবরি ধরে টানে। ঢিল ছুঁড়ে মারে। একটা ঢিল লেগে কপাল ফেটে যায়।

বুকের উমে গরম হয়ে আছে যে ভোজালি, মামুদ খাঁ তা আর মনেই করতে পারে না।

স্পষ্ট বোঝে, জনবলের সঙ্গে পারবে না সে লড়াই করে। সমুদ্রে ভেসে যাবে কুটোর মতো। আর গায়ের জোর জিতলেও জিতবে না দাবির জোর। তার দাবি থেকে দাব গিয়েছে খসে। তার স্বত্বে বোধ হয় আর সত্য নেই।

মামুদ খাঁ পালিয়ে যায় জোর কদমে। যায় খেয়াঘাটের দিকে। কামারদের পিছনের গলি দিয়ে। পালিয়ে যাবার জন্যেই যেন সে এসে পড়েছে এই গলির আশ্রয়ে।

বাড়ির মুখোরে নিত্যগোপী জলচৌকির উপর বসে জল দিয়ে চেপেচেপে আরেকটা কে মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে।

নিত্যগোপী চিনতে পারল মামুদ খাঁকে। এ অঞ্চলেও সে তার হিং ফিরি করতে এসে কর্জ খাইয়ে যেত। শুধু নিত্যগোপীকেই জপাতে পারে নি। একখানা শাল দিয়েও নয়। নিত্যগোপী অনেক সম্ভ্রান্ত। সে কাবলিওলাকে ঢুকতে দেবে না তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে।

খড়ম পায়ে নিত্যগোপী উঠে দাঁড়াল। বলল, এ কি হল খান সাহেব?

চোর ধরতে গিয়ে জখম হয়েছি। রক্তে মামুদ খাঁর কপাল ও গাল ভেসে যাচ্ছে।

সে কি কথা, এসো আমার বাড়িতে। বাবুকে ডাকাই। ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিক।

কোনো দিন সাধ ছিল বুঝি মামুদ খাঁর, নিত্যগোপীর ঘরে যায়। আজ নিত্যগোপী তাকে ডাকল, কামনার মতো নয়, শুশ্রূষার মতো।

বললে মামুদ খাঁ, দরিয়ার পানি জবর নোনা, থোড়া পানি খাওয়াতে পারবে?

ছোট উঠোন পেরিয়ে নিত্যগোপী তাকে ঘরে নিয়ে এল। ঘটি করে জল দিল খেতে।

মামুদ খাঁর মুখে ঘটিটা আর কাত হল না। দেখল, নিচু-মতন একটা তক্তাপোশে কতগুলি কম্বলের থাক। লাল মোটা কম্বল। প্রায় এক শো। কিংবা তারো বেশি।

এ ক্যা?

বাবু এক গাঁট সরিয়েছেন হাসপাতাল থেকে। ঐ দুভিক্ষের হাসপাতাল থেকে। বাবু ওখানে এখন চাকরি করছে কি না— সমপর্যায়ের ব্যবসায়ী ভেবে নিত্যগোপী বললে নিশ্চিন্ত হয়ে।

কে তোমার বাবু?

মহেন্দ্র বাবু। খলিফার দোকানের পাশেই যার দাওয়াইখানা।

দুর্ভিক্ষের দিনে খুব পয়সা করেছে দু হাতে। নইলে আর আমার এখানে জায়গা পায়।

জলভরা ঘটি নামিয়ে রাখল মামুদ খাঁ। বললে, পুলিস ডাকে না কেউ? থানায় খবর দেয় না?

দারোগা জমাদার সবাইকে দেয়া হয়েছে একখানা করে। নিত্যগোপী মামুদ খাঁর ফালা খাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া জোব্বা-জামার দিকে তাকাল। বললে, তুমি একখানা নেবে খান সাহেব? এই শীতে জামা-কাপড় তো তোমার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যে হতে না-হতেই যা হাওয়া ছুটবে নদীর উপর দিয়ে—

না। চোরাই মাল আমি ছুঁই না।

মামুদ খাঁ নেমে পড়ল উঠোনে।

এ কি, জল খেয়ে যাও।

না। পানি ভি খাব না।

মামুদ খাঁ তার রক্তমাখা উপরের ঠোঁটটা চাটতে লাগল। যেন সে রক্তের স্বাদটা জেনে রাখছে। টক-টক নোনতা-নোনতা। লোভের রক্তের স্বাদ। মহেন্দ্রদেরও কপাল যখন একদিন ফাটবে তখন অনায়াসেই মনে করতে পারবে সে সেই রক্তের তার। জল দিয়ে তা সে আজ ফিকে করবে না।

লোকে দেখুক, দেখে রাখুক রক্তমাখা মুখেই মামুদ খাঁ খেয়ার নৌকোয় গিয়ে উঠল।

দাঙ্গা

শিশেখাল। এপারে আদমপুর ওপারে ধুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো। বাঁশের ধরুনি আছে উপর দিকে। হেলে বেঁকে।

কাঁকালে কলসী, চলেছে মমিনা। ত্যাড়াব্যাঁকা সাঁকোর উপর দিয়ে। ধরুনি না ধরেই। হাতে খোঁটা দড়ি, চলেছে জিন্নাতালি, তেমনি নন্নড়ে সাঁকোর উপর দিয়ে। তেমনি ধরুনি না ধরেই।

এপারে পুকুর, ওপারে গোবাট। গোরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে খাল, জলের থেকে নাকের তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল লোনা, পুকুরের জল ছাড়া খাওয়া যায় না। গোরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার ক্ষেতের ফসল কখন তছরুপ করে।

মমিনা আর জিন্নাত। ধুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর। দুজনে দেখা হল মুখোমুখি।

মমিনা বলে, পথ দাও।

জিন্নাত বলে, পিছু হাঁটো।

মমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জিন্নাত বলে, তার দাবি মমিনার আগে, কেননা সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আদ্দেকেরও বেশি। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই নুটিশ টাঙানো নেই যে মেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

হ্যাঁ, দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে। চোখ ঝিলকিয়ে বললে মমিনা। কলসীটা ঢলে পড়ছিল, কোমরের খাঁজের উপর তুলে চেপে ধরল আঁট করে। বাঁকা বাহুর বন্ধনীতে ফোটালে বা একটু নব-যৌবনের গরিমা।

আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না হয় পানিতে দেব। জিন্নাতালি বললে।

পথ ছাড় বলছি। রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় এটা। ঝলসে উঠল মমিনা: যদি না ছাড় তো বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।

আমিও বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলতে পারি।

কি বলবে তুমি?

বলব মকবুল মুছল্লির মেয়ে মমিনা বলেছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।

ওমা কখন বললাম!

ঘরে নয়, বলেছে আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।

দেবই তো একশোবার। নুড়ো জেলে দেব।

তাই, বাজানদের বললে লাভ হবে না, দাঙ্গা বেধে যাবে দুই বাপে। আমার মুখে জলুক নুড়ো, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও মমিনা।

মমিনা চোখ নামাল। বললে, হাসির গল্প নেই, তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কারু ফরমায়েসে হাসা যায়?

চাঁদ কি কারুর ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল রুপুলি-চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল জিন্নাত। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী ভেঙেছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম গফুরালি। সে বলে, আমার ভাঙা জমি

আবার ভেসে উঠেছে। শিকল জরিপ করে জমি ভাঁউরে নিলেই বোঝা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যা কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির লপ্ত, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন কষাকষি। শত্রুতালি। পক্ষাপক্ষি।

দুপক্ষের জমিদার দুপক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বসিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড লাগে, অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া, এই নিয়ে সল্লা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনঝাউ।

একদিকে আদমপুর, অন্যদিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। দেওয়ানি আদালতের ফেরফার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাজা-লাঠির তদারক করে। আমি হামি হব, বলে গফুরালি। মকবুল বলে, আমি হামি হব। লাঠিতে তেল মাথায়, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। শুরু হয় বুঝি হামলা-হামলি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উড়ি ধান। সমর্থ হয়ে উঠেছে আবাদের জন্যে। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দুদিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়কি, বর্শা-বল্লম, ল্যাজা-লাঠি, কেঁচা-টাঙ্গি, দা-কুড়ুল দুদিকেই ঝকমকিয়ে উঠল। চরের দখল নিয়ে বাধে বুঝি হাঙ্গামা।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ধুলেশ্বরের মোড়ল মকবুল। দুজনেরই হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। তাঁবেদার লোক-লস্করের অভাব নেই। মোড়লে-মোড়লে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অকূ হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গা

ফ্যাসাদ। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিসে এত্তেলা দেবে না কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজী। বুকের মাংসের চেয়ে দামি যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়। স্বত্বের চেয়েও বড় হচ্ছে দখল।

উলু মাঠ ভেঙে চাষ শুরু করে দিল জিন্নাত। লাঙল দিলেই খড় ভেঙে-ভেঙে যায়। মাটি ফেটে-ফেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে দরকার নাই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে। পাখা-মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মতো।

গফুরালি হুকুম দিল, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। দখল যখন নিয়েছি একবার, বেদখল হতে পারব না। ও হঠে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আমাদের গায়ের বস্ত্রের মতো জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠন্ত রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিস-করা শানানো লৌহ-মুখ, উড়ল অনেক ধুলো মাটি, ফিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেওয়ার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে। হেরে গেল গফুরালির দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে দেখতে। চম্পট দিল খাল-নালা সাঁতরে। কিন্তু জিন্নাতালি ফিরল না।

জিন্নাতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করোগে, কিন্তু তার আগেই গুম হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুছুল্লির। দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বচ্ছর। রাজী হও তো ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো কচু কাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে পায়ে কোমরে দড়ি বাঁধা, জিন্নাত শুয়ে আছে লকড়ি-ঘরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোছা-মোছা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিন্নাতের। তার জ্বরো কপালের উপর কার মিঠে হাতের ছোঁয়া।

কে ?

আমি গো আমি। মমিনা।

স্বরের মিঠানিতে জ্বর জুড়িয়ে গেল গায়ের। যেন স্বপন দেখছে, স্বপন শুনছে জিন্নাত।

জখম হয়েছে তোমার ?

লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। ব্যাথায় ছিঁড়ে পড়ছে দুহাত। বেতাগী ল্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারে নি বুকের মধ্যে।

এইখানে লেগেছে ? হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।

এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা, ব্যথা-বেদনা যেন সব উবে গিয়েছে এক পরশে। ফুটন্ত গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু। দড়ির গিঁট খুলে দিতে লাগল মমিনা।

এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ গা থেকে ?

হাঁ, ছোট-ছোট আঙুলে বিন্দু-বিন্দু স্পর্শের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে, এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্টে। প্রথম রাতে সর্দার-চাইরা হল্লা-ফুর্তি করেছে। জবর দখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিপক্ষদের। তার উপরে কয়েদ করেছে ও দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি।

এ-কি, ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে ? জানতে পারলে তোমার কি সর্বনাশ হবে জান ?

জানতে পারবে না।

পারবে না মানে ?

মানে জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।

তা কি করে বলছ ?

বলছি আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।

তুমি ?

হাঁ্যা, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।

চলে যাবে ? কোথায় ?

বল্লভপুরের কাজীর কাছে। জান তো, কাজি কুরমান মোল্লা আমার খালু। নদীর দুবাঁক পরেই বল্লভপুর।

সেখানে কি ?

সেখানে গিয়ে কাজির দরবারে কাবিননামা রেজেস্ট্রী করব; তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি দুলহা আর আমি দুলহিন। কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শিরশির করে উঠল জিন্নাতের। বললে, তোমার বাপ-চাচা রাজী হবে ?

না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে তুড়তে পারবে না কেউ।

বিয়ে হবে আমাদের ? ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপন দেখছে জিন্নাত ?

হাঁ্যা, তোমার খেদমতে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে দু পক্ষের। যে চর আমার বাজান বলেছে আমার, আর তোমার বাজান বলেছে তার, সে চর তারা দুয়ে মিলে আমাদের দুজনকে জায়গির দিয়ে দেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো আবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু গ্রামে ফিরে আসবে মিল-মহব্বত। তা ছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকাল দু-দল কেবল মারামারি করবে ? আমার মনের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি !

কি করে যাবে মমিনা? জিন্নাত উঠে বসল।

ঘাটে ডোঙা আছে মাছ ধরার। তাতে করে পালাব। কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

আমার হাত যে ভাঙা। নৌকা বাইবে কে?

আমি দাঁড় টানব। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?

পারব।

তবে চলো। নদীর নাম আঁধার মানিক। আঁধার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।

দুজনেই ত্রস্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকা বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

হাল-দাঁড় কই? জিগগেস করল জিন্নাত।

ও! বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাঙ্গার উরদিশে। বললে, তুমি একটু বোসো। উঠোনে মুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দুজনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে। মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গামা-হুজ্জুতের, আক্রোশ-আক্রমণের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, চোট-জখম, এত রক্তপাত— সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনিভাবে ভুলে যেতে হবে হার-মার, ঘায়ে মলম লাগাতে হবে মোলাম করে। বাজানকে গিয়ে বলবে, মোল্লার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা। নদীর নামে তারও নাম। সে যে আঁধারমানিক।

ছোট দেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে

জিন্নাত নেই, ডোঙাও নেই। দু হাতে জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদা ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর আভাস দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমানিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিন্নাতের দু হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?

জমি

মোকদ্দমা শেষ হয়ে গেল।

শেষ হয়ে গেল? জিগগেস করল হেলালদ্দি। জিগগেস করল আরো অনেকে। পাড়া-বেপাড়ার দশজনে। মোকদ্দমায় কে পেল কে ঠকল সেটা জিজ্ঞাস্য নয়। মোকদ্দমা যে শেষ হয়ে গেল এটাই আপশোষের কথা।

এ কদিন সমানে তারা ভিড় করেছে আদালতে। কে কী বলে বা এক কথা বলতে আরেক কথা বলে ফেলে তাই শুধু শুনেছে এ কদিন। কে কি রকম হিমসিম খায়, কার কী কেচ্ছা-কীর্তি বেরোয়। কার দায়মূল হয়েছিল, কে বেটি চুরি করেছিল, কে পড়েছিল ঘরপোড়া মোকদ্দমায়। সকাল থেকে শেষবেলার কাচারি পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায়। ভিড়হুড় দেখে আদালত-ঘর থেকে তাদেরকে বের করে দিলে চাপরাশি-আর্দালির হাতে টিকিটের পয়সা গুঁজে আবার গুটি-গুটি এসে দাঁড়ায়। সাক্ষীর প্রতি সহানুভূতিতে নিজেরই অলক্ষ্যে ঘাড় নেড়ে হঁ-না ইঙ্গিত করে বসে। শত্রু-মিত্র সব যেন তাদের ঘরের লোক।

জীবনে আর কোনো নেশা নেই। রোমাঞ্চ নেই। ক্রিকেট-ফুটবল নেই, থিয়েটার-বায়স্কোপ নেই, রেস-রেশালা নেই। নেই কোন জুয়োখেলা, মদ-গাঁজা। থাকার মধ্যে আছে এই মোকদ্দমা। দাদ-ফরিয়াদ। তার হার-জিতের খাম-খেয়াল। উকিলে-উকিলে কাছি-টানাটানি।

মোকদ্দমার ফল বেরিয়েছে শুনলাম। পেল কে? ফলের কথা একমাত্র জিগগেস করলে আমিরন।

আর কে পাবে? সোনামদ্দি তাকিয়ে রইল দুর্বলের মত।

তার মানে? আমরা পাইনি?

আমরাই তো পাব। যেদিকে ধর্ম সেই দিকেই তো জিত হবে।

আহ্লাদে ঘাই মেরে উঠল আমিরন। আমরা পেয়েছি? আমাদের দিকে রায় হয়েছে? ঠকে গেছে জলিল মুন্সি? বলো কি, খোদাতালার এত রহমৎ হয়েছে আমাদের উপর? জমি-জায়গা আমাদের থেকে গেল নিজ চাষে? মোকদ্দমা জিতলাম তবু তুমি অমন মনমরার মত তাকিয়ে আছ কেন? তোমার জেল্লা-জলুস সব গেল কোথায়।

এরপর আবার আপিল আছে। জলিল মুন্সি আপিল করবে বলেছে।

সে পরের কথা পরে। এখন তো আমোদ করে নাও। কাল উপোস করতে পারি ভেবে আজকের বাড়া ভাতে তো ছাই দিতে পারি না। নাও, তামাক সেজে দি এক ছিলিম। উজুর পানি এনে দি। আছরের নামাজ পড়ো। মজিদে যাও, মজিদে পয়সা দিয়ে এস কারীর হাতে। দরগার খাদেমের কাছে চেরাগী দিয়ে এস। সঙ্গে মহবুবকে নিয়ে যাও। আমাদের বুকচেরা ধন মহবুব। পাকা স্বত্বের জমি পেলাম। এবার আর ভাবনা কি। থিত-ভিত হল এতদিনে।

কিন্তু না, এরপর আবার আপিল আছে। আবার খরচান্ত, আবার ভোগান্তি, আবার আইনের খাম-খেয়াল।

তোমার কোনো ভয়-ডর নেই। কড়া করে তামাক সেজে আনে আমিরন। জলিল মুন্সির সাজানো মোকদ্দমা ফেঁসে যাবে নির্ঘাত। জুলুমদারি টিকবে না শেষ পর্যন্ত। আমাদের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাক, জমি ছাড়িয়ে নিতে দেব না।

রায়তি স্বত্বের জমি ছিল ছকুমালির। লড়াইয়ে গেছে সে কুলি-মজুরের ঠিকাদারি হয়ে। যাবার আগে বেচে দিলে সে সোনামদ্দির

কাছে প্রায় মাটির দরে। উনিশ গণ্ডা জমি, মোটে আড়াই শো টাকা বহায়। সোনামদ্দির বউটা সোনাচাঁপার মত দেখতে। সেই একটু দর কষাকষি করেছিল। না, শাড়ি-জেওর টাকা-পয়সা কিছুই সে চায় না। সে জমি চায়, জোরের জমি। শুধু ফসলের জোর নয়, স্বত্বের জোর। পাকাপাকি স্বত্ব। যাতে কায়েম হয়ে থাকতে পারে তারা। গাঁথনিটা মজবুত হয়। যাতে না পরের জমিতে বর্গাইত হতে হয়। জমিতে চষি-রুই কিন্তু তা পরের জমি। নিজের জমি চাই। স্থিতিবান স্বত্ব। যাতে না এক ফুটিশেই মেছমার হয়ে যায়।

একটু মায়া পড়েছিল কি হুকুমালির ?

কি মিয়া, বেচবেই যদি জমি, একবার আমাকে যাচতে পারলে না ? না, আমরা উচিত দাম দিতাম না ? জলিল মুন্সি পাকড়াল হুকুমালিকে।

রোকের জমি। জলিল মুন্সির বাড়ির বগলে। ডাক নাম আশি-মণি। এক কানিতে আশি মণ ধান হয়। কবালার কথা শুনে জলিল মুন্সি করাতের পাতের মত লকলক করে উঠল।

বলি দিয়েছে কত সোনামদ্দি ? আড়াই শো ? এই বাজারে এ জমির দাম আড়াই শো ? আমি তোমাকে পাঁচ শো দিতাম।

দলিল এখনও রেজিস্ট্রি হয়নি। চোখ ছোট করল হুকুমালি। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে বলেই বুঝি মন তার শক্ত হচ্ছে।

না হোক, রেজিস্ট্রিতে কিছু এসে যায় না।

হুকুমালির সঙ্গে ষড় করলে জলিল মুন্সি। নগদ দুশো টাকা দিয়ে আরেকটা কবালা লেখাপড়া করিয়ে নিলে। যোগ-সাজস করলে স্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের সঙ্গে। সোনামদ্দির কবালার যে তারিখ,, তার চারদিন আগেকার তারিখ বসালে স্ট্যাম্প বেচার তায়দাদে। সেই মোতাবেক দলিল সম্পাদনের তারিখ দিলে। ফলে দাঁড়াল এই, জলিল মুন্সির কবালা সোনামদ্দির কবলার আগুড়ি হয়ে গেল। সোনামদ্দির কবালা যদি পাঁচুই, জলিল মুন্সির হল পয়লা। স্ট্যাম্প বেচার খাতা-পত্রেও সেই পয়লা লেখা। কোথাও আর ফাঁক-ফেঁকড়া রইল না। তক্কায় তক্কায় মিশ খেয়ে গেল।

ওয়াকিবহাল লোক এই জলিল মুন্সি। সে জানে দলিলের স্বত্ব হয় দলিল লেখাপড়ার তারিখ থেকে, রেজেস্টারির তারিখ থেকে নয়। কারসাজি করে তারিখ পিছিয়ে দিতে পারলেই তার স্বত্ব প্রবল হয়ে উঠবে।

কোনো ভেজালে পড়ব না তো? হুকুমালি ভয়ে ভয়ে জিগগেস করলে।

তোমার ভয় কী! তুমি তো যুদ্ধে যাচ্ছ কুলির জোগানদার হয়ে। তোমার লাগ তখন পায় কে? যখন মামলার ডাক হবে, আদালত জিগগেস করবে, বায়া কোথায়, বায়া কী বলে? কোথায় বায়া, কে তাকে সমন ধরায়! আমি বলব, বাধ্য হয়েছে সোনামদ্দির। সোমামদ্দি বলবে, দায়াদী আছে জলিল মুন্সির সঙ্গে। শুধু দলিল তজদিগ করে হাকিমের বিচার করতে হবে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ধাঁকা লাগিয়ে দেব।

সেই মামলার রায় বেরিয়েছে আজ।

দলিল লেখক, ইসাদী সাক্ষী, নিশানদায়ক সবাই হলফান জবানবন্দি দিয়েছে জলিল মুন্সির দিকে। রেজেস্ট্রি আফিসের টিকিটবরাত, ভেণ্ডারের খাতা তলব—সব কিছুরই তজবিজ হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লখাইর বজসার লোহার ঘরে কোথায় একটি ফুটো লুকানো ছিল ঢুকল কাল-কেউটে। জলিল মুন্সির তঞ্চকী মামলা বেফাঁস হয়ে গেল।

দখল ছাড়েনি সোনামদ্দি। একদিনের জন্যেও নয়। একবার হাল-গরু নিয়ে জবরান দখল করতে এসেছিল জলিল মুন্সির কিরষান। সোয়ামী-স্ত্রীতে মিলে হাল তাড়িয়ে দিয়েছে। নিজ হাতে জুয়ালি খুলে দিয়েছিল আমিরন। বলেছিল, বুকের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পার, কিন্তু জমি নিতে দেব না। হাট-ঘাট বাজারবন্দর করতে সোনামদ্দি বাইরে যায়, ততক্ষণ আমিরণ চোখ রাখে। পাখির নখের মতন চোখ। জমি তার বাড়ির বন্দের সামিল এক ঘেরের মধ্যে। খাটে-পিটে, খায়-লয় আর সব সময় চোখ রাখে জমির কিনারে। ঘেঁসতে সাহস পায় না জলিল মুন্সি।

তাই জলিল মুন্সিকেই আর্জি করতে হল। নিজের দখল-স্থিরতরের নয়, বিবাদীর জবরদখল উচ্ছেদের।

কিন্তু টেকাতে পারল না মামলা। ডিসমিস খেয়ে গেল। আদালত রায় দিল, সোনামদ্দির কবালাই খাঁটি, বাদীরটা জাল-সাজ, ফেরেবী। তাই জমির স্বত্ব শুধু সোনামদ্দির। তার আইনী দখল। জলিল মুন্সি বেমালেক।

আপিল করবে জলিল মুন্সি। এই আদালতই শেষ নয়। আছে আরো উপর তলা। সেই ঘরে উঠবে সে সিঁড়ি ভেঙে।

উঠুক। উঠতে দাও। আমরা নিচে থেকেই আসমান দেখি। উপরের দিকে তাকাল আমিরন।

আপিল করলে আর ওর সঙ্গে পেরে উঠব না। বললে সোনামদ্দি।

আমরা না পারি ধর্ম পারবে। আপিল করুকই না আগে। আগেই তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? প্রথম জিতের পর যে একটু আমোদ করব তা করতে দিচ্ছ না।

কাঁচা চিকণ ধান ফলেছে জমিতে। কালছে ধরেছে এখন, কদিন পরেই পাকা সোনার রং ধরবে। আলের আগায় দাঁড়িয়ে যে একটু রূপ দেখি তার তুমি ফুরসৎ দেবে না। দাঁড়াও, বালি দিয়ে কাস্তে-কাঁচি ধার করি আগে, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে ধান দাইব। ঢেঁকিঘরের তদবির করি, "সুন্দুইরার হাতি" ঢেঁকিগাছঠাকে ঝাড়ি-পুঁছি। একদিন ফিরনি-পায়েস তৈরি করি, একদিন বা চিটে গুড় দিয়ে চিতই পিঠা খাই। তুমি আগে থেকেই কু ডেকো না।

সব বিষয়ে বুঝজ্ঞান হয়নি এখনো আমিরনের। কড়ি খেলতে বসে কখন চার চিতে চক আর কখন পাঁচ চিতে পাঞ্জা—এ কে বলতে পারে। কে বলতে পারে মোকদ্দমার ফলাফল। সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় এক শ্বাসে। আবার কখনো বা মরা গাছে বউল-মউল ধরে। কেউ বলতে পারে না। হয়তো ঘাটে এসে ঘাটের নৌকো ঘাটে পচল আর পাল মেলল না।

আর এমনও তো হতে পারে যে আমাদের জিৎ বহাল থাকল

শেষ পর্যন্ত। যা সত্য তার আর রদবদল হল না। হতে পারে না এমন? কুচকুচে কালো চোখে ঝিলকি খেলে গেল আমিরনের।

এতটা যেন সোনামদ্দির বিশ্বাস হয় না। যে দুর্বল তাকে নিয়ে ধর্ম শুধু খেলা দেখায় ছলচাতুরী করে। দরজার গোড়ায় স্থির হয়ে বসে থেকে সারা জীবন পাহারা দেয় না। কখন আবার চলে যায় একলা রেখে।

আপিলের শুনানি তো আর কালকেই হয়ে যাচ্ছে না। রায়ও উল্টে যাচ্ছে না রাতারাতি। এখুনি মুখ কালো করব কেন? বাজার-সওদা কর, কুটুম্বিতেয় যাও, ভাই-বন্ধুর সঙ্গে হৈ-হল্লা কর, পান-তামুক খাও। আমিও কটা দিন একটু হালকা পায়ে হাঁটা-চলা করি, মেন্দি পাতায় হাত পা রাঙাই, চোখের কোলে কাজল আঁকি। ছেলেটাকে নাচাই-খেলাই।

তুমি কিছু ভেবো না, মন খারাপ কোরো না। আমিরন বসে এসে সোনামদ্দির পাশ ঘেঁসে। আমার মন বলছে আমাদের পাওয়া জমি আমাদেরি থাকবে। দেখছ না, জমি কেমন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বান্ধবের মতন।

তা তো দেখছি। কিন্তু খরচ-তখরচ করতে হবে আপিলের মোকদ্দমায়। তা জুটবে কোত্থেকে?

আমিরন ঝাঁকরে উঠল: আমরা তো জিৎপার্টি। আমাদের আবার খরচ কি?

অনাড়ি অবুঝ, আদালতী কাণ্ড কিছুই জানে না। জলিল মুন্সি এরি মধ্যে কত তলাসী-তদবির আরম্ভ করে দিয়েছে। আপিলের মামলা কার ঘরে চালান করে নিলে সুফল হবার আশা তার তদবির। অমুক হাকিম নূতন সবজজ হয়েছে, আপিল পেলেই হাতে মাথা কাটে, তার ঘরে নিয়ে চল। এর আবার উল্টোবুঝ আছে অমুক হাকিম। বোঁটা খসতে আর দেরি নেই, বেশি লিখতে-বকতে চায় না, নম-নম করে সেরে দেবে। যা আছে তাই বহাল রাখবে। তার ঘরে নিয়ে চল। অমুক না তমুক তার দরবিট চলবে। তারপর উকিল

নিয়ে টানাটানি। কোন ঘরে কোন উকিলের পসার তার খোঁজ-তালাস। প্রতি পদে তহরি, প্রতি পদে মেহেনতানা।

তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি শুধু আল্লার নাম করে বসে থাক।

বুঝজ্ঞান থাকলে এমন কথা কেউ বলে না। ঘরগৃহস্থি করে, সংসার-সৃষ্টির জানে কী? শেষকালে জেতা মামলা বে-তদবিরে না ফস্ত হয়ে যায়। ওষুধে সারা ভালো রুগী না শেষকালে পথ্যের অভাবে মারা পড়ে।

নিম্ন আদালতের খরচ টানতেই সোনামদ্দি নাকাল হয়ে পড়েছে। উপরো-উপরি গত দুই খন্দে ধান বেচে কতক টাকা পেয়েছিল, জমি কিনে বাকি সব গিয়েছে মামলার অন্দরে। তাতেও কুলোয়নি পুরোপুরি। ভাণ্ড-বাসন বেচতে হয়েছে, বেচতে হয়েছে আমিরনের বাউ-খাড়ু। হয়েছে কিছু হাওলাত-বরাত। তবু আমিরন জমি ধরতে দেয়নি। খবরদার, জমির গায়ে হাত দিতে পারবে না। জমি আমাদের নিটুট থাকবে। একেবারে নিষ্পাপ। বাঁধা-বেচা করতে পারবে না ওকে নিয়ে। ও আমাদের বুকের মাংস কলজের রক্ত।

অনেক রকম লোয়াজিমা। হাঁপিয়ে উঠেছিল সোনামদ্দি। মহাফেজ-খানা থেকে নথি তলব করে আনতে হবে, তার তদবির চাই। সাক্ষীর বার-বরদারি লাগবে, অন্য পক্ষকে দিতে হবে মুলতুবি খরচ। সোনামদ্দির হাত খালি। আমিরন খোরাকির ধান বের করে দিল। বললে, বাঁধা মাইনের চাকর খেটে খাব দুজনে, তবু তোমাকে আমি জমি বেচতে দেব না। না, না, পত্তন রেহানও না, কিছু না, আমার লক্ষ্মীকে পরের হাতে সঁপে দেব না কিছুতেই।

খরচ যখন আর টানতে পারে না, ভাই-বন্ধুরা বলেছিল, জলিল মুন্সির সঙ্গে আপোসরফা করে ফেল। আপোসের শর্ত আর কিছুই নয়, যে দামে কিনেছিলে কিছু নাহয় বেশি নিয়ে জমি বেচে দাও জলিল মুন্সিকে। কিছুটা গড়িমসি হয়ত করেছিল সোনামদ্দি, কিন্তু আমিরন হাকার দিয়ে উঠল : কিছুতেই না। ধর্মের কাছে ঠকি, বুকে ধরে জমি ওকে দিয়ে দিব স্বচ্ছন্দে। অধর্মের কাছে ঠকে জমি জিরাত

খোয়াতে পারব না। ভিখ মেগে খেতে হয়, সাধু গৃহস্থের বাড়ি ভিখ মাগব, চোরের কাছে খয়রাত নেব না।

সেই কষ্টের জমি তাদের বজায় রয়েছে। বলবৎ রয়েছে ধর্ম। তার আবার ফির-যাচাই হবে আপিলের আদালতে। কিন্তু তার খরচ কই? খন্দ উঠতে এখনো ঢের দেরি আছে। আংটি-চুংটিও নেই আর আমিরনের কানে নাকে। হাঁড়ি-পাতিলের দাম কি!

ছুটা খতে আর ধার পাওয়া যায় না। জমি এবার বন্ধক রাখতে হবে। ভয়ে-ভয়ে বললে সোনামদ্দি।

কী করবে?

বন্ধক রাখব।

পাপ কথা মুখেও এনো না। বন্ধক উদ্ধার করবে কি করে?

খন্দ উঠলে ধান-পান বেচে শোধ করে দেব।

ওসব শোধবোধের ধার দিয়েও যাবে না মহাজন। সে শুধু ফন্দি দেখবে কি করে জমিতে ঢুকতে পারে। ওয়াশিল দিয়ে শুধু তামাদি বাঁচাবে। তাই যেই একবার খন্দ খারাপ হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে জমি দখল করে নেবে। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের জমি তুমি পরাধীন করে দিও না।

ভাই-বন্ধুর সল্লা-পরামর্শ নিল সোনামদ্দি।

বউ বলে, ধর্মের দুয়ার ধরে বসে থাক। এক আদালতের রায় যখন আমাদের দিকে হয়েছে তখন সব আদালতের রায়ই আমাদের দিকে হবে। বলে, আপিলে আমাদের হাজির হবারই দরকার নেই। দেখি ধর্মের রায় কে ওলটায়!

মুরুব্বি-মাতব্বররা হেসে উঠল। ঠাট্টা করে উঠল। বলল, শুধু সদরে আপিল কি, দরকার হলে হাইকোর্ট করতে হবে। তার জন্যে তৈয়ার হও, মিয়া। কারবার-দরবারের কথায় বউকে ডেকো না।

সত্যিই তো। যদি সদরে সোনামদ্দি ঠকে যায় তবে চুপ করে সে-হার সে মেনে নেবে নাকি? শেষ চেষ্টা সে দেখবে না? কুটুম-মহলে সে বলবে না বুক ফুলিয়ে, হাইকোর্ট করেছিলাম?

আমিরন ঘরের বৌ, সে আইন-বেআইনের জানে কী!

সে কিছু জানতে না পারলেই হল। জমির চাষদখল ঠিক থাকলেই সে নিশ্চিন্ত থাকবে।

কিন্তু বন্ধকী মহাজন কই আজকাল দেশ গাঁয়ে? ঋণসালিশী আর মহাজনী আইন তাদেরকে কাবু করেছে। তবে যদি খাইখালাসী দাও, দেখতে পারি। তাতে সোনামদ্দি রাজী হতে পারে না। তা হলে তাকে জমির দখল ছেড়ে দিতে হয়। তা কি করে চলে? তা হলে যে আমিরন জেনে ফেলবে।

অগ্রিম পাট্টা নেবার লোক আছে। ওয়াদা করে নগদ খাজনায় লাগিয়ে এক থোকে বেবাক টাকা নিয়ে নাও আগাম। কায়েমী প্রজা নয়, ওয়াদা অন্তে জমি আবার ফেরৎ পাবে। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের জন্যেও জমির উপর রায়ত বর্গাইত সইতে পারবে না আমিরন। অশান্তি করবে। চোখের জলে নিবিয়ে ফেলবে আখার আগুন।

এখন শুধু সাফ-কবলার দিন। যদি বল জমি বেচব, রায়তি স্বত্বের জমি, কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। ঢোল দিতে লাগবে না, দেশ-বিদেশের লোক এসে হাজির হবে। কিন্তু জমিই যদি বেচে ফেলল তা হলে থাকল কি? আপিলও যদি সে পায়, সে কেবল রায়ই পাবে, জমি পাবে না।

এক উপায় শুধু আছে। রায়তি স্বত্ব বেচে ফেলে তার তলায় কোলরায়তি বন্দোবস্ত নেওয়া। জমিতে জমি রইল কাবেজের মধ্যে, শুধু স্বত্বের যা একটু বরখেলাপ হল। স্বত্বের কারিকুরি অতশত বুঝবে না আমিরন। আমল-দখল ঠিক থাকলেই সে খুশি। বছর-বছর খাজনা টানতে হবে বটে, তা জমির দোয়ায় আটকাবে না। জানতে দেওয়া হবে না আমিরনকে। সামিয়ানা খাজনা দিয়ে যেতে পারলে কেউ আঁচড় কাটতে পারবে না জমিতে। তাদের ভোগ-তছরুপ ঠিক থাকবে।

আশ্চর্য, সহজেই খদ্দের পাওয়া গেল। আপিলের আদালতে স্বত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে কেউ কিনতে চাইবে না এই সবাই আন্দাজ

করেছিল। কিন্তু যুবনালি এল এগিয়ে। মোলায়েম ভাবে বললে, আমি নিতে রাজী আছি। জমি নিয়ে অমন ফটকা খেলি। যদি আপিলে সোনামদ্দি ঠকে, আমিও না হয় ঠকব। সরল কিস্তিতে শোধ করে দেয় দেবে, না দেয় তো মারা পড়ব না।

নগদ তিনশো টাকায় কিনল যুবনালি। দশ টাকা জমায় কোল-রায়তি পত্তন নিল সোনামদ্দি। কবালা হল। কবুলতি হল। জমি রইল সোনামদ্দির চাষে।

আমিরন টুঁ শব্দটিও জানতে পেল না। দাওয়া ধান আগের মতই আঁটি বেঁধে এল তার উঠানে। ধান ঝাড়ল, ধান সারল নিজের হাতে। এবার আগের মতই ধান কাড়বে ঢেঁকিতে। পাড়ার গরিব চাষানীরা আসবে তার ধানের খিদমতে। এক সঙ্গে ধান-ভানার গান গাইবে তারা।

খবর এল, আপিলেও সোনামদ্দি জিতেছে।

আমিরন উছলে উঠল: এবার কী খাওয়াবে খাওয়াও। বাউ-খাড়ু গড়িয়ে দাও নতুন করে, গড়িয়ে দাও পার্শি-মাকড়ি। এবার একখানা শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি কিনে দাও।

কিন্তু সোনামদ্দির মন খারাপ। বললে, অনেক তত্ত্বতাউত করেছি বলেই না জিততে পারলাম। সব চেয়ে বড় উকিল লাগিয়েছি। টানাটানি করে আপিল রেখেছে খোদ জজসাহেবের কামরাতে। বহুহ টাকা খরচ হয়ে গেছে।

কোনো কথা আর গায়ে মাখে না আমিরন, দেখেনা তলিয়ে। বললে, হোক খরচ, জমি তো আমাদের থাকল। লক্ষ্মী তো বাঁধা রইল ঘরের কানাচে। পাকাপোক্ত স্বত্বে কায়েম হলাম। যার জমি আছে তার ভাত আছে। যার ভাত নেই তার জাতও নেই।

কিন্তু সোনামদ্দি কী করে বলে তার সত্যিকারের হারের কথা? মামলায় সে নিচু হল না বটে, কিন্তু জমির স্বত্ব দিল নিচু করে। সব সময়ে ভাঙা-নদীর মুখে ছাড়া বাড়ির মত বসে থাকবে এখন থেকে। ফুকা, ঠুনকা স্বত্ব। দায়রহিতের একটা নুটিশ জারি হলেই ফক্কিকার।

এক সন খাজনা না দিলেই ডিক্রি, আর ডিক্রির টাকা তিরিশ দিনের মধ্যে না দিলেই উৎখাত।

কিন্তু তা না হলে টাকার সে জোটপাট করত কি করে? মোকদ্দমা চালাত কি করে? স্বত্ব সাব্যস্ত করত কি করে?

হুঁশিয়ার থাকবে সব সময়। যুবনালি দেবতার লোক, সে কখনও দিললাগি করবে না। অনেক জমি আছে তার, এ উনিশ গণ্ডার জন্য তার লোভ নেই। হয়তো বা কবালার পণ সুদ সমেত ফেরত পেলে সে স্বত্ব ফিরিয়ে দেবে, ফির-বিক্রি করবে। তা না দিক, ঘোর দুর্দিনে কিস্তি খেলাপ হলেও উচ্ছেদ করে দেবে না।

কিন্তু শুনতে পেল যুবনালি জলিল মুন্সির বেনামদার। কবলার টাকা যুবনালি দেয়নি, জলিল মুন্সি দিয়েছে। তার হিসাবের খাতায় ঐ তারিখে ঐ টাকা খরচ লেখা। কবলাও এখন তার হেপাজতে। শুধু তাই নয়, যুবনালি জলিল মুন্সির বরাবর মুক্তিপত্র করে দিয়েছে। মুক্তিপত্রে কবুল করেছে কবালার স্বত্ব জলিল মুন্সির।

ফল দাঁড়াল, জমিতে সোনামদ্দি কোর্ফা প্রজা, আর জলিল মুন্সি তার মুনিব। বছর-বছর তার দশটাকা খাজনা। আমিরন শুনতে পেলে গাঙে ডুবে মরবে।

সোনামদ্দির শরীরে-মনে সুখ নেই। খেতে-মাখতে আহ্লাদ নেই। তামুকে-বিড়িতে ঝাঁজ নেই।

কেন, তোমার কী হয়েছে? মনের মধ্যে যেন কী ভার বেঁধে বেড়াচ্ছ। রাগ-রঙ্গ করে আর কথা কও না আমার সঙ্গে!

জোর করে হাসল সোনামদ্দি। বললে, বা, বয়স বাড়ছে না দিন দিন?

সত্যি বলতো, জমির কিছু করেছ?

বা, জমির কী করব? আমাদের যেমন জমি তেমনি আছে।

বেচা-বাঁধা নেই তো কোথাও?

বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি। জমি রইল আমাদের নিজ চাষে, ধান আমরা গোলাজাত করেছি, আউশ বুনলাম এ বছর, জমি বেচা-বাঁধা হয়ে গেল?

না, জমি যদি তোমার ঠিক থাকে, আমি যদি তোমার ঠিক থাকি, তবে তোমার আর দুঃখ কী! তবে তুমি কেন মন ভার করে থাক?

না গো বউ না, জমি ঠিক আছে। মানুষই আর ঠিক নেই।

এক কিস্তিও খাজনা খেলাপ করে না সোনামদ্দি, ঠিক জলিল মুন্সির তশিলদারকে পৌঁছে দিয়ে আসে। রসিদ নেয়। সালিয়ানা হলে দাখিলা আদায় করে। যাতে খাজনার বকেয়ায় না উচ্ছেদের আর্জি পড়ে তার নামে। আর উচ্ছেদের আর্জি পড়লেই বা কি, ডিক্রির তিরিশ দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দিলেই খালাস। শুধু অমিরন না টের পায়।

জলিল মুন্সি সে পথে গেল না। নিজে খাজনা বাকি ফেলে নিজের রায়তিস্বত্ব নিলাম করালে। কেনালে চাচাত বোনাই দরবার মোল্লাকে দিয়ে। টাকা দিলে নিজে। নিলাম ইস্তাহার গোপন করলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সোনামদ্দির উপর। দায় রহিতের নুটিশ নিয়ে। সোনামদ্দির কোলরায়তি বিলোপ হয়ে গেল।

এবার সোনামদ্দির দখল জবর-দখল বলে সাব্যস্ত হতে দেরি হল না। জলিল মুন্সি ঘর ভেঙে খাসদখলের ডিক্রি পেল একতরফা।

এল দখল জারির পরোয়ানা। ঘরদোর ছেড়ে বেরিয়ে যাও হালট ধরে। পাঁচ দোরের কুকুর হয়ে।

এসব কী? আমিরন চোখে আগুনের হলকা নিয়ে তাকাল সোনামদ্দির দিকে।

তোকে ফতুর করে দিয়েছি আমিরন। জমির জন্য মামলা করলাম, মামলার জন্য জমি গেল। পথের থেকে নতুন করে আবার আমাদের আরম্ভ করতে হবে। সোনামদ্দির চোখ ছলছল করে উঠল।

রাস্তায় নেমে এল তারা মহবুবের হাত ধরে। বাড়ি-ঘর ভূমিসাৎ হয়ে গেল চোখের সামনে। জমির দিকে তাকাল। মনে হল যেন গৃহহারার মত তাকিয়ে আছে।

কোথায় আর যায়! আতুর-এতিমের জন্যে কোথায় কোন মুসাফিরখানা! তাদের কে আশ্রয় দেবে?

জলিল মুন্সিই তাদেরকে আশ্রয় দিল। জমিতে সোনামদ্দি হালিয়া খাটবে আর বাড়িতে আমিরন দাসী-বাঁদি হবে।

উপায় কি। জমি যখন নেই তখন ভাত নেই। আর যার ভাত নেই তার জাত কোথায়!

আমিই তোকে পথের কাঙাল করলাম! বলে সোনামদ্দি।

আমার জন্যে তুমি ভাবো কেন? জমির জন্যে ভাবো। আমার চেয়েও জমির দাম অনেক বেশি।

বেশি দিন থাকতে হল না সে-বাড়ি। আমিরনকে জলিল মুন্সি নিকা করলে। মহল্লার মোল্লা এসে কলমা পড়াল।

সোনামদ্দি হতবুদ্ধির মত বললে, বা, তালাক দিলাম কখন?

ঐ হয়েছে তোমার তালাক দেওয়া। ওর কাছে নিকা বসে জমি আবার ফিরিয়ে দিলাম তোমাকে। এই দেখ কবালা। আমিরন কবালা দেখাল।

জলিল মুন্সিকে দিয়ে ফির-বেচার্ কবালা করিয়ে নিয়েছে আমিরন। রেজেষ্ট্রি হয়ে গিয়েছে। রায়তি স্বত্ব আবার চলে এসেছে সোনামদ্দির দখলে। ঘর তুলে দিয়েছে নতুন করে।

আর তুই?

আমিই কবালার পণ। আমার জন্য মন খারাপ কোরো না। আমার চেয়ে তোমার জমির দাম অনেক বেশি। আমি গেলে কী হয়? কিন্তু জমি তো তোমার ফিরে এল। তোমার জমির গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারল না।

মহবুব?

যদি রাত্রে খুব কাঁদে, চুপি-চুপি দিয়ে আসব তোমার কাছে।

নুরবানু

কুরমান হাটে কাঁচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালি কিনবে না বেগুনি কিনবে চট করে ঠাহর করতে পারে না।

অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিতপুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাঁচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রং পছন্দ হয় না, রং মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাঁচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্গায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ-বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভাল করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড় দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত।

তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। মুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

মুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল টানে। আর মনিব-গিন্নির খেজমৎ করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভাল-মন্দ খেতে পায় মাঝে-মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।

কিন্তু শান্তি নেই। মনিব, উকিলদ্দি দফাদার, মুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে!

প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল মুরবানু: মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।

কেন, কি করে?

খুক-খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।

তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।

না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।

কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয় নি। একদিন মুরবানুর হাত চেপে ধরল।

সেদিনও কাঁদতে-কাঁদতে মুরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।

রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বললে, তুই সামনে গেছিলি কেন?

কে বললে? যাইনি তো সামনে।

সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?

আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক-কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে, ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

তবু সেদিনও সে মারেনি মুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল।

আশ্চর্য, গরিবের বউএর কি একটু ছুরতও থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলাও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?

খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা-পুলিস সব ওদের হাতে, ওদের অনেক দূর দিয়ে আমাদের হাঁটা-চলা। কাজ-কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।

কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাঁচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো।

হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

এসব কোত্থেকে?

মুনিবগিন্নি দিয়েছে।

কিন্তু, জিগগেস করি, পয়সা কার? এ সাজানোর পিছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে? আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি। নোনা জমি এমনি করেই করেই আস্তে-আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

খুলে ফ্যাল শিগগির। গর্জে উঠল কুরমান।

সাজবার ভারি সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টালমাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পটপট করে ভেঙে গেল কতগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনো দিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে। কিষানের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু এ কি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক-টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে চুড়ি পড়িয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে?

তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে? এদিকে তোমার একটা ভাল গামছা নেই, লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।

যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

তোর চুলবাঁধা দেখিনি কোনো দিন—

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুলবাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন-ঠুন।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম? কম কি একবেলার খোরাকি? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফলসা রঙের শাড়ি। নুরবানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

এ শাড়ি এল কোত্থেকে? বর্শার মুখের মত চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নি দিয়েছে শাড়িখানা।

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি-পায়েসের ছিটে-ফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায়?

না, নরম পড়ল না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘসা জিভ। ফাঁই-ফাঁই করে সে ছিঁড়ে ফেলল।

এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী

হবার সখ কেন? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে? গা বেয়ে-বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপ-মারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতই এ শাড়িখানি। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক; বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে-টিপে দুপুর বেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্য দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, কই গো বিবিজান। দেখ এসে কী এনেছি।

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রুপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপরে বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

চলে যান এখান থেকে। চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখ, জেওর এনেছি গড়িয়ে।

দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।

কিন্তু সোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রুপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুসির ঝলকানি। কত না জানি ঠাট্টা-বটখেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রং-সং, আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কতো না-জানি যোগসাজসের সর্ত।

মাথায় খুন চেপে পেল কুরমানের। চার পাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মত। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

এখানে কেন?

ধানাই-পানাই করতে লাগল উকিলদ্দি। শেষ কালে বললে, লক্ষ্মী-বিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কি না দেখতে এসেছিলাম।

তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?

বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার। আমার যেখানে খুশি আমি যাব আসব।

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধপেটা খাওয়া চাষা, জোর-জেল্লা নেই শরীরে, সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হন্ত-দন্ত হয়ে, শিকরে-পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না, শুধু শুরু হয় লাটপাট।

কি চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে, কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুটি ধরে: তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে? কেন পর-

পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস? উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর, যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মত চেঁচিয়ে উঠল: এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।

ব্যস, উথল-পাগল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারদিক। নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল? ফকির-ফতুরের মত তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা মুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করল আস্তে-আস্তে।

কুরমান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বললে নুরবানুকে, ও কিছু হয়নি, তুই চলে যা ঘরের মধ্যে।

সত্যিই যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে নুরবানু চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউএর মত।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে-আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে সে ঘরে তুলতে পারে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারবে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রী পর হয়ে যাবে? কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

মুখের কথাটাই বড় হবে? মন দেখবে না কেউ?

মুখের জবানের দাম কি কম? রং-তামাসা করে বললেও তালাক, তালাক। আর এ তো জল-জীয়ন্ত রাগের কথা। গলা দরাজ করে দিনে-দুপুরে তালাক দেওয়া।

আর দস্তুরমত সাক্ষী রেখে। ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাব না?

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নুরবানুকে? আর কে! দাড়িতে হাত বুলুতে-বুলুতে উকিলদ্দি বললে, আমি বিয়ে করব।

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনসি, ইউনিঅন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নুরবানু। বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তা ছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালির মধ্য দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারল না।

সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে-কুরে খাচ্ছে।

দাউলে হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘর-দুয়ার কি! ঘরের উইয়ে খাওয়া পাটখড়ির বেড়া ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পডছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাপ খোলে। কোথায় নুরবানু! চৈতী মাঠের মত বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নুরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নুরবানু বলে, না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।

বলে, তোমাকে শুধু একটিবার দেখতে এলাম। বড় মন কেমন করে।

বড় কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড় মন মরা। গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। জোর জলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা ওটা একটু আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে।

তোকে কি আর ফিরে পাব নুরু?

নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুজে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দিয়ো।

আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।

ইস? নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল : দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?

না ছাডলেই বা কি, ও পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়?

ইস্, করুক দেখি তো এমন বেইমানি। আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু : বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

গা-টা তেতো-তেতো করছে, জর হবে বোধ হয়।

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে।

বলে, কেন পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।

কবে আসবি?

দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্মাবার কলমা পড়বে তার পরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে? যেখানে এত প্যাঁচঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ আর দেদার আসমান।

শিগগির বাড়ি যাও। কুরমান চোর। কুরমান পরপুরুষ।

জুম্মাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু, কই, শনিবার তো তালাক নিয়ে চলে এল না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মত নয়, দেনদারের মত।

উকিলদ্দি বললে, আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে?

যত সব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। রাখবে অষ্টঘড়ির বাঁদি করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাক উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে? কেন এজহার খেলাপ করছে?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই যে এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকান্ত হয়নি। এখনো মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকা-পোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে-এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না দরজায় খিল দিয়ে। ও ভেবেছে কলমা পড়ার পরেই বুঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটন-ছিঁড়েন হতে পারে কি করে?

সত্যিই তো। দশ-শালিস রায় দিলে। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মত।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল নুরবানু।

পর দিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে এল কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুঁকো ধরা, কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে তা কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মত চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন-নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মত চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকাল নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরলে-পরলে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড় ঘোলা। লেগেছে কাদা-মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি। নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়ল।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে-মারতে কুরমান বললে, না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।

শ্রেষ্ঠগল্প পর্যায়ের অন্যান্য বই

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
'বনফুলে'র শ্রেষ্ঠগল্প
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠগল্প
মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠগল্প
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প

বছরের সেরাগল্প

১৩৫৩-র সেরাগল্প
সম্পাদক—নবেন্দু ঘোষ
১৩৫৪-র সেরাগল্প
সম্পাদক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়